আর কোন পলাশী নয়

পলাশী ট্রাজেডীর
২৪০ তম বার্ষিকী স্মারক
১৯৯৭

পলাশী ট্রাজেডীর ২৪০ তম বার্ষিকী স্মরণ জাতীয় কমিটি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আর কোন পলাশী নয়

পলাশী ট্রাজেডীর ২৪০তম বার্ষিকী স্মারক

পলাশী ট্রাজেডীর ২৪০তম বার্ষিকী স্মরণ জাতীয় কমিটি

পলাশী ট্রাজেডির ২৪০তম বার্ষিকী স্মারক/ক

www.pathagar.com

পলাশী ট্রাজেডীর ২৪০তম বার্ষিকী স্মরণ জাতীয় কমিটি

আর কোন পলাশী নয়

পলাশী ট্রাজেডীর ২৪০তম বার্ষিকী স্মারক

স্মারক কমিটি

আহবায়ক

মাসুদ মজুমদার

সদস্য

খন্দকার আবদুল মোমেন

আবদুল ওয়াহিদ

প্রকাশকাল

৯ আষাঢ়, ১৪০৪

২৩ জুন, ১৯৯৭

১৬ সফর, ১৪১৮ হিজরী

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা

আরিফুর রহমান

প্রচ্ছদ গ্রাফিকস

ডটপ্লাস লিঃ, ঢাকা

কম্পিউটার কম্পোজ ও মুদ্রণ

চৌকস

১৩১, ডিআইটি এক্সটেনশন রোড

ফোন ঃ ৪১৯৬৫৪, ৯৩৩৮২৫২

শুভেচ্ছা মূল্য

একশত টাকা

প্রকাশনায়

পলাশী ট্রাজেডীর ২৪০তম বার্ষিকী স্মরণ জাতীয় কমিটি

৩৮০/বি, মিরপুর রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা

AAr Kono Palashe Noi

Palashey never be again

(240th anniversary Souvenir of Palasey tragedy.)

Published by :

National memorial committee for 240th anniversary of Palasey tragedy.

380/B, Mirpur Road, (2nd Fl.) Dhanmondi, Dhaka, Bangladesh.

Date of Publication : 23rd June, 1997. Price : $ 5.00. Taka. 100.00

www.pathagar.com

পলাশী ট্রাজেডীর ২৪০তম বার্ষিকী স্মরণ জাতীয় কমিটি

উপদেষ্টামন্ডলী

প্রফেসর দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান,
এ্যাডভোকেট মুজিবুর রহমান, , প্রফেসর আবদুল করীম,
প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিয়া, প্রফেসর এমাজ উদ্দীন আহমদ,
আল মাহমুদ, ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, আখতার-উল-আলম,
আবুল আসাদ, গিয়াস কামাল চৌধুরী, আমানুল্লাহ কবীর,
মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, কমোডর (অবঃ) আতাউর রহমান,
আবদুল মান্নান তালিব, মাওলানা রূহুল আমীন খান,
অধ্যক্ষা চেমন আরা, কণ্ঠ শিল্পী আঞ্জুমান আরা বেগম

www.pathagar.com

পলাশী ট্রাজেডীর ২৪০তম বার্ষিকী স্মরণ জাতীয় কমিটি

আহবায়ক
আরিফুল হক

সদস্য সচিব
আবদুল হাই শিকদার

প্রধান সমন্বয়কারী
মতিউর রহমান মল্লিক

আহবায়ক স্মারক
মাসুদ মজুমদার

আহবায়ক সংস্কৃতি
খন্দকার আবদুল মোমেন

আহবায়ক অর্থ
রফিকুন্নবী

আহবায়ক প্রচার
সুলতান আহমদ

আহবায়ক অনুষ্ঠান
আবদুল ওয়াহিদ

আহবায়ক ঘোষণা
আলম মাসুদ

আহবায়ক র‍্যালি (শৃংখলা)
মতিউর রহমান শিকদার

আহবায়ক প্রস্তাবনা
খালেদ রকিব

আহবায়ক (সাজ-সজ্জা)
হাফিজ উদ্দীন

আহবায়ক অভ্যর্থনা
হাসান মুর্তাজা

সদস্য

মাশির হোসেন, আবদুল বাতেন, ওয়াসিমুল বারী রাজীব, ডঃ আবদুর রব, আবদুর রহমান মুসা, এলাহী নেওয়াজ খান, স.ম. রফিক, তোফায়েল আহমদ খান, এহসানুল মাহবুব জুবায়ের, শাহ আলম, মুহাম্মদ মর্তুজা, হাফিজুর রহমান, আনিসুর রহমান, হাসান মুর্তাজা, আনিসুজ্জামান, এ্যাডভোকেট রইস উদ্দীন, আরিফুর রহমান, মহিব্বুল্লাহ, আ.জ.ম জাকির, মাঝি নজরুল ইসলাম, আবদুল হান্নান, আরকান উল্লাহ হারুনী, মুহম্মদ মহসিন, আ.স.ম. ফারুক, হাসনাত আবদুল কাদের, লুৎফুর রহমান , ফিরোজ আল মামুন, লতীফ মুহাম্মদ

www.pathagar.com

আমাদের কথা

২৩ জুন '৯৭। পলাশী বিপর্যয়ের ২৪০তম দিন। পলাশী বিপর্যয় বা ট্রাজেডী একটি ঘটনা বা দুর্ঘটনা নয়; ইতিহাসের বাঁক ঘুরানো একটি দিন। উপমহাদেশের ইতিহাসে তো বটেই, পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম সবচেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী একটি দিন। ইতিহাসের সকল ঘটনা-দুর্ঘটনাই অনাগত ভবিষ্যতের জন্য প্রভাব রেখে যায়। কোন কোন ইতিহাস আছে মানবগোষ্ঠীকে প্রতিনিয়ত ভাবায়। বার বার পেছনের দিকে ফিরে তাকাতে বাধ্য করে। সেই ইতিহাসকে বর্তমানের নিরিখে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হয়। ভবিষ্যতের পথ রচনায় সেই ইতিহাস হয়ে উঠে বিশ্লেষণের অনিবার্য উপাদান।

পলাশী ট্রাজেডী আমাদের জাতিসত্তার সাথে লেপ্টে থাকা সেই দিন, যে দিনটিকে সামনে রেখে হৃদয়ের অবিরত রক্তক্ষরণের মাঝেও আমরা শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করার প্রেরণা পাই। সেই শক্তিতে বলিয়ান হয়ে বলে উঠতে পারি 'আর কোন পলাশী নয়'। আত্মসমালোচনার মাধ্যমে এটুকু অর্জন আমাদের অধিকার।

পলাশী শুধু ভাগীরথী নদীর তীরে এক ফালি জমি নয়, যুদ্ধ মহড়ার স্থান নয়, পলাশী স্বাধীনতাপ্রেমী মানুষের অহংকারের স্থান, ইতিহাসের তীর্থভূমি। আপোষহীন লড়াকু মানুষের চোখে কারবালার শিক্ষা যেমন প্রতিটি ভুঁই কারবালা–আর প্রতিদিন আশুরা। তেমনি স্বাধীনতাকামী মানুষের হৃদয়পটে পলাশী মানে স্বাধীনতার সতত আকাঙ্খা, প্রতিনিয়ত বিশ্বাসঘাতকতার মোকাবেলায় স্বাধীনতা রক্ষার অঙ্গীকার।

পলাশী চিহ্নিত করেছিলো বিশ্বাসঘাতকতার স্বরূপ, স্বাধীনতার প্রতীক। তাই, ইতিহাসের মহানায়ক নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা আর স্বাধীনতা যেনো একার্থবোধক। মীর জাফর, রায় দুর্লভ, ইয়ার

www.pathagar.com

লতিফ, উমি চাঁদ, ঘসেটি বেগম, জগৎশেঠরা বিশ্বাসঘাতকের প্রতীক। এগুলো শুধু কোন নাম নয়, নামের আড়ালে ইতিহাস চিহ্নিত অভিধাপ্রাপ্ত এবং অভিযুক্ত প্রতীকী খেতাব। এ কারণেই আমরা সময়ের প্রতিটি বাঁকে প্রতিটি ঘটনায় প্রতি মুহূর্তে চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করি সত্য ও স্বাধীনতার প্রতীক সিরাজকে, আর প্রতিপক্ষে চিহ্নিত করি বিশ্বাসঘাতকতার প্রতীক মীর জাফরকে।

পলাশী শত্রু-মিত্র চিহ্নিত করার সুযোগ দিয়েছিলো বলেই আজ খল চরিত্রের এনজিও, পঞ্চম বাহিনীর অপতৎপরতা, বেনিয়াচক্রের অশুভ ছায়াপাত, বিদেশী শক্তির কূটচাল ও আধিপত্যকামীদের প্রতিটি পদক্ষেপে আমরা টের পেয়ে যাই, বোধ করি আরেকটি পলাশী ট্রাজেডী ধেয়ে আসছে। স্বাধীনতা ও বিশ্বাসঘাতকতাকে পরিমাপযোগ্য করার জন্য পলাশী আমাদেরকে জাগ্রত রাখে, সম্বিত ফিরিয়ে দেয়। অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ স্বাধীনতার অস্তমিত সূর্য মীর কাশিমের মত রুখে দাঁড়াবার সাহস জোগায়। তীতুমীর, মজনু শাহ, হাবিলদার রজব আলী, শরিয়তুল্লাহ্‌র মত ঝলসে ওঠার প্রেরণা এসে বাহুতে ভর করে। তাই, শোকাবহ পলাশী আমাদের 'হায় পলাশী বলে' শুধু মাতম করতে উৎসাহিত করে না। 'আর কোন পলাশী নয়' এ স্লোগান উচ্চকিত করে বুক টান করে স্বাধীনতার স্বপক্ষে দুর্ভেদ্য দুর্গ প্রাচীরের মত অটল-অবিচল থাকতে উদ্বুদ্ধ করে।

আবহমানকাল থেকে পলাশী পালনের বিভিন্ন ধারা চলে আসছিলো। এবার সেই ধারাকে আমরা বহুমাত্রিক করার প্রয়াস পেয়েছি। প্রেক্ষাপটই আমাদেরকে এ সময়ের 'সিরাজ' হতে প্রেরণা যুগিয়েছে।

প্রতিপক্ষের কাছে সিরাজ অভিযুক্ত, পলাশী তাৎপর্যহীন, আর আমাদের কাছে ইতিহাসের সন্তান সিরাজ স্বাধীনতার প্রতীক। পলাশী তাৎপর্যের। অভিযোগকারী ইংরেজ শাসক, তাদের দোসর বেনিয়াচক্র, সহায়তা দানকারী মীর জাফর, জগৎ শেঠ, ঘসেটি বেগমরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়েও প্রচারণা চালায়, সিরাজ দুর্বল-অদক্ষ, অযোগ্য, অর্বাচিন, নারীলোভী, ক্ষমতান্ধ—এই কূটবুদ্ধি মাথায় নিয়ে ইউরোপীয় ও হিন্দু ঐতিহাসিকরা মিথ্যাচার আর বিকৃতি দিয়ে ইতিহাসের নামে আবর্জনা সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালিয়েছে। সিরাজকে অবাঙালী বহিরাগত বলে আমাদের সামনে কালো পর্দা ঝুলিয়েছে। আমাদের অর্জনকে আড়াল করার জন্য তাবেদারদের দ্বারা প্রচারণার ধূম্রজাল সৃষ্টি করেছে। সে-সব ছিন্ন করে প্রকৃত ইতিহাস নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার জন্যই আমাদের প্রাণান্ত প্রয়াস থাকাটাই সঙ্গত।

রাজপথে শোক মিছিল, আলোচনা সভা, চিত্র প্রদর্শনী আর স্মারক প্রকাশনার মধ্য দিয়ে আমরা আড়াল করা ইতিহাসকে জাতির সামনে তুলে ধরতে চেয়েছি। সেই ইতিহাস থেকে আজকের প্রেক্ষাপটে আমাদের 'অর্জনটুকু' বুঝে নিতে চেয়েছি।

এ দেশে সিরাজ চর্চায় প্রচুর সীমাবদ্ধতা থাকলেও আমাদের সাহিত্যে-কবিতায়-নাটকে-সিনেমায় আর নিত্য-দিনের রাজনৈতিক মঞ্চে সিরাজ অপরিহার্য ও অনিবার্য প্রসঙ্গ। ইতিহাস চর্চায় আড়ষ্টতা থাকলেও সকল প্রকার কালো নেকাব সরিয়ে মিথ্যা ও অভিযোগের সীমা ডিঙ্গিয়ে সিরাজ উঠে এসেছেন ইতিহাসের মহানায়ক হিসেবে। স্মারকের মাধ্যমে আমরা ইতিহাস থেকে একটি খণ্ডচিত্র হলেও তুলে আনার চেষ্টা করেছি। বিক্ষিপ্ত গবেষণা কার্য ও একাডেমিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্র থেকেও

www.pathagar.com

আমরা কিছু নিবন্ধ উপস্থাপন করেছি। যদিও এটি একটি ক্ষুদ্রতম প্রয়াস। তারপরও বলা যাবে, ইতিহাস আশ্রয়ী ঘটনাবহুল পলাশীকে আমরা মতনিরপেক্ষভাবে তুলে ধরতে দ্বিধা করিনি। এ স্মারক প্রতিনিধিত্বশীল হলেও সিরাজ ও পলাশী সংক্রান্ত সকল লেখককে আমরা এখানে জায়গা করে দিতে পারিনি। এ জন্য আমাদের দুঃখবোধ তো বটেই, সীমাবদ্ধতার অতৃপ্তি থেকে গেছে।

যাদের প্রবন্ধ-নিবন্ধ আমরা প্রকাশ করেছি তাদের প্রতিও আমরা ইনসাফ করতে পারিনি। কলেবর সীমিত রাখার জন্য আমরা লেখার অংশবিশেষ প্রকাশ করেছি। হলফ করে বলতে পারি ইচ্ছে করে, জানামতে বা জ্ঞাতসারে কোন সম্মানিত লেখক, গবেষক ও ইতিহাসবেত্তার নিবন্ধে-প্রবন্ধে কাটছাঁট করে বিকৃত করার জন্য সম্পাদনার নামে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিনি।

কিছু কিছু প্রবন্ধ-নিবন্ধ আছে যার ভেতর আমরা তথ্যগত দিক থেকে বৈপরিত্য লক্ষ্য করেছি। আমাদের বিশ্বাসের সমান্তরাল ভাবিনি–এমন কি সকল তথ্যের সাথে একমতও নই-এমন কিছু নিবন্ধ-প্রবন্ধও আমরা প্রকাশ করেছি। কয়েকজন সম্মানিত লেখকের সাথে আমাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হয়েছে। আবার কয়েকজনের সাথে যোগাযোগের সুযোগ হয়নি। যাদের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি তাদের প্রকাশনা থেকে এবং বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ও সাপ্তাহিক থেকে আমরা তাদের লেখা সংগ্রহ করেছি। আমরা সকল লেখকের কাছে কৃতজ্ঞ–যাদের লেখা প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে তাদের কাছে তো বটেই যাদের লেখা প্রকাশ করা যায়নি অথচ সাহায্য নিয়েছি তাদের কাছেও।

সিরাজ আমাদের জাতীয় বীর। দেশ জুড়ে তার উপর হাজারো স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে। সড়ক পথ থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রাবাস সিরাজ স্মরণে উৎসর্গিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের মনের মণিকোঠায়, হৃদজগৎ জুড়ে, জাতিসত্তার পূর্ণ অবয়বে সিরাজের স্থান, পলাশীর যে অবস্থান সেই তুলনায় আমাদের স্মরণ ও বরণের মাত্রায় আমরা কৃপণ।

আশা করি, স্বাধীনতাকামী কোন মানুষ ২৪০ বছর পর এত মাতামাতি কেন, এ ধরনের হীনমনের প্রশ্ন উত্থাপন করে নিজেদের ঐতিহ্য চেতনা ও দেশপ্রেমকে প্রশ্নবোধক করবেন না। তারপরও আমরা জানি, পলাশী ট্রাজেডীর প্রেক্ষাপটে আমলাচক্র, বেনিয়াগোষ্ঠী জগৎশেঠ-রায় দুর্লভদের অর্থপুষ্টরা, ইংরেজদের পা চাটা কুকুররা, বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রক ও বুদ্ধিজীবীরা যে ভূমিকা পালন করেছে আজকের দিনেও সেই শ্রেণী চরিত্রগুলো একই স্বরূপ প্রদর্শন করবে। কারণ, সকল যুগের সকল দেশের স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষের শ্রেণীচরিত্র যেমন অভিন্ন। তেমনি, প্রতিপক্ষে বিশ্বাসঘাতক-তাবেদার বিদেশী দালালদের স্বরূপ এবং শ্রেণী চরিত্রও অভিন্ন।

মাসুদ মজুমদার
আহ্বায়ক
স্মারক কমিটি

www.pathagar.com

সূচীপত্র

একটি ঐতিহাসিক মূল্যায়ন	৯	ডঃ মোহর আলী
নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র	১৪	প্রফেসর এম.এ. রহিম
সিরাজউদ্দৌলা দিবস	১৬	সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন
পলাশীর বিপর্যয় এবং আমাদের কর্তব্য	২০	সৈয়দ আলী আহসান
বাংলার পতনের রাজনৈতিক কারণ	২৩	আব্বাস আলী খান
পলাশীর ষড়যন্ত্র	২৯	এমাজউদ্দিন আহমদ
পলাশীর যুদ্ধ	৩৩	ডঃ কে.এম. মোহসীন
রূপকথার নায়ক	৪২	অধ্যাপক আবদুল গফুর
নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও পলাশীর বিপর্যয়	৪৬	আশকার ইবনে শাইখ
মীর জাফর	৫০	ডঃ কিরণ চন্দ্র চৌধুরী
তিমিরায়ণের পট রেখা	৫৩	ডঃ গোলাম কাদির
পলাশীর তত্ত্ব কথা	৬৪	আখতার ফারুক
পলাশীর স্মৃতি	৬৮	কমোডর (অবঃ) এম. আতাউর রহমান
পলাশী নাটকের প্রস্তুতিপব	৭০	ফারুক মাহমুদ
ওপারে পলাশী এপারে আমরা	৭৮	গিয়াস কামাল চৌধুরী
পলাশী চক্রান্তের নেপথ্য কাহিনী	৮০	এরশাদ মজুমদার
শহীদ নবাব সিরাজউদ্দৌলা	৮৬	ডঃ মুহাম্মদ ফজলুল হক
আমাদের ইতিহাসে পলাশীর প্রভাব	৮৯	মুন্‌শী আবদুল মান্নান
বাংলায় পলাশী যুদ্ধোত্তর লুণ্ঠন	৯৪	খন্দকার হাসনাত করিম
পলাশী-উত্তর বাংলার চালচিত্র	৯৯	মোহাম্মদ আবদুল মান্নান
ওরা কেন আতংকিত হয়ে পড়েন?	১০৩	এলাহী নেওয়াজ খান
পলাশী যুগে যুগে	১০৫	অধ্যাপক মুজাহিদুল ইসলাম
নবাগত–উৎপাত	১০৭	কাজী নজরুল ইসলাম
সিরাজউদ্দৌলা নাটকের গান	১০৮	কাজী নজরুল ইসলাম
সিরাজের স্বপ্ন	১১০	শাহাদাৎ হোসেন
মীরজাফরের কৈফিয়ত	১১৩	ফররুখ আহমদ
পলাশীর স্মৃতি	১২৭	আল মাহমুদ
সিরাজউদ্দৌলা	১২৮	আবদুল হাই শিকদার
মীর জাফর	১৩১	মতিউর রহমান মল্লিক
হারজিত	১৩৩	আসাদ বিন হাফিজ
দু'টি সনেট	১৩৪	হাসান আলীম
ন্যায়বাদী বীর সিরাজ জাগো	১৩৫	শামসুল করীম খোকন
দু'টি লিমেরিক	১৩৫	নাসীর হেলাল
সিরাজউদ্দৌলা	১৩৬	সিকান্দার আবু জাফর
জাতির মহানায়ক সিরাজ	১৫১	সালাউদ্দিন বাবর
আম্রকের রাজনীতি ও পলাশীর প্রেক্ষাপট	১৫৪	সাজ্জাদ পারভেজ
ঘটনা প্রবাহ	১৫৯	গ্রন্থনা ঃ আলম মাসুদ
ভিন্সিরার বন্দীশালায়	১৬২	পীরজাদা গোলাম মোস্তফা
সিরাজ অন্বেষা বনাম সিরাজ বিদ্বেষ	১৬৫	আলম মাসুদ
পলাশী যুদ্ধ-পরবর্তী লুণ্ঠন	১৬৮	আলফাজ আনাম মাসুম
পলাশী যুদ্ধ-পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি	১৭১	আমিন আল আসাদ
পলাশীর প্রান্তরে	১৭৪	আবদুল হাই শিকদার-এর সরেজমিন প্রতিবেদন
পলাশী ষড়যন্ত্রকারীদের পরিণাম	১৯৭	সংকলিত
আর কোন পলাশী নয় ঃ ঘোষণাপত্র	২০৪	আবদুল হাই শিকদার

■ প্রস্তাবাবলী ■ প্রতিবেদন ঃ র‍্যালী, আলোচনা সভা ■ অনুষ্ঠানের ছবি

www.pathagar.com

একটি ঐতিহাসিক মূল্যায়ন

ডঃ মোহর আলী

[বাংলায় মুসলিম শাসনের ইতিহাস আজো নিরপেক্ষতার আলোকে আলোচিত বা বিশ্লেষিত হয়নি। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে, এ যাবৎকাল যা রচিত হয়েছে তা একদেশদর্শী। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও বিশেষ গোষ্ঠীর হীনস্বার্থ বিবেচনাপ্রসূত কতিপয় ইংরেজ ঐতিহাসিকের সংকীর্ণ জাতীয় স্বার্থের ইতিহাসগত সংরক্ষণ এবং তাদের অনুসারী কয়েকজন দেশীয় পণ্ডিতদের অবিরাম অনিরপেক্ষতার কারণে বাংলায় মুসলিম শাসনের ইতিহাস সত্যের সাধারণ মানদন্ড থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়েছে। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার ক্ষেত্রে এই বেদনাদায়ক উদ্যোগ ছিলো সুদূরপ্রসারী ও ব্যাপক। সিরাজের পতনের মধ্য দিয়ে যেহেতু উপমহাদেশে বৃটিশ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন হয় এবং তথাকথিত আর্যশক্তির নবউত্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়-সেহেতু ইংরেজ এবং ইংরেজ অনুগত ঐতিহাসিকগণ প্রাণপণে বাংলা বিজয়ের কাহিনী নির্মাণ করতে গিয়ে সিরাজের চরিত্র, যোগ্যতা ও দেশপ্রেমকে অন্ধকারের মধ্যে ঠেলে দিয়েছেন।

ডঃ মোহর আলী বাংলার ইতিহাসের এই একদেশদর্শী অনুসন্ধানের বিপরীতে প্রথমবারের মতো নিরপেক্ষ ও মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইতিহাসের তত্ত্বীয় বিশ্লেষণ করেছেন। এই বিশ্লেষণে তিনি সম্পূর্ণ আবেগহীন ও পক্ষপাতহীনভাবে বাংলার মুসলিম শাসনের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করেছেন। 'হিস্ট্রি অব দি মুসলিমস অব বেঙ্গল' নামক বিশাল ইতিহাসকারের বিশ্লেষণকেও নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। আমরা এখানে তাঁর গ্রন্থের প্রথম খন্ডের শেষাংশ থেকে পলাশীর যুদ্ধ-পূর্ববর্তী সংকট, সিরাজের পতন-পরবর্তী বাংলার ইতিহাসের ধারা ও উপমহাদেশে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সর্বগ্রাসী উত্থান সম্পর্কিত মূল্যায়ন তুলে ধরলাম। গ্রন্থকার বর্তমানে সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে ইমাম মোহাম্মদ ইবনে সউদ ইসলামীক বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ এশিয়ায় ইসলামের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক।]

১৭৫৭ সালের জুন মাসে পলাশীর করুণতম ট্রাজেডীর ফলাফল হিসেবে সিরাজদ্দৌলার পরাজয় ও হত্যার মধ্য দিয়ে নবাব মীর জাফরের নেতৃত্বে একটি পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্লাইভের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানের শক্তিশালী ভিত্তি। মোগল

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যের অমিত শক্তির ক্রমাবনতি এবং সাম্রাজ্যব্যাপী আন্তসংহতির অভাব, ইউরোপীয় জাতিসমূহের মধ্যে বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক বিরোধের অনিবার্য ফলাফল স্বরূপ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে নতুন নতুন ভৌগোলিক অবস্থানের অনুসন্ধান, ১৭২৭ সালে মুর্শিদকুলী খানের মৃত্যুর পর বাংলায় বিত্তবান ও প্রভাবশালী একটি হিন্দু বণিক শ্রেণীর উদ্ভব এবং দক্ষিণ এশিয়ায় বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার দুর্বার আকাংখা এগুলোর সম্মিলিত প্রতিক্রিয়ার ফলাফল হিসেবেই সিরাজের পতন অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। সিরাজউদ্দৌলা বস্তুত এই পরিস্থিতিগুলোর শিকার হয়েছিলেন।

পলাশী যুদ্ধের অব্যবহিত পর থেকেই সিরাজ চরিত্র হননের একটি অসুস্থ প্রবণতা তৈরী হতে থাকে এবং যুদ্ধে পরাজয়ের সকল দায়-দায়িত্ব তার উপরেই নিক্ষেপ করা হয়। এটা খুব সহজেই বোধগম্য যে, সিরাজের বিরোধিরাই পলাশী যুদ্ধ-পরবর্তী প্রায় দুই শতাব্দীকাল শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকেছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সিরাজ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত ও মূল্যায়নকে প্রভাবিত করেছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে, এই মূল্যায়ন ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সিরাজউদ্দৌলার সমর্থকদের কাছ থেকে অদ্যাবধি আমরা কোন প্রামাণ্য দলিল পাইনি। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত সকল দলিলপত্র ও মূল্যায়ন সিরাজকে বিরোধিতা করেই রচিত হয়েছে সকল রচনা ও উৎসের ওপর আমাদের অপ্রতিরোধ্য নির্ভরতা দুর্ভাগ্যবান নবাব সম্পর্কে আমাদেরকে একটি বিপরীতমুখী ভাবনায় অভ্যস্ত করে তুলেছে।

সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে অভিযোগসমূহ উত্থাপনের বিভিন্ন উৎসের মধ্যে একটি অন্যতম হচ্ছে ১৭৫৭ সালের পয়লা মে অনুষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়াম সিলেক্ট কমিটির বৈঠকের ধারা বিবরণী। এই বৈঠকে সিরাজকে উৎখাতের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। ষড়যন্ত্রকারীরা তাদের হীন পরিকল্পনার পক্ষে যে সকল যুক্তি দাঁড় করায় তা হচ্ছে–

(ক) সিরাজ অসৎ এবং ইংরেজদের নির্যাতনকারী,

(খ) তিনি ফরাসীদের সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, যার অর্থ হচ্ছে ইংরেজদের সঙ্গে চুক্তিভঙ্গ এবং

(গ) সিরাজ বাঙ্গালীদের কাছে তাঁর জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলেছেন– যার ফলে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন সহজেই ঘটতে পারে।

পরিষ্কারভাবে সিরাজকে উৎখাতের জন্য প্রস্তুত এইসব যুক্তি ইংরেজ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী, তাদেরই স্বকল্পিত বিষয়। সিরাজউদ্দৌলা কখনো ইংরেজ বণিকদের ওপর নির্যাতন করেননি, এমনকি কাশিমবাজার অবরোধ করবার পরও ইংরেজ সম্পত্তি লুণ্ঠন কিংবা বিনষ্ট করেননি। ক্লাইভ এবং ওয়াটস-এর দেয়া সাক্ষ্য থেকেও প্রমাণিত হয়েছে যে, সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজদের সমস্ত ক্ষতি পুষিয়ে দিয়েছিলেন এবং ১৭৫৭ সালের ৯ ফেব্রুয়ারীতে সম্পাদিত চুক্তির সকল শর্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে মেনে চলেছেন। এ ছাড়াও সিরাজ ইংরেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করেছেন এবং সব সময় উল্লেখ করেছেন যে, বাংলা থেকে ইংরেজদের তাড়িয়ে দেবার কোন ইচ্ছেই তাঁর নেই। ইংরেজরা তাঁদের বাণিজ্য সুবিধের অপব্যবহার না করলে এবং নবাবের সার্বভৌমত্ব অগ্রাহ্য না করলে সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজদের সঙ্গে তাদের পুরনো সুবিধেগুলো বহাল রেখে সম্পর্ক পুনঃ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু

www.pathagar.com

প্রকৃতপক্ষে, ইংরেজ বণিকরা তাদের প্রাপ্য বাণিজ্য সুবিধেগুলোকে বহুদূর পর্যন্ত সম্প্রসারিত করে অত্যন্ত পরিষ্কার ও পদ্ধতিগতভাবে বাংলায় রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করতে থাকে সকল প্রকার দুর্গ নির্মাণ না করা সংক্রান্ত নবাবের সুস্পষ্ট নির্দেশ অগ্রাহ্য করেই তারা গোপনে দুর্গ নির্মাণে অগ্রসর হয়। এমনকি, নবাবের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে তারা পলায়নকারী অভিযুক্তদের আশ্রয়ও দেয়। তথাকথিত ফরাসীদের ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে দুর্গ নির্মাণের কোন কারণই ইংরেজদের ছিলো না ; এর উদ্দেশ্য ছিলো বাংলায় তাদেরই কথিত ও কল্পিত একটি বিপ্লব সাধন করা।

অনুরূপভাবে, ফরাসীদের সঙ্গে সিরাজের গোপন আঁতাতের ইংরেজ অভিযোগটিও ছিলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও কার্যকল্পিত। একটি স্বাধীন, সার্বভৌম রাজ্যের শাসক হিসেবে সিরাজ তাঁর রাজনৈতিক ধারণার ভিত্তিতেই রাজ্যর মধ্যে নিরপেক্ষতার নীতি যথাসম্ভব দ্রুত প্রয়োগ করেন। কিন্তু ক্লাইভ নবাবের আদেশ অগ্রাহ্য করে চন্দননাগরে ফরাসীদের ওপর হিংসাত্মক আক্রমণ চালিয়ে তাদের কুঠিগুলো দখল করে নেন। এই পরিস্থিতিতে নবাব তাঁর আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে ক্লাইভের আক্রমণ প্রতিহত করতে উদ্যত হন। তিনি ফরাসীদের গ্রেফতার করতে ইংরেজদের বাধা দেন। দক্ষিণ ভারতে একজন ফরাসী জেনারেলের কাছে নবাবের একটি চিঠি ইংরেজদের হস্তগত হলে ক্লাইভ এর মধ্যে নবাবের শত্রুতার সূত্র আবিষ্কার করেন। দুর্ভাগ্যবশত চিঠিটি ইংরেজদের হাতে পড়ে যায় এবং ইংরেজরা এই চিঠির মধ্যেই নবাব-ফরাসী গোপন আঁতাতের সন্ধান পায়। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে– পত্র প্রেরণ সংক্রান্ত সম্পূর্ণ বিষয়টিই ছিলো ইংরেজ পরিকল্পিত একটি হাস্যকর ষড়যন্ত্র। পত্রের বিষয়টি সত্য ঘটনা হলেও নবাবের ক্লাইভ আক্রমণ-পরবর্তী ভূমিকা দেশীয় সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে সঠিক ছিলো। বাংলায় ফরাসীরা অত্যন্ত দুর্বল ছিলো এবং অদ্যাবধি এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি যে, ফরাসীরা যে-কোন অবস্থাতেই ইংরেজদেরকে আক্রমণের পরিকল্পনা করেছে। সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে বিরোধের সূত্র উদ্ভাবন করতে গিয়ে এবং তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করার উদ্দেশ্যেই ইংরেজরা ফরাসী-নবাবের মধ্যেকার এইসব কাহিনীর উদ্ভব। একইভাবে, ইংরেজরা বাংলার জনগণের মধ্যে সিরাজের জনপ্রিয়হীনতার উদাহরণ হাজির করতে গিয়ে জগৎশেঠ-উমিচাঁদ গ্রুপের দৃষ্টিভঙ্গিকে কাজে লাগিয়েছে। মুর্শীদকুলী খানের সময় থেকেই এই গ্রুপ রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো অধিকার করে আসছিলো। সিরাজ কলকাতা প্রশাসনের জন্য মানিকচাঁদের উপর নির্ভর করতেন। নবাবের রাজস্ব ও প্রশাসনিক নির্ভরতা রাজা রাম নারায়ণ, নন্দকুমার, রায় দুর্লভ রাম এবং মীর মদনের ওপরও বহুলাংশে বর্তমান ছিলো। নিশ্চিতভাবেই নবাবের এই গ্রুপের সহযোগিতা ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ সম্ভব ছিলো না। এমন কোন প্রমাণ নেই যে, নবাব এই গ্রুপের বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিতে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু এঁরা বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক কারণে পূর্ব থেকেই ইংরেজদের সঙ্গে জোটভুক্ত হবার চেষ্টা করেছিলেন। বস্তুত, এই জোটই সিরাজ পতনের অন্যতম কারণ। সিংহাসন লাভের অব্যবহিত পর থেকেই নবাব সাহসিকতার সঙ্গে ঘষেটি বেগম ও শওকত জং-এর ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা প্রকাশ করেননি। কিন্তু তিনি কলকাতায় ইংরেজদের বিভিন্ন ভূমিকার প্রশ্নে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেননি। মানিক চাঁদের জটিল আচরণ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট পরিষদ নবাবকে ইংরেজবিরোধী

www.pathagar.com

ভূমিকার প্রশ্নে বাধা দান অব্যাহত রাখে। ইংরেজদের চন্দননগর আক্রমণের প্রাক্কালে নবাব তাদের প্রতিরোধে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু বিপুল পরিমাণ ঘুষের বিনিময়ে প্রতিরোধ বাহিনীর নেতা নন্দকুমার বিশ্বাসঘাতকতা করেন এবং ইংরেজদের সঙ্গে হাত মেলান। একইভাবে জগৎশেঠ, উমিচাঁদ এবং রায় দুর্লভ রাম ইংরেজদের বিরুদ্ধে কঠোর নীতি গ্রহণে সিরাজকে বাধা দিতে থাকেন। ক্ষমতা লাভের ছয় মাসের মধ্যেই তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল পরিপক্ক হয়ে ওঠে। এই লোকগুলোর সহযোগিতায় ক্লাইভ খুব সহজেই নবাব প্রশাসনকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে বিকল করে ফেলেন এবং নবাবের গোপন কাগজ ও চিঠিপত্র হস্তগত করেন। নবাব প্রশাসনকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে বিকল করে ফেলেন এবং নবাবের গোপন কাগজ ও চিঠিপত্র হস্তগত করেন। নবাব এসব ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে জাল পরিপক্ক হয়ে ওঠে। এই লোকগুলোর সহযোগিতায় ক্লাইভ খুব সহজেই নবাব প্রশাসনকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে বিকল করে ফেলেন এবং নবাবের গোপন কাগজ ও চিঠিপত্র হস্তগত করেন। নবাব এসব ষড়যন্ত্রের সবকিছু জানতে পারেন। কিন্তু ব্যাপক বিস্তৃত এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তখন তাঁর কিছুই করার ছিলো না। কারণ, তিনি কাউকেই বিশ্বাসযোগ্য বিবেচনা করতে পারেননি। পরিস্থিতি সম্পর্কে নবাবের সম্যক উপলব্ধি, সতর্কতা এবং তাঁর বাস্তব ধারণার প্রেক্ষিতেই তিনি মীর জাফরসহ বিশিষ্ট পারিষদবর্গের প্রতি দেশকে বিদেশীদের হাত থেকে রক্ষার জন্য বার বার আকুল আবেদন জানাতে থাকেন। তাঁরা প্রয়োজনের সময় বিশ্বাসঘাতকতারই প্রতিজ্ঞা করেন।

জগৎশেঠ এবং তাঁর গ্রুপের অন্যান্য সদস্যের চেয়ে মীর জাফরের ভূমিকা কোন অংশেই কম লজ্জাকর ছিলো না। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করার মতো যে, ষড়যন্ত্রের অংশীদার হিসেবে নবাব মীর জাফরকে চাকরিচ্যুত ও গ্রেফতার করলেও পরবর্তীকালে পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন ঘটতো না। অত্যুৎসাহী ও ক্ষমতালোভী ইংরেজরা স্থানীয় বণিক শ্রেণীর সহযোগিতায় সিরাজের পতন ও একটি পুতুল সরকার গঠন না করা পর্যন্ত তাদের কার্যক্রম বন্ধ করতো না। পলাশীর মর্মান্তিক পরিণতির পর ইংরেজ মনোনীত মীর জাফরকে নবাব পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। কিন্তু অচিরেই এই নতুন, অক্ষম ও নতজানু নবাব ইংরেজ এবং দেশীয় ষড়যন্ত্রকারীদের স্বার্থ পূরণে ব্যর্থ হলে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। তাদের পরবর্তী নির্বাচিত নবাব মীর কাশিম তো একইভাবে স্বার্থ সংরক্ষণে ব্যর্থ হলেও দেশের প্রশাসন ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কিন্তু অচিরেই তিনি স্বাধীন ভূমিকা গ্রহণের জন্য ইংরেজদের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়েন এবং অবশেষে ক্ষমতাচ্যুত হন।

আলীবর্দী খান কর্তৃক সিংহাসন লাভ এবং আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে বিরোধিতা ও শত্রুতা লাভের ক্ষেত্রে সিরাজের নিজস্ব অবস্থান ও ভূমিকার কোন দোষই ছিলো না। মাত্র চৌদ্দ মাসের শাসনামলে তিনি শত্রুতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে নিজস্ব অবস্থান সংহত করতে চেয়েছিলেন। তিনি খুব স্বাভাবিকভাবেই সাফল্য লাভ করতেন, কিন্তু তাঁর কয়েকজন আত্মীয়দের বিশ্বাসঘাতকতায় তা সম্ভব হয়নি। পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সিরাজ তাঁর নিজের দিক থেকে এবং দেশের দিক থেকে ইংরেজ এবং ফরাসী উভয়ের কাছেই সমান থাকার চেষ্টা করেছিলেন। ব্যক্তিগত অদূরদর্শিতা ও অযোগ্যতার জন্য সিরাজ ব্যর্থ হননি ঃ ব্যর্থতার কারণ নিহিত ছিলো তাঁর লোকজনদের চারিত্রিক ত্রুটি ও তাঁর বিপরীতে চলমান সমদের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে। নবাবের নিজস্ব লোকজনদের

www.pathagar.com

বৈরিতা ও বিশ্বাসঘাতকতা, প্রভাবশালী বাঙালীদের স্বার্থপরতা, মোগল সাম্রাজ্যের অংশ হিসেবে বাংলার দুর্বলতর অবিচ্ছেদ্যতা, বাংলার অবিকশিত নৌবাহিনী, বিশ্বব্যাপী দেশ জয়ের ইউরোপীয় উন্মাদনা এবং ঔপনিবেশিক আধিপত্য বিস্তারের ফলাফল হিসেবেই সিরাজউদ্দৌলার পতন ঘটে। সিরাজের পতনের মধ্য দিয়েই পাশ্চাত্যের কাছে প্রাচ্যের, ইউরোপের কাছে এশিয়ার পরাজয় ঘোষিত হয়। নবাবের সংগ্রাম এবং পরাজয় স্বাভাবিক পরিণতির সূচনা করলেও এটি ছিলো পশ্চিমা শক্তি ও আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রাচ্যের ব্যর্থ প্রতিরোধ। স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষায় নবাব সিরাজউদ্দৌলা সাফল্য লাভ করেননি, কিন্তু তিনি স্বদেশকে তুলে দেননি সাম্রাজ্যবাদের হাতে। দেশই তাঁকে এর মাটির সাথে আবদ্ধ রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। একজন ইংরেজ ঐতিহাসিকের মূল্যায়ন এ সম্পর্কে প্রণিধানযোগ্য ঃ 'সিরাজউদ্দৌলার যে সকল দোষই থাক না কেন, তিনি কখনো তাঁর প্রভুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেননি, কখনো দেশকে বিকিয়ে দেননি, পলাশীর প্রান্তরের মর্মান্তিক নাট্যমঞ্চে একমাত্র তিনিই ছিলেন মূল নায়কলাশী। যুদ্ধের সাফল্যের কৃতিত্ব স্বাভাবিকভাবেই ইংরেজদের পক্ষেই যায়। নবাবের বিরুদ্ধে ইংরেজদের অভিযোগসমূহ ছিলো কম-বেশী তাদের কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক আক্রমণের হাতিয়ার। যুদ্ধে ইংরেজদের বিজয় শুধুমাত্র স্থানীয় শাসকের বিরুদ্ধেই ছিলো না, এর মাধ্যমে তারা তাদের আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্রান্সের বিরুদ্ধেও জয়লাভ করে। বাংলায় সিরাজের পতন উপমহাদেশে দুই শতাব্দীকাল বৃটিশ শাসনের উত্থানের সূচনা করে। বাংলা বিজয়ের মধ্যদিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর অর্ধেক সময় ধরে মিসর, সৌদি আরব, তুরস্ক, ইরান এবং আফগানিস্তানে এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যায়, সিরাজউদ্দৌলার পতন এবং মুসলিম শাসনের অবসান বৈশ্বিক পরিসরে এবং আন্তর্জাতিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে।

(অনুবাদ ঃ সালেহ মাহমুদ রিয়াদ)

www.pathagar.com

নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

প্রফেসর এম, এ রহিম

২৩ এপ্রিল (১৭৫৭) ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কলিকাতা কাউন্সিল নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য এক প্রস্তাব পাস করে। হিল লিখিয়াছেন যে, ক্লাইভ উমিচাঁদকে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র গড়িয়া তোলার কাজে ব্যবহার করেন। নবাবের প্রধান সেনাপতি মীরজাফর বিশ্বস্ত ছিলেন না। নবাব আলীবর্দীর সময় হইতেই মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার কুখ্যাতি ছিল। তাঁহাকে কয়েকবার বিশ্বাসঘাতকতার জন্য নবাবের নিকট শাস্তি পাইতে হয়। মীরজাফর আলীবর্দীর ভগ্নিপতি ছিলেন। এই জন্য বৃদ্ধ নবাব তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া পুনরায় সেনাপতি পদে বহাল করেন। কিন্তু মীরজাফরের স্বভাবের পরিবর্তন হয় নাই। মুর্শিদাবাদের মসনদের প্রতি তাহার লোভ ছিল। সিংহাসনের লোভে তিনি নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগ দেন।

ষড়যন্ত্রকারিগণ জগৎশেঠের বাড়ীতে গোপন বৈঠকে মিলিত হয়। জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, রায়দুর্লভ, মীরজাফর, রাজবল্লভ এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এই বৈঠকে যোগ দেন। ইংরাজ কোম্পানীর এজেন্ট ওয়াটস মহিলাদের মত পর্দা-ঘেরা পাল্কিতে জগৎশেঠের বাড়ীতে আসেন। এই বৈঠকে সিরাজউদ্দৌলাকে সরাইয়া মীরজাফরকে বাংলার মসনদে বসাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ওয়াটস এই কাজে ইংরাজদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। ইহার পর কোম্পানীর প্রধানগণ চুক্তিপত্রের খসড়া প্রস্তুত করেন এবং ১৯ মে ইহাতে দস্তখত করেন। মীরজাফর ৪ জুন চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। চুক্তির শর্তানুযায়ী ইংরাজদের সৈন্য সাহায্যের বিনিময়ে মীরজাফর তাহাদিগকে কয়েকটি বাণিজ্য-সুবিধা দিতে স্বীকার করেন। তাহা ছাড়া তিনি ইংরাজ সৈন্যদের ব্যয়ভার বহন করিতে এবং

www.pathagar.com

কোম্পানীকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দুই কোটি টাকা দিতে সম্মত হন। নবাবের কোষাগার হইতে উমিচাঁদকে ২০ লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে বলিয়া বলা হয়। উমিচাঁদকে প্রতারিত করিবার জন্য ক্লাইভ চুক্তিপত্রের দুইটি খসড়া প্রস্তুত করেন। আসল খসড়ায় উমিচাঁদকে টাকা দেওয়ার শর্তের উল্লেখ করা হয় নাই। নকল খসড়ায় এই শর্তটি লিখিত হয়। ইহার দস্তখতগুলি সবই ক্লাইভ জাল করিয়াছিলেন। রায়দুর্লভকেও লুটের মালের কিয়দংশ দেওয়া হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

নবাব সিরাজউদ্দৌলা তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কথা জানিতে পারেন। তিনি মীরজাফরকে প্রধান সেনাপতির পদ হইতে অপসারিত করেন এবং আবদুল হাদী খানকে সে পদে নিয়োগ করেন। আবদুল হাদী ও মীর মদন মীরজাফরকে ধ্বংস করিবার জন্য নবাবকে পরামর্শ দেন। কিন্তু জগৎশেঠ ও অন্যান্য বিশ্বাসঘাতক উপদেষ্টাগণ নবাবকে পরামর্শ দেন যে, ইংরাজদের বিরুদ্ধে শক্তিবৃদ্ধির জন্য মীরজাফরের সহযোগিতা লাভ করা নবাবের পক্ষে সুবিবেচনার কাজ হইবে। নবাব তাঁহাদের উপদেশ গ্রহণ করেন। তিনি মীরজাফরের বাড়ীতে গিয়া নবাব আলীবর্দীর নামে তাঁহার নিকট ইংরাজদের বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্য মর্মস্পর্শী আবেদন জানান। পবিত্র কুরআন হাতে লইয়া মীরজাফর এই সময় অঙ্গীকার করেন যে, তিনি নবাবের জন্য ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন। পবিত্র ধর্মগ্রন্থের নামে অঙ্গীকার করায় মীরজাফরকে অবিশ্বাস করার কোন কারণ ছিল না। নবাব তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া আবার প্রধান সেনাপতি পদে নিয়োগ করেন। বিবেকহীন ও লোভী মীরজাফরকে বিশ্বাস করিয়া নবাব মারাত্মক ভুল করেন। যদি তিনি ঐ সময় মীরজাফর ও তাঁহার সহচরগণকে বন্দী করিতেন, তাহা হইলে অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারিগণ ভয় পাইয়া যাইতেন এবং ক্লাইভ তাঁহার ক্ষুদ্র সৈন্যদলসহ কলিকাতা দুর্গে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইতেন।

www.pathagar.com

সিরাজউদ্দৌলা দিবস

সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন

বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা ষড়যন্ত্র এবং চরম বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়ে পরাজিত এবং নিহত হয়েছিলেন, একথা ইংরেজ ঐতিহাসিকেরাও কোনদিন অস্বীকার করেননি। তবে, ষড়যন্ত্রের সময় সিরাজউদ্দৌলার ব্যক্তিগত এবং স্বেচ্ছাচারিতা সম্বন্ধে যে সমস্ত অপবাদ প্রচারিত হয়, সেগুলি অপনোদন হতে সময় লেগেছে। চল্লিশের দশকে আমি যখন কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে অধ্যাপনা করি, তখন একবার ছাত্ররা সিরাজউদ্দৌলা দিবস উদযাপন করেছিল। আমার স্পষ্ট মনে আছে, সে সভায়ও অপবাদের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়। বক্তারা বলেন যে, সিরাজউদ্দৌলা ছিলেন বাংলার স্বাধীনতার শেষ প্রতীক। হলওয়েল মনুমেন্ট নির্মাণ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তাঁর বিরুদ্ধে স্থায়ীভাবে একটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ধারণা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, ছোট একটি কামরায় কতকগুলি নারী-পুরুষকে আবদ্ধ রেখে তাঁদের অনেকের মৃত্যু ঘটানোর মত অমানবিক বর্বরতা সিরাজউদ্দৌলা অনুষ্ঠিত করেছিলেন বলে যে অভিযোগ তা একেবারেই অলীক। কলকাতার মুসলমান ছাত্রদের আন্দোলনের চাপে শেষ পর্যন্ত সরকার Black Hole tragedy বা অন্ধকূপ হত্যার নিদর্শনটি সরিয়ে নিতে বাধ্য হন।

বাংলার বিশেষ করে কলকাতার মুসলমান ছাত্র যারা চল্লিশের দশকে পাকিস্তান আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে তারা পলাশীর যুদ্ধ ক্ষেত্রে লুপ্ত স্বাধীনতা উদ্ধারের আন্দোলন হিসাবে ঐ আন্দোলনকে চিহ্নিত করে। যদিও কোন কোন হিন্দু পুনর্জাগরণের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে দেখেছেন সবাই তা করেননি। একদিকে ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইংরেজ শাসনের

www.pathagar.com

ঘটনাকে নতুন জীবনের উন্মেষ হিসাবে দেখলেও কবি নবীন চন্দ্র সেনের মত ব্যক্তিও ছিলেন যাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, সিরাজের পরাজয়ের অর্থ ছিল স্বাধীনতা লুপ্তি। জনসাধারণ অবশ্য এ বিষয়ে কখনও ভুল করেনি। মীরজাফর-যিনি ছিলেন সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রধান নায়ক তাঁর নাম এবং বিশ্বাসঘাতক এ দুটো কথা বাংলা ভাষায় সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে-১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পর থেকে। এমনকি যারা সিরাজউদ্দৌলার পতন নিয়ে উল্লাস প্রকাশ করে তারাও যে কৌশলে মীরজাফর এবং তার অনুচরেরা এই বিপর্যয় ঘটিয়েছিলেন তার প্রশংসা করতে সাহস পায়নি বিশ্বাসঘাতকরা। বিশ্বাসঘাতকরা তাকে নানাভাবে রঞ্জিত করলেও সেটা বিশ্বাসঘাতকতাই থেকে যায়।

সিরাজউদ্দৌলা তার আমলের বিশ্বাসঘাতকতার সাফল্যের অন্যতম কারণ ছিল জনসাধারণের মধ্যে দেশাত্মবোধের অভাব। এ অভিযোগ হয়ত সর্বতোভাবে সঠিক নয়, কিন্তু মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, মীরজাফর, জগৎশেঠ জানতেন যে, তাঁদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের পক্ষ থেকে কোন প্রতিবাদ হবে না। সে যুগে খবরের কাগজ এবং রেডিও ছিল না। লোকে মনে করত, দেশরক্ষার ভার শাসনকর্তাদের উপর। শাসনকর্তাদের দ্বন্দ্বকে তারা উপরওয়ালাদের দ্বন্দ্ব হিসাবে উড়িয়ে দিত। তবে, প্রতিবাদের অভাবে আর একটা কারণ শিক্ষিত সমাজের মধ্যে নেতৃত্বের অভাব। সিরাজউদ্দৌলার কয়েক শতাব্দী আগের একটি ঘটনা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বাংলার সনাতনী যুগের প্রারম্ভে যখন একবার বিশ্বাসঘাতকেরা কৌশলে ক্ষমতা দখল করার চেষ্টা করেছিল তখন সে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয় নূর কুত্‌বে আলম নামক একজন বিখ্যাত আলেমের হস্তক্ষেপের ফলে। বলা প্রায় নিষ্প্রয়োজন যে, নূর কুতুবে আলমের মত ব্যক্তিত্ব তখন যদি অনুপস্থিত থাকতো বাংলার ইতিহাস অনেক আগেই বদলে যেত। হয়তো এটা সিরাজউদ্দৌলার দুর্ভাগ্য যে, তিনি তেমন কোন ব্যক্তির সমর্থন পাননি বা পাবার সুযোগ পাননি।

বিশ্বাসঘাতকতা অবশ্য যে-কোন যুগে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। জনসাধারণ শিক্ষিত এবং আত্মসচেতন হলেই যে কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করতে সাহস পাবে না তা নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ১৯৪০ সালে নাৎসী জার্মানী যখন নরওয়ের উপর আক্রমণ করে কুইজলিং নামক এক নরওয়ে জিয়ানও হিটলারকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। কুইজলিং শব্দটি এমন মীরজাফরের মত বিশ্বাসঘাতকদের সমার্থক। কুইজলিং কোন ব্যক্তির নাম-এ কথাও অনেকে ভুলে গেছে। তবে, কুইজলিং মীরজাফরের মত তার মসনদে বেশীদিন টিকতে পারেননি। হিটলারের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তার পতন ঘটে।

বাংলার ইতিহাস একটু অন্যরকম। মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে সচেতন হলেও ওটাকে একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ভাবতে অনেকে অভ্যস্ত। অতি অল্পসংখ্যক লোকই ভাবে যে, বিশ্বাসঘাতকতার বহু রূপ থাকতে পারে। একটি রাষ্ট্রের স্বাধীনতা-তা সে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা তমদ্দুনিক স্বাধীনতা হোক না কেন, যারা বিকিয়ে দিতে চায় তারাই বিশ্বাসঘাতক। দেশের প্রতি, নিজের সমাজের প্রতি তাদের আনুগত্য নেই।

এ ধরনের বিশ্বাসঘাতকতার কারণ নানা প্রকারের। কেউ রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের আশায় বিদেশী শক্তিকে দেশে কায়েম করে তার ছত্রচ্ছায়ায় কৃত্রিম ক্ষমতা

www.pathagar.com

ভোগকে সত্যিকার স্বাধীনতা মনে করে। কেউ ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্যে বেশী করে মুনাফা অর্জনের লোভে দেশ ও জাতিকে পরাধীন করতে দ্বিধা করে না। আবার কেউ ভূয়া আদর্শবাদের দোহাই দিয়ে নিজেদের সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা বিসর্জন দিতে এগিয়ে আসে। এসবই বিশ্বাসঘাতকতা।

বিশ্বাসঘাতকতা বিভিন্ন রকমের ছদ্মবেশ ধারণ করে হাজির হয়- বিশেষতঃ আজকালকার যুগে। কারণ, মীরজাফর বা কুইজলিং-এর বিশ্বাসঘাতকতার মত স্থূল বিশ্বাসঘাতকতা আজকালও বিরল না হলেও তার আবেদন সংকুচিত হয়ে গেছে। বর্তমান যুগের বিশ্বাসঘাতকদের তাই সূক্ষ্ম ছদ্মবেশ ধারণ করে লোক সমক্ষে উপস্থিত হতে দেখা যায়। আদর্শবাদের ছদ্মবেশই এর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক। কারণ আদর্শবাদের পিছনে বিশ্বাসঘাতকতা লুকিয়ে থাকতে পারে। এ সন্দেহ সহজে কোনো মনে উদিত হয় না। যাঁরা এ ধরনের বিশ্বাসঘাতকতায় লিপ্ত তাঁরা কস্মিনকালেও দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে কোন শব্দ উচ্চারণ করেন না। সমাজে তাঁরা দেশপ্রেমিক হিসাবে পরিচিত। কিন্তু তাঁরা অনবরত এমন সব কর্মে সমাজকে উৎসাহিত করছেন, যার অনিবার্য পরিণতি হবে দেশের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা লুপ্তি।

সিরাজউদ্দৌলাকে স্মরণ তখনই অর্থবহ হবে যখন আমরা বাংলাদেশের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে যে সমস্ত সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র বর্তমানে দানা বেঁধে উঠছে, সে সম্বন্ধে আমরা সতর্ক হতে পারি। অনেক তরুণ যারা ভালো করে সমাজের ইতিহাস জানে না, তারা অজ্ঞাতসারে এই ষড়যন্ত্রের শিকার হয়। তরুণরা স্বভাবতই আদর্শবাদী। তাদের আদর্শবাদিতার সুযোগ নিয়েই তাদের মনে অনেক বিশ্বাস সঞ্চার করা হচ্ছে, যার একমাত্র অর্থ হচ্ছে যে, বাংলাদেশের আলাদা কোন শিল্পকলা নেই। যাঁরা আবহমানকাল থেকে পূর্ব বাংলার জনসমাজকে ঘৃণা এবং অবজ্ঞা করে এসেছেন, সে সমস্ত ব্যক্তিকে বাংলাদেশের জাতীয় বীর হিসাবে আমাদের সামনে দাঁড় করানো হচ্ছে। আশ্চর্য হয়ে শুনছি যে, এঁরাই না-কি পূর্ব বাংলার সত্যিকারের মঙ্গলাকাংখী।

এ রকমের প্রচারণা সম্ভব হচ্ছে এই কারণে যে, সমাজের তরুণদের মধ্যে ইতিহাস-চেতনা নেই, তারা অতীত সম্বন্ধে বিভ্রান্ত। এই বিভ্রান্তি দূর না হওয়া পর্যন্ত সিরাজউদ্দৌলা দিবস উদযাপন সত্যিকার অর্থে সার্থক হবে না।

তবে অনেক দিন পর সিরাজউদ্দৌলাকে স্মরণ করার কথা মনে হয়েছে, এটা অবশ্যই একটা সুলক্ষণ। চল্লিশের দশকে যেমন তিনি লুপ্ত স্বাধীনতার প্রতীক হিসাবে অভিনন্দিত হয়েছিলেন, তেমনই আজও তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতীকী তাৎপর্য নিঃশেষিত হয়নি। মীরজাফরের দলও নির্মূল হয়নি। দেশের, সমাজের স্বকীয়তা রক্ষা করতে হলে ১৭৫৭ সালের সেই দুর্যোগের কারণ এবং তার ভয়াবহ পরিণতির কথা সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে।

www.pathagar.com

পলাশীর বিপর্যয় এবং আমাদের কর্তব্য

সৈয়দ আলী আহসান

এক সময় মোঘল সাম্রাজ্যের অধীনে বঙ্গদেশ ভূখণ্ড একটি প্রদেশ ছিল। মোঘল সম্রাটদের নিযুক্ত প্রাদেশিক শাসনকর্তা কর্তৃক এ অঞ্চলটি শাসিত হতো। কিন্তু সম্রাট আওরঙ্গজেবের পরে মোঘল শাসকবর্গ দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে থাকে এবং এক পর্যায়ে বঙ্গ ভূখণ্ড স্বাধীন হয়ে যায় এবং মুর্শিদকুলি খানের অধীনে বঙ্গ অঞ্চলে একটি নতুন শাসন প্রবর্তিত হয়। মুর্শিদকুলি খান মোঘলদের দুর্বল শাসন থেকে বঙ্গ ভূখণ্ডকে মুক্ত করেন এবং এভাবেই বহিরাগত শোষণ থেকে এদেশ মুক্ত হয়। ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলি খানের মৃত্যু ঘটে এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জামাতা সুজাউদ্দিন বাংলার নবাব হন। তখন বাংলার সাথে উড়িষ্যাও যুক্ত ছিল। ক্রমশ বিহারও বাংলার সাথে যুক্ত হয়ে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা একটি শাসনবৃত্তের মধ্যে চলে আসে। এভাবে একটি নতুন সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। সুজাউদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর দুর্বল পুত্র সরফরাজ খান ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিহারের ডেপুটি গভর্নর আলীবর্দী খান পরের বছরই অর্থাৎ ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং সরফরাজ খানকে পরাভূত করে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার নবাব হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করেন। আলীবর্দী খান অত্যন্ত শক্তিশালী ও দক্ষ শাসক ছিলেন। কিন্তু তার সময়েই মারাঠা অশ্বারোহী দস্যুরা বারবার বাংলা আক্রমণ করে ও লুণ্ঠন করে। এর ফলে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ প্রভূত নির্যাতনের শিকার হয়। মারাঠাদের হাত থেকে বাংলাকে বাঁচাবার জন্য আলীবর্দী খান মারাঠাদের সাথে এমন একটি চুক্তিতে উপনীত হন যা বঙ্গের প্রশাসনকে দুর্বল করে দেয়। তিনি উড়িষ্যা

www.pathagar.com

প্রদেশটি মারাঠাদের দিয়ে দেন এবং তাদেরকে বছরান্তে 'চৌথ' হিসেবে ১২ লক্ষ টাকা প্রদানে স্বীকৃত হন। এভাবে বঙ্গভূমির অর্থনৈতিক যে দুর্দশা ঘটলো তা থেকে বাঁচবার জন্য আলীবর্দী খান ইংরেজদেরকে বাংলাদেশে বাণিজ্য করবার অধিকার দিলেন। তিনি তখন ধারণা করতে পারেননি যে, আপাতত অর্থাগমের সুযোগ হলেও পরবর্তীতে এই ইংরেজদের হাতেই বাংলার স্বাধীনতা বিলুপ্ত হবে।

আলীবর্দী খানের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। এর ফলে আলীবর্দী খানের মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা আমেনার পুত্র সিরাজদ্দৌলা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু এর ফলে আলীবর্দী খানের গৃহে পারিবারিক অশান্তি সৃষ্টি হলো। আলীবর্দী খানের আরও দু'জন কন্যা ছিল, তারা উভয়ই সিংহাসনের দাবিদার হয়ে ওঠে। জ্যেষ্ঠা কন্যা ঘসেটি বেগম প্রবলভাবে সিরাজদ্দৌলার বিরোধিতা করতে থাকেন এবং দ্বিতীয়া কন্যার পুত্র শওকত জঙ্গ এ বিরোধিতায় যোগ দেন। রাজবল্লভ ঘষেটি বেগমকে সাহায্য করতে থাকেন। এভাবে প্রথমে সিরাজদ্দৌলা একদিকে ঘষেটি বেগম অন্যদিকে শওকত জঙ্গ-এর বিরোধিতার মুখোমুখি হন। যদি পারিবারিক এই বিরোধিতাই একমাত্র বিরোধিতা হতো তাহলে সিরাজদ্দৌলা নিশ্চয়ই তা কাটিয়ে উঠতে পারতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি ইংরেজদের সাথে একটি বিরোধিতায় জড়িয়ে পড়েন।

ইংরেজদের সঙ্গে বিরোধিতার কয়েকটি কারণ ছিল। প্রধান কারণ হলো ইংরেজরা কৌশলে নবাবের বিরুদ্ধ-পক্ষের প্রতি নিজেদের সমর্থন প্রকাশ করতে থাকে। একে তো ঘসেটি বেগমের পক্ষে রাজবল্লভের সমর্থন তৈরি হয়েছে, তার সাথে আবার ইংরেজদের সমর্থন তৈরি হলো। সিরাজদ্দৌলা স্বাভাবিকভাবে ইংরেজদের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। আলীবর্দী খান ইংরেজদের কয়েকটি শর্তে বাণিজ্য করার সুযোগ দিয়েছিলেন। এই বাণিজ্যের অতিরিক্ত কোন কর্মকাণ্ডে যুক্ত হওয়ার অধিকার তাদের ছিল না। আলীবর্দীর সাথে ইংরেজদের চুক্তিতে এরকম একটি সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল যে, ইংরেজরা বঙ্গ ভূখণ্ডে তাদের অবস্থানগুলোকে কখনও সৈন্য-সামন্ত দিয়ে সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে পারবে না। কিন্তু এই চুক্তি ভঙ্গ করে ইংরেজরা আত্মরক্ষামূলক দুর্গ নির্মাণ করতে থাকে এবং নবাবের প্রশাসনের বিরুদ্ধে গোপনে ষড়যন্ত্র করতে থাকে। ফরাসীরাও সে সময় তাদের অবস্থানকে শক্তিশালী করবার চেষ্টা করেছিল। নবাব সিরাজদ্দৌলা এতে ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হন এবং ইংরেজ ও ফরাসী উভয়কে তাদের দুর্গগুলোকে ভেঙ্গে ফেলবার আদেশ দেন। নবাবের আদেশ ফরাসীরা পালন করে, কিন্তু ইংরেজরা পালন করে না। তারা ক্রমশ বেপরোয়া হয়ে উঠে। এ সময় রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস তার পরিবার-পরিজন ও প্রচুর অর্থসহ কলকাতায় পালিয়ে যায়। কৃষ্ণদাসকে ইংরেজরা আশ্রয় দেয়। নবাব সিরাজদ্দৌলা কৃষ্ণদাসকে প্রত্যর্পণের জন্য ইংরেজদেরকে আদেশ করেন, কিন্তু ইংরেজরা রাজি হয় না। তখন ক্রুদ্ধ নবাব তার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করে ইংরেজদের পরাভূত করে কলকাতা দখল করেন। যে সমস্ত ইংরেজ সিরাজদ্দৌলার হাতে বন্দী হন তাদেরকে আঠার ফিট লম্বা এবং দশ ইঞ্চি চওড়া একটি অন্ধকার কক্ষের মধ্যে হত্যা করা হয় বলে একটি কাল্পনিক কাহিনী ইংরেজরা তৈরি করে এবং ভারতে অবস্থানরত সকল ইংরেজকে বিক্ষুব্ধ করে তোলার

www.pathagar.com

ব্যবস্থা নেয়। মাদ্রাজে যখন এ খবর পৌঁছায় তখন কলকাতা পুনর্দখলের জন্য ক্লাইভের নেতৃত্বে এবং ওয়াটগণের সেনাপতিত্বে একটি ইংরেজ বাহিনী কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করে। ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে ওয়াটসনের সেনাপতিত্বে ক্লাইভ কলকাতা পুনরুদ্ধার করেন। ইংরেজদের সাথে যুদ্ধে নবাব কোন প্রকার সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। নবাব ফরাসীদের সাহায্যের আশা করেছিলেন, কিন্তু ইংরেজরা চন্দন নগর দখল করার ফলে ফরাসীরা নবাবকে সাহায্য করতে অক্ষম হয়। তখন নবাব হায়দরাবাদ থেকে ফরাসীদের সাহায্য চেয়ে পাঠান। কিন্তু চন্দন নগরের বিপর্যয়ের পর ফরাসীরা আর এগিয়ে এলো না।

ইংরেজরা সিদ্ধান্ত নিল যে, নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে যেভাবেই হোক সরাতেই হবে এবং এমন একজনকে নবাব পদে বসাতে হবে, যে ইংরেজদের অনুগত হবে। তারা তখন ঠিক করল যে, আলীবর্দী খানের শ্যালক এবং সিরাজউদ্দৌলার সৈন্যাধ্যক্ষ মীরজাফরকে সিংহাসনে বসাতে হবে। নবাব সিরাজউদ্দৌলার কোষাধ্যক্ষ রায়দুর্লভ এবং তৎকালীন বঙ্গভূমির সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী জগৎশেঠ ক্লাইভকে সাহায্য করতে সম্মত হলো। এদের সহায়তা ও সাহায্য নিয়ে ক্লাইভ তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে মুর্শিদাবাদের পলাশী প্রান্তরে গিয়ে অবস্থান নেয়। এ স্থানটি ছিল মুর্শিদাবাদ থেকে তেইশ মাইল দক্ষিণে। ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসের ২৩ তারিখে পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধের ইতিহাস আমরা সবাই জানি। যারা ইতিহাস পাঠ করে থাকেন তারা সকলেই জানেন কত বড় বিশ্বাসঘাতকতা, মিথ্যাচার এবং দেশদ্রোহিতার ফলে সিরাজউদ্দৌলার পতন ঘটেছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে মীরজাফর তার সৈন্য দল নিয়ে এক জায়গায় স্থান ছিল। কিছুসংখ্যক ফরাসী সৈন্যের সাহায্যে মীর মদন ও মোহনলাল শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু কিছুই করতে পারেননি। যদি চন্দন নগরের ফরাসী সৈন্যরা এগিয়ে আসতে পারতো তাহলে নবাবের বিজয়ের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সুচতুর ক্লাইভ অতর্কিতে চন্দননগর আক্রমণ করে বসে এবং ফরাসীদের নিরস্ত্র করে।

সিরাজউদ্দৌলার পতন আমাদের জাতীয় ইতিহাসে একটি বিরাট কলঙ্কস্বরূপ। তিনি যাদেরকে বিশ্বাস ও নির্ভরতা চেয়েছিলেন, তারাই ইংরেজদের সাথে কুচক্রে লিপ্ত হয়ে তার বিরুদ্ধে চলে যায়। মীরজাফর যদি সিরাজউদ্দৌলার পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করত তাহলে পলাশীর পরাজয়টি ঘটত না। দেশদ্রোহিতা, ক্ষমতার লোভ এবং অর্থগৃধ্নুতা মীরজাফরকে উন্মাদ করে তুলেছিল। তাই, একটি যুদ্ধের সেনাপতি হয়েও তার সৈন্য দলকে ইংরেজদের আক্রমণের মুখে নিশ্চল রেখেছিল। এ অপরাধের ক্ষমা নেই। যদি পলাশী যুদ্ধে মীরজাফর দেশদ্রোহিতা না করত এবং সিরাজউদ্দৌলাকে সাহায্য করত তাহলে বাংলার ইতিহাস তথা পরিণামে ভারতের ইতিহাস নতুন করে লিখিত হতো। এদেশে ইংরেজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতো না, তবে ফরাসীদের সাথে একটি সহাবস্থানের চুক্তি হয়তো হতো। সতীনাথ ভাদুরী তাঁর 'সত্যি ভ্রমণকাহিনী' নামক গ্রন্থের এক জায়গায় লিখেছেন যে, পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করে ইংরেজ শাসন এদেশে যখন ক্রমশ স্থায়ী হয়ে পড়ল তখন আমরা এমন একটি জাতির সংস্পর্শে এলাম যাদের সাথে আমাদের কোনরকম মিল নেই। তারা ছিল নিষ্প্রাণ, নিষ্ঠুর এবং কুচক্রী।

www.pathagar.com

অন্যদিকে ফরাসীদের সাথে আমাদের প্রভূত মিল ছিল। তারা ছিল উচ্ছল, প্রাণবন্ত এবং আত্মীয়ের মতো। আমরা যদি ফরাসীদের নিকটে পেতাম তাহলে আমরা একটি অভিনব রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রজ্ঞার মধ্যে পড়তাম যা আমাদের জন্য কল্যাণকর হতো।

সতীনাথ ভাদুরী যা-ই বলুন না কেন, একটি সত্য তিনি বলেছেন। সে সত্যটা এই, ইংরেজের কাছে পরাজিত হয়ে আমরা মহানুভবতাকে হারিয়েছি, মিথ্যার সাথে সহযোগিতা করেছি এবং ন্যায়-নীতির জগতকে আমাদের সামনে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হতে দেইনি। ইসলামের সূত্রপাতে ওহুদের যুদ্ধে ঠিক একই কারণে আমাদের পরাজয় ঘটেছিল। আমাদের একতা ছিল না, আমাদের মধ্যে একটি দল তাদের বাহিনী প্রত্যাহার করে নেয় এবং যুদ্ধক্ষেত্রের শৃঙ্খলা আমরা ভঙ্গ করেছিলাম। যুদ্ধের একটি স্ট্র্যাটেজি আছে-যাকে বলা যায় কুশলী সৈন্য পরিচালনা। রাসূলে খোদা সৈন্য পরিচালনার একটা বিধি ঠিক করে দিয়েছিলেন; সেই বিধি আমরা ভঙ্গ করেছিলাম। তাছাড়া মুসলমানদের কিছু সৈন্য লুণ্ঠনেও নিযুক্ত হয়েছিল। ওহুদের যুদ্ধে আমাদের পরাজয় থেকে আমরা নিজেদের আবার প্রস্তুত করেছিলাম। পরবর্তীতে খন্দকের যুদ্ধে মুসলমান পক্ষ বিজয়ী হয়েছিল, কেননা ওহুদের বিপর্যয় থেকে তারা শিক্ষালাভ করেছিল। খন্দকের যুদ্ধে মিথ্যার মৃত্যু হয়, কুরাইশদের দাম্ভিকতার চিরসমাপ্তি ঘটে এবং পৃথিবীতে ইসলাম চিরস্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পলাশীর বিপর্যয় আমরা যেন এখনও কাটিয়ে উঠতে পারছি না। এখনও মিথ্যার অপকৌশলে আমরা বিভ্রান্ত হচ্ছি, এখনও আমাদের সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনে কুচক্রীদের আনাগোনা চলছে, এখনও অবিশ্বাসীরা আমাদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করছে। এখনও কোন কোন সুযোগ-সন্ধানী মানুষের গোপন বৈরিতায় আমাদের পদস্খলন ঘটছে। এ অবস্থা কোনক্রমেই কাম্য নয়। আমাদের স্বাধীনতাকে আমাদেরই রক্ষা করতে হবে। বহিঃশত্রু সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে এবং সবচেয়ে বড়কথা, আমাদের বিশ্বাসের কোনরূপ স্খলন যেন না ঘটে-সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এগুলো যদি করতে পারি তাহলে আমাদের স্বাধীনতাকে বিশিষ্ট মর্যাদায় আমরা সুরক্ষা করতে পারব।

www.pathagar.com

বাংলার পতনের রাজনৈতিক কারণ

আব্বাস আলী খান

অষ্টাদশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে নবাব সিরাজদ্দৌলার পরাজয় ও বাংলার পতন কোন একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার ফল নয়। যে-সব রাজনৈতিক ঘটনাপুঞ্জের ফলস্বরূপ পলাশীর বিয়োগান্ত নাটকের সমাপ্তি ঘটে, তা সত্যানুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গের অবশ্য জেনে রাখা উচিত। প্রকৃতপক্ষে মোগল সাম্রাজ্যের পতন গোটা উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের পতন ডেকে আনে। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ্ আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর থেকে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত পঞ্চাশ বৎসরে কমপক্ষে সাতজন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তাদের মধ্যে কারো এ যোগ্যতা ছিল না যে, পতনোন্মুক্ত সাম্রাজ্যকে রক্ষা করেন। অবশ্য কতিপয় অবিবেচক ঐতিহাসিক আওরঙ্গজেবকে মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের জন্যে দায়ী করেন। ইতিহাসের পুংখানুপুংখ যাচাই-পর্যালোচনা করলে এ সত্যটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ধ্বংসের বীজ বহু পূর্বেই স্বয়ং বাদশাহ আকবর কর্তৃক বপন করা হয়েছিল এবং তা ধীরে ধীরে একটি বিরাট বিশাল মহীরুহের আকার ধারণ করছিল। আওরঙ্গজেব সারাজীবনব্যাপী তাঁর সর্বশক্তি দিয়ে সে ধ্বংসকে ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারীগণ যদি তাঁর মতো শক্তিশালী ও বিচক্ষণ হতেন-তাহলে সম্ভবত ভারতের ইতিহাস অন্যভাবে রচিত হতো। শ্রদ্ধেয় আকরাম খাঁ তাঁর 'মোছলেম বংঙ্গের সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থে মন্তব্য করেন ঃ

"আকবরের রাজত্বকালের সকল অপকর্মের পরিণাম ভোগ তাঁহার মৃত্যুর সাথেই শেষ হইয়া যায় নাই। মোগল সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁহার সকল উত্তরাধিকারীকে জীবনের যথাসর্বস্ব দিয়া এই অপকর্মের ফল ভোগ করিতে হইয়াছিল। ভারতের দশ কোটি মুসলমান আজ পর্যন্ত আকবরের অপকর্মের দরুন ক্ষতিপূরণের অবশিষ্ট উত্তরাধিকার দায়িত্ব

www.pathagar.com

হইতে অব্যাহতি পায় নাই। মুসলমান পাঠকদের নিকট এই উত্তরাধিকারের প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত কোন আলোচনার প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি না।"

বলতে গেলে আকবর ছিলেন নিরক্ষর অথবা অতি অল্প শিক্ষিত। পনেরো ষোল বৎসর বয়সে তিনি সিংহাসন লাভ করেন। একটি নিরক্ষর বালক যুবরাজের পক্ষে শত্রু পরিবেষ্টিত দিল্লীর রাজশাসন পরিচালনা কিছুতেই সম্ভব হতো না, যদি অতি বিচক্ষণ ও পারদর্শী বাইরাম খান, প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্য না করতেন। সৎ সংসর্গ লাভের অভাবে আকবর বিরাট সাম্রাজ্য লাভের পর স্বভাবতঃই ভোগ বিলাস, উচ্ছৃংখলতা ও নৈতিক অধঃপতনের মধ্যে নিমজ্জিত হন। বাইরাম খান তাঁকে সকল প্রকার চেষ্টা করেও সুপথে আনতে পারেননি। মদ্যপান ও তার স্বাভাবিক আনুষংগিক পাপাচার এবং তাঁর আশাতীত রাজনৈতিক সাফল্য তাঁর চরিত্র গঠন বা সংশোধনের কোন সুযোগই দেয়নি। কিন্তু তার এই ব্যাধিগ্রস্ত প্রতিভা তাঁর ভবিষ্যৎ বংশধর ও মুসলিম জাতির কোন কল্যাণ সাধন করার পরিবর্তে অকল্যাণ ও ধ্বংসের বীজ বপন করে গেছে। মুসলমানদের তামাদ্দুনিক ও রাজনৈতিক জীবনের সকল শক্তি নিঃশেষ করে দিয়ে তাদেরকে অপরের রাজনৈতিক ও মানসিক গোলামে পরিণত করার জন্যে ভারতের হিন্দু মানসিকতা নীরবে ও অব্যাহতগতিতে যে কাজ করে যাচ্ছিল, আকবরের তীক্ষ্ণ অথচ অসুস্থ প্রতিভা তার পূর্ণ সহায়ক হয়েছে। ভারতে তাঁর রাজনৈতিক শক্তি অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে আকবর হিন্দুদের সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়েই ক্ষান্ত হয়নি, বরঞ্চ তাদের মনস্তুষ্টির জন্যে 'দ্বীনে এলাহী' নামে এক উদ্ভট ধর্মীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলমানদের ধর্ম ও তামাদ্দুনকে ধ্বংস করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। আকবরনামায় এর বিস্তারিত বিবরণ দেখতে পাওয়া যায়।

মজার ব্যাপার এই যে, বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রয়োজনে আকবরের জীবনের বৃহত্তম স্বপ্নসাধ এই স্বকপোলকল্পিত 'দ্বীনে এলাহী' হিন্দু জাতিকে মোটেই আকৃষ্ট করতে পারেনি। একমাত্র বীরবল ব্যতীত কেউ এ নবধর্মমত গ্রহণে সম্মত হননি। তাঁর দরবারের নবরত্নের মধ্যে অন্যতম রত্নাবলী মানসিংহ এ তোডরমল এ ধর্মমত প্রত্যাখ্যান করেছেন। আকবর কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা জড়িত করে চন্দন চর্চিত দেহে হিন্দু সন্ন্যাসীর বেশে দরবারে উপস্থিত হলে হিন্দুপণ্ডিত ও সভাসদগণ 'দিল্লীশ্বরো' বা 'জগতীশ্বরো' ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করতে এবং ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত সে ধ্বনি প্রতিধ্বনিত করে তাঁর প্রতি কৃত্রিম আনুগত্য প্রদর্শন ও শ্রদ্ধা নিবেদন করলেও তাঁর উদ্ভট ধর্মের প্রতি কণামাত্র আনুগত্য প্রকাশ করেননি। অতএব কোন এক চরম অশুভ শক্তি শুধুমাত্র মুসলমানদের তৌহিদী আকীদাহ্-বিশ্বাস ও ইসলামী তামাদ্দুন ধ্বংসের জন্যে আকবরের প্রতিভাকে ব্যবহার করেছে, তা বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই সহজে উপলব্ধি করতে পারেন। কিন্তু আকবর তাঁর জীবনের স্বপ্নসাধ বাস্তবায়িত করতে চরমভাবে ব্যর্থ হন।

এ তো গেল তাঁর জীবনের একদিক। তাঁর রাজনৈতিক জীবনেও এসেছিল চরম ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যের গ্লানি।

আকবর ভারতের তদানীন্তন পাঠানশক্তি তথা দুর্ধর্ষ মুসলিম সামরিক শক্তি ধ্বংস করেছিলেন। এ বিধ্বস্ত সামরিক শক্তির বিকল্প কোন মুসলিম শক্তি গড়ে তোলা তো দূরের কথা, যা অবশিষ্ট ছিল তাও দুর্বল ও নিঃশেষ করে ফেলেন। বাইরাম খান,

www.pathagar.com

আহসান খান, মুয়াজ্জম খান প্রভৃতির হত্যাকাণ্ডের মধ্যে আকবরের এ ধ্বংসাত্মক নীতির প্রকাশ পাওয়া যায়। এমনকি বহিরাগত বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের বিরুদ্ধেও তিনি দমনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। এমনিভাবে শত্রুর ইংগিতে তিনি আপন গৃহ স্বহস্তে আগুন লাগিয়ে ভস্মীভূত করেন। মোগল সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ বিপদের সময় কাজে লাগতে পারে-এরূপ সকল শক্তি ও প্রতিভাকে ধ্বংস করে দেয়ার ফলে তিনি ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়েন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, পাশ্চাত্যের খৃস্টান জাতিগুলি দ্রুত তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তার করে চলেছিল এবং তাদের অশুভ তৎপরতার ঢেউ মোগল সাম্রাজ্যের সীমান্তে এসে আঘাত করছিল। যে ইসলামের প্রাণশক্তি এসব তৎপরতা সাফল্যের সাথে রুখে দাঁড়াতে পারতো, তা আগেই ধ্বংস করেছেন। অতএব খৃস্টানদের রাজনৈতিক স্বার্থের সাথে অসম্মানকর সন্ধি স্থাপনে এবং তাদের ধর্মের প্রতি সশ্রদ্ধ আনুগত্য করেও মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পথ রুদ্ধ করতে পারলেন না।

বৈদেশিক বিধর্মী শক্তির ন্যায় দেশের অভ্যন্তরেও যে হিন্দুশক্তি দ্রুত মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল, তাও আকবরের দৃষ্টির অগোচর ছিল না। কিন্তু রাজনৈতিক দিক দিয়ে তিনি হয়ে পড়েছিলেন ভারতের হিন্দুশক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। অতএব তাদেরকে তুষ্ট করার বিভিন্ন পথ অবলম্বন করেন। হিন্দু নারীগণকে মহিষীরূপে শাহীমহলে এনে তথায় মূর্তিপূজা ও অগ্নিপূজার নিয়মিত অনুষ্ঠান করেও মোগল সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারলেন না। সর্বশক্তিমান সত্তা পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীর খোদাকে পরিত্যাগ করে অন্যান্য বিভিন্ন খোদার আশ্রয়প্রার্থী হয়েও কোন লাভ হলো না।

ইসলাম ধর্মকে পুরাপুরি পৌত্তলিকতার ছাঁচে ঢেলে এবং হিন্দুধর্ম অক্ষুণ্ন রেখে 'দ্বীনে এলাহী' নামে নতুন এক ধর্মের ছায়াতলে ভারতের হিন্দু মুসলমানকে একজাতি বানাবার হাস্যকর পরিকল্পনাও তাঁর ব্যর্থ হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি যে মনমানসিকতার সৃষ্টি করে অশুভ উত্তরাধিকার রেখে গেলেন তা শুধু সুযোগ্য পুত্র জাহাঙ্গীরই আঁকড়ে ধরেননি বরঞ্চ বিংশতি শতাব্দীর শেষার্ধেও এক শ্রেণীর মুসলমান সে উত্তরাধিকার দ্বারা লালিত পালিত হচ্ছেন। মুসলিম ধর্মীয়, জাতীয় ও সাংস্কৃতিক অধঃপতনের এ এক চরম বেদনাদায়ক নিদর্শন সন্দেহ নেই।

জাহাঙ্গীর মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংস ত্বরান্বিত করেন। ১৬০৯ খৃস্টাব্দে ক্যাপ্টেন হকিন্স আগ্রায় আগমন করলে তাকে রাজকীয় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাকে ঘনিষ্ঠ সহচর হিসাবে গ্রহণ করেন, খেতাব ও বৃত্তিদান করেন। বিবাহ করে ভারতে বসবাস করার ইচ্ছা পোষণ করলে শাহী মহলের একজন শ্বেতাংগী তরুণীর সাথে বিবাহের প্রস্তাব দেন।

শাহী মহলে খৃস্টধর্মের এতখানি প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে, কয়েকজন শাহজাদা খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হন এবং হকিন্সের নেতৃত্বে অন্যান্য খৃস্টান প্রবাসীদের সাথে পঞ্চাশজন অশ্বারোহী পরিবেষ্টিত মিছিল সহকারে গীর্জায় গমন করতেন। জাহাঙ্গীর তাঁর ইউরোপীয় বন্ধুবান্ধবসহ সারারাত্রি শাহী মহলে মদ্যপানে বিভোর হয়ে থাকতেন। মোগল সাম্রাজ্যের সমাধি রচনার কাজ আকবর নিজেই করেছিলেন, তা আগেই বলা হয়েছে অতঃপর তাঁর আদর্শহীন মদ্যপায়ী পুত্র জাহাঙ্গীর, স্যার টমাস রো ও তাঁর উপদেষ্টা ও গুরু সুচতুর কূটনীতিবিদ রেভারেন্ডই ফেবী মিলে এ সমাধি রচনার কাজ

www.pathagar.com

ত্বরান্বিত করেন। টমাস রো তাদের বিভিন্ন দাবী দাওয়া মঞ্জুর করে নিতে জাহাঙ্গীরকে সম্মত করেন। সুরাটে প্রতিষ্ঠিত কারখানাটির দ্বারা ইংরেজগণ শুধু বাণিজ্যিক সুবিধা লাভেরই সুযোগ পায়নি, বরঞ্চ এ কারখানাটি তাদের একটি শক্তিশালী সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত হয়। শাহী সনদের শর্ত অনুযায়ী শুধু সুরাটেই নয়, মোগল সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থানেও, যথা আগ্রা, আহমদাবাদ ও বুচে ইংরেজদের কারখানা তথা সামরিক ঘাঁটি গড়ে উঠে। এভাবে আকবর ও জাহাঙ্গীর মোগল সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে খাল খনন করে দূরদেশ থেকে সর্বগ্রাসী কুম্ভীর আমদানি করেন।

একদিকে বিদেশী শক্তি ইংরেজ ভারতে উড়ে এসে জুড়ে বসলো, অপরদিকে ভারতের হিন্দুশক্তিও প্রবল হয়ে উঠলো। রাজপুত এবং মারাঠা শক্তি মোগল সাম্রাজ্যের পরম শত্রু হয়ে দাঁড়ালো। আকবর যে মুসলিম শক্তির ধ্বংস সাধন করেছিলেন, আওরঙ্গজেব পাদ্‌শাহ্ গাজী সেই লুপ্ত শক্তির পুনরুদ্ধারের জন্যে আজীবন সংগ্রাম করেন। মারাঠা ও রাজপুত শক্তি দমনে তাঁকে দীর্ঘদিন ধরে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়। তাঁর পর যদি তাঁর উত্তরাধিকারীগণ শক্তিশালী ও বিচক্ষণ হতেন, তাহলে হয়তো পতনোন্মুখ সাম্রাজ্যকে রক্ষা করা যেতো। কিন্তু পরম পরিতাপের বিষয় এই যে, তাঁর মৃত্যুর পর থেকে আরম্ভ করে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত যাঁরাই দিল্লীর সিংহাসন অলংকৃত করেছিলেন, তাঁরা ছিলেন শাসন কার্য পরিচালনায় অযোগ্য, বিলাসী ও অদূরদর্শী।

একথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, অমুসলিম ঐতিহাসিকগণ মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনের জন্যে একমাত্র আওরঙ্গজেবকেই দায়ী করেন। বাংলার হোসেন শাহ ও সম্রাট আকবরের উচ্চ প্রশংসায় যতটা তাঁরা পঞ্চমুখ, ততটা আওরঙ্গজেবের চরিত্র কলংক লেপনে তাঁরা ছিলেন সোচ্চার। তাঁকে চরম হিন্দু বিদ্বেষী বলে চিত্রিত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, তাঁর অনুসৃত হিন্দু স্বার্থের পরিপন্থী শাসননীতি এবং বিশেষ করে জিজিয়া প্রথার পুনঃ প্রবর্তন ভারতের হিন্দুজাতিকে মোগলদের শত্রুতা সাধনে বাধ্য করে। কিন্তু এ অভিযোগগুলি নিছক কল্পনাপ্রসূত ও দূরভিসন্ধিমূলক। ইতিহাস থেকে এর কোন প্রমাণ পেশ করা যাবে না। সত্য কথা বলতে গেলে, রাজপুত এবং মারাঠাগণ ভারতের মুসলিম শাসনকে কিছুতেই মনে প্রাণে মেনে নিতে পারেনি। তাদের ক্রমবর্ধমান শক্তি ও শত্রুতার মনোভাব লক্ষ্য করে আকবর তাদেরকে তুষ্ট করার জন্যে অতিশয় উদারনীতি অবলম্বন করেও ব্যর্থ হয়েছে। শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠাগণ আওরঙ্গজেবের চরম বিরোধিতা করেন। তিনি জিজিয়া কর প্রবর্তিত করার এক বৎসর পূর্বে, ১৬৭৯ খৃস্টাব্দে শিবাজী মৃত্যুবরণ করেন। অতএব জিজিয়া করই হিন্দুজাতির বিরোধিতার কারণ ছিল, একথা মোটেই ন্যায়সংগত নয়।

একথা অনস্বীকার্য যে, তৎকালীন ভারতের ইতিহাস যাঁরা লিখেছিলেন তাঁরা সকলেই বলতে গেলে ছিলেন মুসলমান। তাই সে সময়ের প্রকৃত ইতিহাস জানতে হলে অধ্যয়নের প্রয়োজন হবে বাদাউনী, আকবরনামা, কাফীখান, তারিখে ফেরেশতা, মা'য়াসিরে আলমগীরী প্রভৃতি। কিন্তু ইউরোপীয় খৃস্টান ঐতিহাসিকগণ ইতিহাসের বহু ঘটনাকে বিকৃত করে পেশ করেছেন। পরবর্তীকালে অর্ধপৃথিবী জুড়ে তাঁদের সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করেছিল। সর্বত্র তাঁদের সাম্রাজ্য জুড়ে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রচলিত ছিল

www.pathagar.com

ইংরেজী ভাষা। এ ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতার ছত্রছায়ায় মুসলমানদের ইতিহাসের এক বিকৃত ও কল্পিত রূপ তাঁরা তুলে ধরেছেন ইংরেজী ভাষার ইতিহাসের ছাত্রদের সামনে। ভারতে ইংরেজদের দু'শ' বছরের শাসনকালে এ বিকৃত ও ভ্রান্ত ইতিহাস ছাত্রদের মনমস্তিষ্কে বদ্ধমূল করে দেয়া হয়েছিল।

এ বিকৃতকরণের কারণও ছিল। বাদশাহ্ আওরঙ্গজেবের কথাই ধরা যাক। বাদশাহ্ আকবর ও জাহাঙ্গীর কর্তৃক ইংরেজদেরকে অন্যায়ভাবে অতিমাত্রায় প্রশ্রয় দানের ফলে মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে তারা একটা শক্তি হিসাবে গড়ে উঠছিল। বাদশাহ আওরঙ্গজেব তা বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর আমলে বাংলার মীর জুমলা ও নবাব শায়েস্তা খান বার বার ইংরেজদের ঔদ্ধত্য দমিত ও প্রশমিত করেছেন। ব্যবসায় দুর্নীতি, চোরাচালান, মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র প্রভৃতির কারণে তাদেরকে বার বার শাস্তিও দেয়া হয়েছে, তাদের কুঠি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত এক পর্যায়ে বাদশাহ আওরঙ্গজেব ইউরোপীয়দের সাথে তাদের সকল ব্যবসা নিষিদ্ধ করে এক ফরমান জারী করেন। আকবর যে মুসলিম সামরিক শক্তি ধ্বংস করে মোগল সাম্রাজ্যকে শত্রুর মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন, বাদশাহ আওরঙ্গজেব সেই মুসলিম সামরিক শক্তি পুণর্গঠনে আজীবন চেষ্টা করেন। খৃস্টান ও হিন্দুজাতির কাছে উপরোক্ত কারণে আওরঙ্গজেব ছিলেন দোষী। তাই তাঁর শাসনকালকে কলংকময় করে চিত্রিত করতে এবং তাঁর নানাবিধ কুৎসা রটনা করতে তাঁরা তৎপর হয়ে ওঠেন। অমুসলিম ঐতিহাসিকগণ স্বার্থ প্রণোদিত হয়ে আলমগীর আওরঙ্গজেবের চরিত্রে যেসব কলংক আরোপ করেছেন, ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য প্রমাণাদির দ্বারা তারা সবটাই খণ্ডন করেছেন শিবলী নো'মানী তাঁর "আওরঙ্গজেব আলমগীর পর এক নজর" গ্রন্থে। এ সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যবহুল গ্রন্থখানিতে তিনি আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলির সমুচিত জবাব দিয়েছেন।

অতএব ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে একথা দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যেতে পারে যে, আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগের মধ্যে সত্যতার লেশমাত্র নেই। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের জন্যে তাঁকে কণামাত্র দায়ী করা যেতে পারে না। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আকবর কর্তৃক দুর্ধর্ষ মুসলিম সেনাবাহিনীর বিলোপ সাধনের পর ভারতের হিন্দু মারাঠা রাজপুতদের উপর তাঁর নির্ভরশীলতা, বৈদেশিক ও বিধর্মী ইংরেজদের ব্যবসার নামে রাজনৈতিক শক্তি সঞ্চয়, মুসলিম শাসন উৎখাতের জন্যে হিন্দু ও ইংরেজদের মধ্যে অশুভ আঁতাত এবং তার সাথে মুসলমানদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অধঃপতন প্রভৃতি বাংলা তথা ভারত থেকে মুসলিম শাসনের বিলোপ সাধন করেছিল। এ অবস্থায় পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখি কিভাবে পলাশী ক্ষেত্রে বাংলা-বিহারের স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়ে ইংরেজ শাসনের গোড়াপত্তন করে।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে ইংরেজদের ব্যবসাকেন্দ্র গড়ে তোলার পিছনে বিরাট রাজনৈতিক অভিসন্ধি লুক্কায়িত ছিল। ব্যবসা বাণিজ্য করতে এসে একটা বিরাট সাম্রাজ্যের মালিক মোখতার হয়ে পড়া কোন আকস্মিক বা অলৌকিক ঘটনার ফল নয়। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে আন্তর্জাতিক ব্যবসার পথ

www.pathagar.com

উন্মুক্ত হয় এবং ইউরোপীয় জাতিগুলির মধ্যে পারস্পরিক ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। ফলে আমেরিকায় স্পেন সাম্রাজ্য, মশলার দ্বীপে ওলন্দাজ সাম্রাজ্য, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ফরাসী সাম্রাজ্য এবং দক্ষিণ এশিয়ায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংল্যান্ডের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতে অগ্রগতির নীতি (Forward plicy) অবলম্বন করে এবং যে সব বাণিজ্যিক এলাকায় তাদের প্রতিনিধিগণ বাস করতো তারা একটা রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হোক-এ ছিল তাদের একান্ত বাসনা। ১৬৮২ খৃস্টাব্দে ইংরেজগণ ওলন্দাজদের নিকটে ইন্দোনেশিয়ায় মার খেয়ে সেখান থেকে পাততাড়ি গুটায়। পর বৎসর (১৬৮৩ খৃঃ) ইংল্যান্ডের রাজদরবার থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে যে সনদ দান করা হয় তার বলে তারা ভারতের যে-কোন শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, সন্ধি করতে অথবা যে-কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারতো। দ্বিতীয় জেম্‌স কর্তৃক প্রদত্ত সনদে তাদেরকে অধিকতর ক্ষমতা দান করা হয়। এর ফলে তারা ১৬৮৬ খৃস্টাব্দে মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে পরাজয়বরণ করে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ক্যাপ্টেন হীথের নেতৃত্বে 'ডিফেন্স' নামক রণতরী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে ভারতে পাঠানো হয়। হীথ্ সুতানটি থেকে যুদ্ধের জন্যে অগ্রসর হয়ে ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়। এর ফলে কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ কিছুটা দমে গেলেও ভারতে অবস্থানকারী প্রতিনিধিগণ নতুন উৎসাহ উদ্যমে কাজ করে যায়। তাদের দৃষ্টি এবার ফরাসী বণিকদের উপর নিবদ্ধ হয়। ফরাসীদের প্রধান ব্যবসাকেন্দ্র ছিল পণ্ডিচেরী এবং তার অধীনে মুসলিপট্টম, কারিকল, মাহে, সুরাট প্রভৃতি স্থানে তাদের কারখানা প্রতিষ্ঠিত ছিল। পক্ষান্তরে ইংরেজদের বাণিজ্যিক হেড কোয়ার্টার ছিল মাদ্রাজে এবং তার অধীনে বোম্বাই ও কলকাতায় তাদের গুরুত্বপূর্ণ কারখানা ছিল। এদের মধ্যে শুধু হয় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং শেষ পর্যন্ত তা যুদ্ধের আকার ধারণ করে। ফরাসীগণ তাদের মনোনীত ব্যক্তি মুজাফফর জং ও চান্দা সাহেবকে যথাক্রমে হায়দরাবাদ ও কর্ণেটিকের সিংহাসন লাভে সাহায্য করে। ১৭৫১ খৃস্টাব্দে রবার্ট ক্লাইভ কর্ণাটকের রাজধানী আরকট দখল করে। এভাবে ইংরেজ অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠে।

www.pathagar.com

পলাশীর ষড়যন্ত্র

এমাজউদ্দীন আহমদ

২৩ জুন ১৭৫৭ সাল। পলাশী যুদ্ধের দিন। অনেকে বলেন, ওটি হলো পলাশী বিপর্যয়ের দিন। যুদ্ধের দিন নয়। যুদ্ধে পরাজিত হওয়া এক কথা, কিন্তু যুদ্ধ না করে যে পরাজয় বরণ করতে হয় তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই কেউ কেউ বলেন, এটি যুদ্ধ ছিল না, ছিল ষড়যন্ত্রের কালো থাবা। তপন মোহন চট্টোপাধ্যায় তাঁর পলাশীর যুদ্ধ গ্রন্থের ১৭৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ 'পলাশীর যুদ্ধকে একটা যুদ্ধের মতন যুদ্ধ বলে কেউ স্বীকার করেন না। ..... কিন্তু সেই যুদ্ধের ফলেই আস্তে আস্তে একমুঠো কারবারি লোক গজকাঠির বদলে রাজদণ্ড হাতে ধরলেন। প্রথম থেকেই তাঁরা রাজত্ব করলেন না বটে, কিন্তু বাংলাদেশের ভাগ্য নিয়ন্তা হয়ে দাঁড়ালেন।'

এ সমাজে সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, কিন্তু নেই ইতিহাসের গতিধারা সম্পর্কে তীক্ষ্ণ সচেতনতা। তাই প্রতিপদে সংগ্রামই মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। ইতিহাসের প্রতিবাঁকে হাজারো ধারায় রক্ত ঝরিয়ে তাই আমাদের টিকে থাকতে হয়েছে। ১৭৫৭-এর পলাশীর ষড়যন্ত্রেও এ সমাজের ইতিহাস-চেতনার দীনতা সুস্পষ্ট। মোগল সম্রাট শাহজাহান তাঁর কন্যার চিকিৎসার জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ইংরেজ চিকিৎসকের প্রতি ঋণ প্রতিশোধ করার মানসে কোম্পানীকে ব্যবসা-বাণিজ্যের 'সনদপত্র' বা অনুমতি দিয়েছিলেন। সতর শতকের উইরোকেন্দ্রিক সভ্যতা'র (Euro-Centric Civilization) বিকাশ এবং গতি প্রকৃতি সম্পর্কে মোগল সম্রাটদের কোন ধারণাই ছিল না। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলকে ঐ সময়ে বৃটিশ, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিয়ার্ড, ওলন্দাজ জাতি কিভাবে পদানত করে চলেছে তার হিসেব তাঁরা রাখবেন না। ভারত আবিষ্কার করতে এসে কলম্বাস পৌঁছে গেলেন আমেরিকায়। পনর, ষোল ও সতর শতকে বিশ্বব্যাপী আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় রত ছিল ইউরোপ। তারা যায়নি কোথায়?

www.pathagar.com

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, সমগ্র আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, পশ্চিম, দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে গড়ে ওঠে ইউরো-কেন্দ্রিক শক্তিগুলোর অপ্রতিহত প্রভুত্ব। সতর শতকে ভারতবর্ষের অবস্থা যে খুব খারাপ ছিল তা নয়, তবে ঐ যে বলেছি, যথার্থ ইতিহাস-চেতনার অভাবে শক্তিশালী মোগল সম্রাটরাও ব্যর্থ হয়েছেন সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে।

ভারতবর্ষ অতীতকাল থেকেই বিজয়ীর পদভারে কম্পিত হয়েছে। কোন কোন বিজয়ী ভারত জয়ের গর্ব নিয়ে ফিরে গেছেন নিজ দেশে; কেউ বা ভারতকেই নিজেদের আবাসভূমি হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষা ধারণ করে বৃহত্তর পরিমণ্ডলে মিশে গেছেন। মোগলরা এ পর্যায়ভুক্ত। ভারত জয় করে ভারতের ইতিহাসের সাথে ওতপ্রোতভাবে তাঁরা মিশে গেছেন। তাঁদের ধারণা ছিল সনাতন। উত্তর-পশ্চিমের দরজা দিয়েই ভারতে প্রবেশ করতে হয়। তা প্রতিরোধের জন্যে শক্তিশালী স্থলবাহিনীই যথেষ্ট। ষোল, সতর শতকে নৌযান নৌপথকে যেভাবে গতিশীল করে মোগলদের চিন্তাভাবনায় তার বিন্দুমাত্র প্রতিফলন ঘটেনি। তাই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শক্তিমত্তা সম্পর্কে তাঁদের সঠিক ধারণা জন্মেনি। সম্রাট শাহজাহান কৃতজ্ঞতাবোধ প্রস্তুত বদান্যতা প্রদর্শনে তাই বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেননি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সম্রাটের এই উদারতার সুযোগ গ্রহণ করে। ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্যে বিভিন্ন স্থানে কুঠি নির্মাণ করে। কুঠির নিরাপত্তার অজুহাতে নিজস্ব সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলে। সৈন্যবাহিনীকে সহায়তা দানের জন্যে, বিশেষ করে অস্ত্রসম্ভার সরবরাহের জন্যে, নৌবাহিনীর বিস্তার ঘটাতে থাকে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী মোগলদের শক্তিমত্তা সম্পর্কে সজাগ ছিল। স্থলযুদ্ধকে এ কারণে তারা এড়িয়ে চলেছে অতি সন্তর্পণে। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে স্যার টমাস রো (Thomas Roe) কোম্পানীকে যে পত্র লিখেছিলেন তাতেও এর উল্লেখ ছিল। তিনি লিখেছিলেন, 'যদি লাভজনক বাণিজ্য করতে চান তবে তা শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালনা করুন আর সমুদ্রে আপনাদের কার্যক্রম সীমিত রাখুন। বিতর্ক পরিত্যাগ করে এটা নিয়ম হিসেবে গ্রহণ করাই ভালো যে ভারতে স্থলযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার পরিণতি মারাত্মক হতে পারে।'

বৃটিশ কোম্পানী টমাস রো-এর এ নির্দেশ ৮০ বছর ধরে পালন করেছিল। ১৬৮১ সালে স্যার জোসিয়া চাইল্ডের (Joshia child) ইঙ্গিতে কোম্পানী রএ নীতি পরিত্যাগ করে ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে। ১৬৬৮ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণে ছিল মাত্র ১০ টি যুদ্ধ জাহাজ এবং মাত্র ৬০০ জন সৈনিক। ১৭৪০ সাল নাগাদও সমগ্র ভারতে কোম্পানীর অধিকার ছিল ক্ষুদ্র এক ভূখণ্ড ঃ বোম্বাই দ্বীপ, মাদ্রাজ শহরের অবস্থানে পাঁচ মাইল দীর্ঘ এবং তিন মাইল প্রস্থ এক এলাকা আর কলকাতার অবস্থান ক্ষেত্রে তিনটি গ্রাম। তাছাড়া ছিল চারটি মাত্র দুর্গ সেন্ট জর্জ দুর্গ, ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ, কুড্ডালোরের সেন্ট ডেভিড দুর্গ এবং বোম্বাই কুঠি।

সম্রাট শাহজাহানের নিকট থেকে বাণিজ্যের সনদ লাভ করেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এতোদূর অগ্রসর হতে সাহসী হয়। যতদিন পর্যন্ত নবাব আলীবর্দী খাঁ বেঁচেছিলেন, পূর্ব ভারতে কোম্পানীর ক্ষমতা যেমন ছিল সীমিত, তেমনি তার আকাঙ্ক্ষাও ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। আলীবর্দী খাঁ জানতেন, এ বেনিয়া কোম্পানী সুযোগ পেলে যে-কোন অঘটন ঘটিয়ে ফেলতে পারে। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও তাই তিনি তাঁর দৌহিত্র সিরাজকে এই বেনিয়া কোম্পানী সম্পর্কে সাবধান থাকতে বলেছিলেন। তরুণ

www.pathagar.com

সিরাজউদ্দৌলা ক্ষমতাসীন হবার পর প্রথম আঘাত অবশ্য সঠিকভাবে সঠিক স্থানেই হেনেছিলেন। কলকাতা দখল করে কোম্পানীর কর্মকর্তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের নিকট সঠিক খোঁজ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্য এবং দুর্ভাগ্য এ সমাজের যে, সবকিছু সংহত করার পূর্বেই বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের নেতৃত্বে এবং অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীদের সহায়তায় পলাশীর দূরপনেয় কলঙ্কের তিলক অঙ্কিত হয় এ জনপদের জনসমষ্টির ললাটে।

সামাজিক পরিবেশও ছিল ষড়যন্ত্রের উপযোগী। তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, "পশ্চিমবঙ্গে তখন বীরভূম ছাড়া আর সব বড় বড় জায়গাভেই হিন্দু জমিদার ...। প্রকাশ্যে না হলেও ভিতরে ভিতরে প্রায় সব জমিদারই এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রধান নদীয়ার রাজা কৃষ্ণ চন্দ্র রায়। বর্ধমানের রাজার পরই ধনে মানে কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নাম। বাংলাদেশের মহাজনদের মাথা জগৎশেঠদের বাড়ীর কর্তা মহাতাব চাঁদ। জগৎশেঠরা জৈন সম্প্রদায়ের লোক হলেও অনেকদিন ধরে বাংলাদেশের পুরুষানুক্রমে থাকায় তাঁরা হিন্দু সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। কর্মচারীদের পাণ্ডা হলেন রায় দর্লভ রাম। ... হুগলীতে রইলেন নন্দকুমার। উমিচাঁদ ইংরেজদের হয়ে তাঁকে অনেক টাকার লোভ দেখিয়ে রেখেছিলেন।" জগৎশেঠ এবং উমিচাঁদের আশ্রিত ইয়ার লতিফ খাঁ আর একজন ষড়যন্ত্রকারী। সবার শীর্ষে ছিলেন আলীবর্দী খাঁর এক বৈমাত্রেয় ভগ্নীর স্বামী মীরজাফর আলী খাঁ। নবাব হবার বাসনা তার অনেক দিনের। বর্গীর হাঙ্গামার সময় আলীবর্দী খাঁকে হত্যা করিয়ে বাংলার নবাবী গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিল। শেষ পর্যন্ত সে চেষ্টা ফলবতী হয়নি। সিরাজউদ্দৌলা নবাব হলে শওকত জঙ্গের সাথে মিলে ষড়যন্ত্রের আর এক গ্রন্থি রচনা করেন। তা কার্যকর হয়নি। এবারে জগৎশেঠ, ইয়ার লতিফ খাঁ, উমিচাঁদের সহযোগী হিসেবে মাঠে নামেন। সিরাজের সমর্থকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সেনানায়ক মোহন লাল এবং মীর মদন বা মীর মর্দান। ২৩ জুনের পূর্বে বাংলার 'মুক্তির চুক্তি' নামে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় মীরজাফর এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সাথে। অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় রচিত মীর কাসিম গ্রন্থের ২২৩-২৪ পৃষ্ঠায় ১১ দফার এই চুক্তির বিবরণ রয়েছে। মীরজাফরের স্বাক্ষরে চুক্তিতে বলা হয় ঃ 'আমি আল্লাহ্‌র নামে ও আল্লাহ্‌র রসূলের নামে প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমার জীবনকালে আমি এই চুক্তিপত্রের শর্তাবলী মানিয়া চলিব।'

বাংলার 'মুক্তির চুক্তি' তিনি মেনে চলেছেন। পলাশীর আম্রকাননে যুদ্ধের যে প্রহসন হয় তাতে প্রধান সেনাপতির সাজে সজ্জিত হয়ে মীরজাফর সত্যি দাঁড়িয়েছিলেন এবং তাঁর চোখের সামনেই বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের সাথে সাথে বাংলার জনগণও পরাজয়ের শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত হয়। ২৯ জুন ১৭৫৭ সালে মীরজাফরের প্রথম দরবারে মীরজাফরের আবদারক্রমেই ক্লাইভ মীরজাফরের হাত ধরে তাঁকে নবাবী মসনদে বসিয়ে দিলেন সত্য, কিন্তু মসনদের কর্তৃত্ব যে তখন বাংলার বাইরে চলে গেছে তিনি তা টের পেলেন অনেক পরে। তাঁর আত্মীয় মীর কাসিম প্রাণ দিয়ে তা অনুভব করেছেন। অনুভব করেছেন এ জনপদের সমগ্র জনসমষ্টি দীর্ঘ দু'শো বছর ধরে। কাকে দোষ দেবেন, মীরজাফরকে? লোভী, বিশ্বাসঘাতক, অপদার্থ মীর জাফর এদেশের ইতিহাসের এক ঘৃণ্য চরিত্র, একটি ক্লীব, একটি ক্লেদ, একটি অপাংক্তেয় নাম। কিন্তু উমিচাঁদ, জগৎশেঠ, মহাতাব চাঁদ, ইয়ার লুত্‌ফ, রায়দুর্লভ রাম? ঐ প্রহসনের শুধু কি পার্শ্ব চরিত্র?

www.pathagar.com

তরুণ সিরাজ হয়ত ছিলেন অহঙ্কারী, সম্ভবত দাম্ভিক, অপরিণামদর্শী, অর্বাচীন, অথবা অন্য কিছু, কিন্তু তৃতীয় শক্তি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর জন্যে নিজের ঘরের সকল দরজা খুলে দেয়ার হীনবীর্য হীনমন্যতার অনেক উর্ধ্বে ছিলেন। তাই তিনি স্বাধীনতার প্রতীক, স্বাতন্ত্র্যের পতাকাবাহী। আর যারা বাংলার মসনদকে বেচাকেনার জন্য বানিয়ে নিজেদের আর্থিক ও রাজনৈতিক অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে চেয়েছেন এবং নিজেদের সিন্দুকের চাবি পরের হাতে তুলে দেবার দুর্বিনীত হীনমন্যতার শিকার হয়েছেন তারা আজও সীমাহীন ধিক্কারের পাত্র। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল পলাশীর আম্রকাননের পাশেই মুজিবনগরে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে যন্ত্রণায় ছটফট করা অসংখ্য কাল রাত্রির পরে। ইতিহাসের গতিধারা সম্পর্কে কতটুকু সচেতন হয়েছি জানি না। তবে সবার মনে এখনো মীরজাফরের প্রতি পুঞ্জীভূত ঘৃণার ডালা রয়েছে সাজানো। উমিচাঁদ, জগৎশেঠ, রায় দুর্লভবাম, ইয়ার লুত্ফদের প্রতি ক্ষোভের পাত্র এখনো রয়েছে পূর্ণ। মোহন লাল এবং মীর মদনদের শাণিত তরবারী এখনো রয়েছে উন্মুক্ত। জাতীয় স্বার্থকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহারের জন্যে তৃতীয় শক্তির উপর নির্ভরশীল হবার নতজানু বশংবদ মানসিকতা বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে সবসময় চরম ঘৃণার সাথে ধিকৃত হতে থাকবে। মোহন লাল, মীর মদনরা আর কোন সময়ে মীরজাফর, উমিচাঁদ, জগৎশেঠ, রায় দুর্লভদের ক্ষমা করবে না।

কোম্পানীর সাথে নবাব তার বিরোধ মেটাতে বলপ্রয়োগ করেননি। বরং তিনি ইংরেজদের সম্পত্তির দেখাশুনাও করতেন। অর্থাৎ তার হস্তগত ইংরেজ সম্পত্তির যথাযথ যত্ন নিতেন। ইংরেজদের প্রতি নবাবের ইচ্ছাকৃত নিষ্ঠুরতার কোন প্রমাণ আমি পাইনি। বরং আমরা দেখি যে ওয়াটস কালেট এবং হলওয়েলকে নিজের হাতে পেয়েও প্রতিশোধ গ্রহণের কোন চেষ্টাও তিনি করেননি।

- ব্রিজেন কে গুপ্ত

www.pathagar.com

পলাশীর যুদ্ধ

ডঃ কে, এম, মোহসীন

নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধ এবং পলাশীর যুদ্ধের কারণ সম্পর্কে যদুনাথ সরকার তিনটি কারণ উল্লেখ করেছেন। প্রথমত. বাংলায় ইংরেজ কোম্পানী প্রধান রোজার ড্রেক নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা নওয়াবীতে আসীন হবার পর তাঁকে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী অভিনন্দন জানাননি ও কোন উপঢৌকনও পাঠাননি যা এদেশে অবস্থানরত বিদেশী বণিকদের জন্য অপরিহার্য ছিল। দ্বিতীয়ত. আলীবর্দী খাঁর জীবদ্দশায় নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা কাশিমবাজারে ইংরেজদের বসতবাড়ি পরিদর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন; কিন্তু কাশিমবাজার কুঠির ইংরেজ কর্মচারীরা তাঁকে সেখানে প্রবেশ করতে দেননি। কারণ তাঁরা যুবক নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার আচরণ সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল না। তৃতীয়ত. ঢাকার দিওয়ান রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসকে কলকাতায় ইংরেজদের ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে আশ্রয় প্রদান (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৭১)। অপরদিকে ১৭৫৬ সালের মে ও জুন মাসে ইংরেজদের সাথে বাণিজ্যিক সূত্রে ঘনিষ্ঠ খাজা ওয়াজিদ নামে একজন আর্মেনীয় বণিককে নওয়াব লিখে জানান যে, ইংরেজদেরকে এদেশ থেকে বিতাড়িত করার তিনটি কারণ রয়েছে-এক. দেশের প্রচলিত আইন অমান্য করে তারা তাদের দুর্গ পুনঃ নির্মাণ ও শক্তিশালী এবং এর চারপাশে পরীখা খনন করেছে; দুই. তাঁরা (কোম্পানী) তাঁদের যে সমস্ত ব্যবসায়ী সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়েছে তার অপব্যবহার করে এমন সব ব্যক্তিকে বাড়তি সুবিধা দিয়েছে যা কোন রকমেই তারা পেতে পারে না এবং এভাবে বাণিজ্যিক শুল্ক ফাঁকি দেওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে। তিন, তারা এদেশীয় এমন সব কর্মচারীকে আশ্রয় দিয়েছে যাদের অতীত কার্যকলাপ-এর জন্য

www.pathagar.com

এদেশীয় সরকারের কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

"I have three substantial motives for extirpating the English out of may country. One that they have built strong fortifi cautions and duy a large ditch in the King's dominious contrary to the established laws of the country; the second is that they have abused the Privilege of their dustucks by granting them to such as were in no ways entitled to them, from which practice the king has Suffered greatly in the revenue of his customs; the third motive is that they give protection to such of the kings subjects as have by their behaviour in the employs they were entrusted with made themselves liable to be called to and account" .....
[বি, কে, গুপ্ত ঃ নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৭৫৬-১৭৫৭, ৫৩ পৃষ্ঠা]

সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে যে সব তথ্য পাওয়া যায় তা থেকে উপরোক্ত কারণগুলির কোনটি গ্রহণযোগ্য তা নির্ণয় করা সহজ। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার উল্লেখিত তিনটি কারণ এবং নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার চিঠিতে উল্লেখিত তিনটি কারণের মধ্যে অন্তত একটি কারণ দু'জনই উল্লেখ করেছেন। সেটি হচ্ছে কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দেয়া। ঢাকা বিভাগের দিওয়ান রাজবল্লভ এতদঞ্চলের ভূমি রাজস্ব আত্মসাৎ করে কোম্পানীকে উৎকোচ প্রদানের মাধ্যমে তাঁর পুত্রকে ফোর্ট উইলিয়ামে আশ্রয় প্রদানের ব্যবস্থা করে। উল্লেখ্য যে, নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার সিংহাসন আরোহণের পরই ঢাকা বিভাগের রাজস্বের হিসাব নিরীক্ষার সময় দুর্নীতি ও রাজস্ব আত্মসাতের বিষয়টি ধরা পড়ে এবং দিওয়ান রাজবল্লভকে রাজস্বের হিসাব প্রদান করার জন্য মুর্শিদাবাদে ডেকে পাঠানো হয়। নওয়াবের আদেশ অমান্য করে রাজা রাজবল্লভ তার পরিবারের জন্য ইংরেজদের আশ্রয় গ্রহণ করে নওয়াবের বিরাগভাজন হয়। সাথে সাথে কৃষ্ণ বল্লভকে মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করতে অস্বীকার করায় স্বভাবতঃই নওয়াব ইংরেজদের প্রতি রুষ্ট হন। যদুনাথ সরকার উল্লেখিত অপর দু'টি কারণ বিচার বিশ্লেষণ সাপেক্ষ। সিংহাসনে আরোহণের পর ইংরেজ কোম্পানীর পক্ষ থেকে নওয়াবকে সম্মান প্রদর্শন করা না হলে নিশ্চয়ই তাঁর বিরাগভাজনের কারণ হতো। তবে সমসাময়িক তথ্য প্রমাণ থেকে কে, কে, দত্ত বলেছেন-যে ইংরেজ কোম্পানীর গভর্নর উইলিয়াম ড্রেক নওয়াবের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ না করলেও তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে কাশিমবাজার কুঠির ইংরেজ কর্মকর্তা মুর্শিদাবাদের রাজপ্রাসাদে নওয়াবের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ এবং পরস্পর মত ও কুশলাদি বিনিময় করেছেন। তাই এ কারণটি এখন আর পলাশীর যুদ্ধের কারণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। আলীবর্দী খানের রাজত্বকালে নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলাকে কাশিমবাজারে ইংরেজদের বসতবাড়িতে প্রবেশ করতে না দেয়ার কথা নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা একেবারেই উল্লেখ করেননি। আমরা জানি যে, পারস্পরিক স্বার্থের গুরুতর সংঘাতের কারণেই কেবল দু'পক্ষের যুদ্ধ বাঁধতে পারে। নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা বিভিন্ন সময় ইংরেজদের প্রতি রুষ্ট হওয়ার কারণ উল্লেখ করেছেন কোথাও তিনি এ ঘটনার উল্লেখ করেননি। তাছাড়াও নওয়াব আলীবর্দী খাঁর রাজত্বকালে তাঁরই আশীর্বাদ ও পূর্ণ সমর্থনপুষ্ট যুবরাজ যদি প্রকৃতপক্ষেই কাশিমবাজারের কুঠি ও বসতবাড়ি পরিদর্শন করতে চাইতো তাহলে ইংরেজরা বাধা দিতে সক্ষম হতো কি-না

www.pathagar.com

সন্দেহ আছে। তাই উপযুক্ত তথ্য প্রমাণের অভাবে এটি পলাশীর যুদ্ধের অন্যতম কারণ হিসেবে গ্রহণ করা কঠিন।

সমকালীন গ্রন্থ, ইউরোপীয় বিশেষ করে ইংরেজ কোম্পানীর দলিলপত্র, নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার বক্তব্য ও সাম্প্রতিক গবেষণার আলোকে নওয়াবের চিঠিতে উল্লেখিত তিনটি কারণ ও ইংরেজদের আচরণকেই পলাশীর যুদ্ধের জন্য দায়ী করা যায়। যেমন-বিনা অনুমতিতে দুর্গ সম্প্রসারণ ও পরিখা খনন, নওয়াবের দুর্নীতিবাজ কর্মচারীদের আশ্রয় প্রদান এবং কোম্পানী প্রদত্ত বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধার ব্যাপক অপব্যবহার। এগুলোর মধ্যে প্রথম দু'টি ঘটনা পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে এবং তৃতীয়টি এদেশে ইংরেজ কোম্পানীর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে চলে আসছে। তাই এর একটি দীর্ঘ পটভূমি রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ১৬৫০ সালেই বার্ষিক এককালীন দেয় তিন হাজার টাকার বিনিময়ে এদেশে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অনুমতি প্রদানের মাধ্যমেই-এর বীজ বপন করা হয়। এ কারণটি তাই ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনার অপেক্ষা রাখে।

ষোলশ' খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের একদল বণিক ইস্ট ইন্ডিজে ব্যবসা করার জন্য রাণী এলিজাবেথের কাছ থেকে সনদ লাভ করে। এ কোম্পানীর নাম ছিল "দি গভর্নর এন্ড মার্চেন্টস অব লন্ডন ট্রেডিং ইন্ টু ইস্ট ইন্ডিজ" বেশ কিছুকাল পর "দি ইংলিশ কোম্পানী ট্রেডিং ইন্ টু দি ইস্ট ইন্ডিজ' নামে আরেকটি প্রতিদ্বন্দ্বী বাণিজ্যিক গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত হয়। ইউরোপের অন্যান্য দেশের বাণিজ্যিক গোষ্ঠীর সাথে একই দেশের দু'টো কোম্পানী এক হয়ে যায়, ঐক্যবদ্ধ কোম্পানীর পুরা নাম 'দি ইউনাইটেড কোম্পানী অব মার্চেন্টস অব ইংল্যান্ড ট্রেডিং টু দি ইস্ট ইন্ডিজ"-সংক্ষেপে 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী' নামে পরিচিত। এই কোম্পানী ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যবসা করার একচেটিয়া অধিকার লাভ করে। এ ছাড়াও ব্যক্তিগত পর্যায়ে এ ব্যবসায়ে কারো কারো অনুপ্রবেশ ঘটে এবং কোম্পানীর কর্মচারীরাও ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে থাকে।

ইংরেজ কোম্পানী প্রথমে সুরাটে উপস্থিত হয় এবং ষোলশ' তের খ্রিস্টাব্দে সেখানে 'ফ্যাক্টরী' প্রতিষ্ঠা করে। ক্রমে ক্রমে সেখান থেকে আহমদাবাদ ও আগ্রা পর্যন্ত অগ্রসর হয়, দক্ষিণ দিকে ক্রমে ক্রমে বোম্বে ও মাদ্রাজ পর্যন্ত অগ্রসর হয়। ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমসের একজন ব্যক্তিগত দূত সার টমাস রো' ষোলশ' পনের খ্রিস্টাব্দে মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রাজার পক্ষ থেকে ভারতবর্ষে ব্যবসা করার জন্য কিছু সুযোগ-সুবিধা প্রদানের অনুরোধ জানান-দু'দেশের মধ্যে একটি বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পন্ন করাও টমাস রো'র উদ্দেশ্য ছিল। বাণিজ্যিক চুক্তি না হলেও মোঘল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন বাণিজ্যিক কেন্দ্রে বসতি স্থাপন করে এদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করার ব্যাপক সুযোগ-সুবিধা লাভ করে এবং বিভিন্ন জায়গায় প্রতিনিধি পাঠিয়ে তারা এদেশীয় বাণিজ্য সামগ্রী কিনতে থাকে এবং আস্তে আস্তে ইউরোপের বাজারে তা রপ্তানি করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করে।

ষোলশ' আঠার খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ কোম্পানীর দু'জন প্রতিনিধি হিউ এবং পার্কার আগ্রা থেকে মোকসুদাবাদ (বর্তমান মুর্শিদাবাদ) পৌঁছায়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল গঙ্গার নিম্ন অববাহিকা অঞ্চলে ব্যবসায়িক ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেয়া। তারা ফিরে গিয়ে জানায় যে, মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে সস্তায়, প্রচুর পরিমাণে উন্নতমানের রেশমী বস্ত্র ও রেশম

www.pathagar.com

সুতা পাওয়া যায়। খবরে তারা বাংলার সঙ্গে বাণিজ্য যোগাযোগ স্থাপনে উৎসাহিত হয়। উল্লেখ্য, ঐ সময়ে মুর্শিদাবাদ অঞ্চল রেশমী বস্ত্র, মালদাহ সুতী ও সিল্কের মিশ্রিত বস্ত্র এবং ঢাকা অঞ্চল উন্নতমানের সুতী বস্ত্রের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। ঢাকার মসলিনের বিশ্বজনীন খ্যাতি সর্বজনবিদিত। এর আগেই এ অঞ্চলের সহজে ধোয়া ও শুকানো যায় এরূপ সুতী ও রেশমী বস্ত্র শীতপ্রধান ইউরোপে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। পরিধেয় বস্ত্র ছাড়াও বাড়ীর বিছানা ব্যবহারের নানাবিধ বস্ত্র তৈরী হতো। তাই সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধেই তারা বাংলায় প্রবেশের চেষ্টা করে। তবে বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা ইংরেজদের পক্ষে অনুকূল না হওয়ায় তারা প্রথমে উড়িষ্যার বালাসোর পৌঁছে। ষোলশ' পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ কোম্পানী সম্রাট শাহজাহান ইস্যুকৃত এক ফরমানবলে তারা রপ্তানির জন্য পশ্চিম উপকূলে তাদের ব্যবসায়িক সামগ্রী নেয়ার জন্য আভ্যন্তরীণ শুল্ক প্রদান থেকে অব্যাহতি লাভ করে। এতে বাংলার কথা উল্লেখ না থাকলেও সুবাদার শাহ সুজার কাছ থেকে তারা এখানে আভ্যন্তরীণ শুল্ক দেয়া থেকে অব্যাহতি পায়। এ জন্যে তারা বাংলার নওয়াবকে বছরে তিন হাজার টাকা প্রদান করতে স্বীকৃত হয়। পরের ব ৎসর তারা হুগলীতে 'ফ্যাক্টরী' প্রতিষ্ঠা করে। এর কিছুকাল পরেই ষোলশ আটান্ন খ্রিস্টাব্দে রাজধানী মুর্শিদাবাদের পার্শ্ববর্তী কাশিম বাজারে কুঠি প্রতিষ্ঠা করে। আস্তে আস্তে তাদের ব্যবসার পরিধি মূলধন বাড়তেই থাকে। ফলে ষোলশ' আটষট্টি খ্রিস্টাব্দে ঢাকা, ষোলশ' ছিয়াত্তরে মালদাহ এবং পরিশেষে নব্বই দশকে কলকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর নামে তিনটি গ্রাম কিনে ষোলশ' আটানব্বই খ্রিস্টাব্দে 'ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ' নামে তাদের কুঠি প্রতিষ্ঠা করে। অপরদিকে তাদের ব্যবসায়িক মূলধনও দ্রুত বাড়তে থাকে। ষোলশ' ঊনষাট সালে কোম্পানীর মূলধন ছিল দশ হাজার পাউন্ড। পরবর্তী তেইশ বছরে অর্থাৎ ষোলশ' বিরাশি সালে তা বেড়ে দুইলক্ষ ত্রিশ হাজার পাউন্ডে দাঁড়ায়। এতে দেখা যায় তেইশ বছরে তাদের ব্যবসায়িক মূলধনও তেইশ গুণ বৃদ্ধি পায়। ঐ বছরেই বাংলার ফ্যাক্টরীগুলোকে মাদ্রাজে নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে পৃথক একজন গভর্নরের অধীনে ন্যস্ত করা হয়।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোম্পানীর কর্মচারীরা এদেশে বাণিজ্যিক কুঠি স্থাপন, বাণিজ্যিক পণ্য ক্রয় এবং আভ্যন্তরীণ শুল্ক প্রদান ছাড়াই স্থানীয় শাসকদের কাছ থেকে ব্যবসা করার সুযোগ লাভ করে। সুযোগ-সুবিধা প্রদত্ত সরকারী আদেশ সব সময় স্পষ্ট না হওয়ায় ইংরেজ কোম্পানী ও মোঘল শাসকদের মধ্যে এর যৌক্তিকতা ও ব্যাখ্যা নিয়ে বিবাদ বাঁধে। যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ইংরেজদেরকে বিভিন্ন সময়ে দেয়া হয় তা সময়ে সময়ে নবায়ন করার উপরে দেশীয় শাসকগণ গুরুত্ব আরোপ করে। মোটকথা, এদেশীয় শাসকদের ধারণা যে, কোন বিশেষ মোঘল কর্মকর্তা তাঁর ক্ষমতাবলে কোন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করলে তা নিতান্তই অস্থায়ী ব্যবস্থা। অন্ততঃপক্ষে নতুন সুবাদার বা শাসককে ঐ সুবিধাগুলো নবায়ন করতে হবে। অপরদিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মকর্তাগণ মনে করে যে, একবার যখন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়েছে-তা তারা স্থায়ীভাবে ভোগ করবে। এ ছাড়াও স্থানীয় শাসকরা মনে করতো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে শুধু তাদের দ্রব্য সামগ্রী দেশের বাইরে রপ্তানি করার জন্য সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়েছে। এমনকি আভ্যন্তরীণ শুল্ক থেকেও অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু কোম্পানীর কর্মচারীরা এবং সমর্থনপুষ্ট এদেশীয় এজেন্টরা আভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ে

www.pathagar.com

অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করে, তখন কোম্পানীর ব্যবসায়িক সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে দেশীয় শাসকগণ সন্দিহান হয়ে পড়ে। এই বিরোধ শুরু থেকেই চলে আসে এবং এর মীমাংসা হয় পলাশীর যুদ্ধের পরে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের মাধ্যমে।

শাহ সুজার পর বাংলার সুবাদার মীর জুমলার সাথেও ইংরেজদের ব্যবসায়িক সুযোগ-সুবিধা নিয়ে বিরোধ বাঁধে এবং নওয়াব ইংরেজদের ব্যবসায়ের উপর কিছু বাড়তি করও ধার্য্য করে। কিন্তু বাংলার নওয়াব শায়েস্তা খানের আরাকানী মগদের আক্রমণ প্রতিহত এবং চিটাগাং দখল নিয়ে ব্যস্ত থাকায় ইংরেজদের ব্যবসায়ের দিকে নজর দিতে পারেননি। তাছাড়া তারা এদেশে শান্তিপূর্ণভাবে ব্যবসা করলে এদেশে উৎপন্ন সামগ্রী বিদেশে রপ্তানি হবে এবং তার মাধ্যমে প্রচুর সম্পদ অর্জন করা যাবে-এটাই ছিল তাদের নীতি। কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে ওলন্দাজ কর্তৃক বিতাড়িত হওয়ায় কোম্পানী এবং ফ্রি মার্চেন্টস তারা এদেশীয় ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করে। এ ছাড়া কোম্পানীর কর্মচারীরা ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে লিপ্ত হয় তাই ইংরেজ কোম্পানীকে প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা পর্যালোচনার তাগিদ দেখা দেয়। এ ছাড়া মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব দীর্ঘকালব্যাপী দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকায় প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। এ অর্থের একটি বড় অংশ বাংলার রাজস্ব থেকে শায়েস্তা খান নিয়মিত প্রদান করতেন। এ রাজস্ব আদায়ে যাতে ঘাটতি না পড়ে সেদিকেও শায়েস্তা খানের লক্ষ্য ছিল। তাই তিনি সম্রাটের নির্দেশেই ইংরেজ কোম্পানী কর্তৃক প্রদত্ত শতকরা আড়াই টাকা শুল্কের উপর বাড়তি আরও এক ভাগ জিজিয়া অর্থাৎ শতকরা সাড়ে তিনভাগ শুল্ক ধার্য করে। সুবাদারের এ পদক্ষেপ ইংরেজ কোম্পানী মেনে নেয়নি ও এর প্রতিবাদ জানায় এবং নওয়াবের বিরুদ্ধে অত্যাচার, বাড়তি শুল্ক আদায় এবং সুবাদার নিজে লবণ, সুপারী এবং তামাকের একচেটিয়া ব্যবসা করে বলে অভিযোগ পড়ে। ফলে আশির দশকের শুরুতেই বাংলার নওয়াবের সাথে ইংরেজ কোম্পানীর সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটে। বিগত কয়েক বছর ধরে যে সব সুযোগ-সুবিধা ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভোগ করছিল তাতে বাঁধা পড়ায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বিশেষ রুষ্ট হয়। ফলে শায়েস্তা খানের সঙ্গে তাদের যুদ্ধও বাধে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্তাব্যক্তি জোসিয়া চাইল্ড এ অবস্থায় দম্ভভরে ঘোষণা করেন যে, "events are forming us into a condition of a sovereign state of India." প্রকৃতপক্ষে তখন থেকেই ইংরেজরা এদেশে সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন দেখতে থাকে।

বাংলার নওয়াব শায়েস্তা খানের সঙ্গে যুদ্ধে ইংরেজ কোম্পানী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় এবং ইংরেজদেরকে বাংলার বাণিজ্য থেকে প্রায় বিতাড়িত করা হয়। ষোলশ' আশির দশকে ইংরেজ কোম্পানী সামরিক দিক দিয়ে তেমন শক্তিশালী ছিলো না; অপরদিকে শায়েস্তা খানের পিছনে ছিল মুঘল সামরিক শক্তি এবং তাঁর সময়ে বাংলায় একটি বাণিজ্যিক নৌবহর গড়ে তোলা হয়েছিল। যুদ্ধাবস্থায় অশান্ত পরিবেশে দেশের অর্থনৈতিক কার্যক্রম হ্রাস পাওয়ায় বাণিজ্য ও অন্যান্য রাজস্বে ঘাটতি পড়ে; এতে সুবা বাংলা থেকে দিল্লীতে বাৎসরিক রাজস্ব পাঠাতে অসুবিধা দেখা দেয়। এ অবস্থা মেনে নেওয়া মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই তিনি শায়েস্তা খানকে বাংলা থেকে ডেকে পাঠান এবং ইব্রাহীম খানকে তাঁর স্থলে সুবাদার নিযুক্ত করেন। ইব্রাহীম খান বিদেশী কোম্পানী, বিশেষ করে, ইংরেজ কোম্পানীকে

www.pathagar.com

যুদ্ধপূর্ব সময়ের বাণিজ্যিক সুবিধা ফিরিয়ে দেবার আশ্বাস দেন। নওয়াবের আশ্বাসে ইংরেজরা পুনরায় বাণিজ্য করতে শুরু করে। নতুন নওয়াবের কাছ থেকে তারা কলকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর নামে তিনটি গ্রামের জমিদারী স্বত্ব ক্রয় করে। ১৬৯৮ সালের ৯ নভেম্বর ক্রয় দলিল কার্যকরী হয়। জমিদারীর মোট ক্রয়মূল্য এক হাজার তিনশ' টাকা। জমিদারী স্বত্বের মোট রাজস্ব এক হাজার একশত পঁচানব্বই টাকা এবং মোট জমির পরিমাণ পাঁচ হাজার সাতাত্তর বিঘা। As the Zamindar the Company was now empowered to buy internal duty and customs on articles of trade passing through its districts and impose petty taxes and cesses on the cultivators: এসব করের মধ্যে ছিল জিনিসপত্র আমদানি, রপ্তানি ও বিক্রয় কর, বিভিন্ন পেশার উপর ধার্য ট্যাক্স এবং বিচার প্রক্রিয়ার জরিমানা।

তিনটি গ্রামের জমিদারী স্বত্ব ক্রয়ের মাধ্যমে ইংরেজ কোম্পানীর এদেশে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সফল হতে থাকে এবং কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম প্রতিষ্ঠা এদেশে ইংরেজদের সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রথম পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। এরপর থেকে তারা কলকাতার আশে পাশে আরও অধিক পরিমাণে জমিদারী স্বত্ব কেনার প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। রাজস্ব আদায় ছাড়াও নিজস্ব জমিদারীকে কোম্পানীর ব্যবসা ও অন্যান্য কাজে অবাধ স্বাধীনতা থাকায় জমিদারী স্বত্ব ক্রয়ের সাথে তাদের কায়েমী স্বার্থ (Vasted interest) জড়িত হয়ে পড়ে। তাই তারা অষ্টাদশ শতকের শুরুতেই অধিকতর বাণিজ্যিক ও আর্থিক সুবিধা আদায় এবং জমিদারী ক্রয় সচেষ্ট হয়। কিন্তু এ সময়ে বাংলার দিওয়ান ও পরবর্তীতে দিওয়ান ও সুবাদার মুর্শিদকুলি খান তাদের এ তৎপরতা সন্দেহের চোখে দেখেন এবং তাদের পূর্ব প্রদত্ত অধিকার-বহির্ভূত প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করে।

ইংরেজ কোম্পানীর কর্মচারীরা মুর্শিদকুলি খান ও তাঁর উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নানা প্রলোভন দেখিয়েও তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সম্ভব না হওয়ায় দিল্লীতে মুঘল সম্রাটের শরণাপন্ন হয়। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর সিংহাসন নিয়ে তখন দিল্লীতে গৃহ যুদ্ধাবস্থা-তাই কোম্পানীর প্রতিনিধিত্বকারী দল (সুরম্যান অ্যামব্যাসি নামে পরিচিত) প্রায় দু'বছর অপেক্ষা করার পর তৎকালীন মুঘল সম্রাট ফররুখ সিয়ার-এর সাক্ষাৎ লাভে সক্ষম হয়। উল্লেখ্য যে, সম্রাট ফররুখ সিয়া তখন এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছিলেন। দেশীয় চিকিৎসকগণ ব্যর্থ হলে ইংরেজ প্রতিনিধিদলভুক্ত একজন চিকিৎসক তাঁর চিকিৎসার জন্য এগিয়ে আসেন। রোগ যন্ত্রণা-কাতর সম্রাট এ প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করেন এবং এই ইংরেজ প্রতিনিধিদলের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং তাদের ব্যবসায়িক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা-দাবি মেনে নিয়ে রাজকীয় ফরমান ও 'হসবুল হুকুম' (মুঘল উজির প্রদত্ত সনদ)-এর মাধ্যমে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক ও আর্থিক সুবিধা প্রদান করেন।

সতেরশ' পনের খ্রিস্টাব্দে প্রদত্ত ফররুখ সিয়ারের রাজকীয় ফরমান বলে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার সাথে ইংরেজরা বাৎসরিক তিন হাজার টাকার বিনিময়ে এদেশে বিনাশুল্কে ব্যবসা, কলকাতায় ইংরেজদের নিজেদের নিজস্ব টাকশাল এবং কলকাতার আশেপাশে আরও আটত্রিশটি গ্রামের জমিদারী স্বত্ব ক্রয়ের অনুমোদন লাভ করে। শুরু থেকেই এ তিনটি সুবিধার জন্য কোম্পানী চেষ্টা করে আসছিল। তাই এ সুযোগ লাভে

www.pathagar.com

তারা বাণিজ্যিক দিক দিয়ে এক নবজীবন লাভ করে এবং অন্যান্য বিদেশী কোম্পানী অপেক্ষা অধিক মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই ফররুখ সিয়ারের ফরমানকে ইংরেজদের ব্যবসায়ের 'ম্যাগনাকার্টা' হিসেবে অভিহিত করা হয়। এ সুযোগ-সুবিধা লাভে তারা এতই অভিভূত হয়ে পড়ে যে, উপর্যুপরি কয়েকদিন ধরে কলকাতায় আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠে এবং তাদের অনুকূলে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে থাকে।

বাংলার দিওয়ান ও সুবেদার মুর্শিদকুলি খান ইংরেজদের এই নতুন অবস্থান এবং বাড়তি সুযোগ-সুবিধা লাভ সুনজরে দেখেননি। শুরুতে তাঁকে এড়িয়ে সম্রাটের কাছে ধর্ণা দেওয়াকে তিনি সম্ভবত 'ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়ার' সমতুল্য মনে করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর মনোভাবও ছিল সুস্পষ্ট। মুর্শিদকুলি খাঁ মনে করতেন ইংরেজদেরকে বাড়তি সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হলে সরকারের রাজস্ব আয়ে ঘাটতি পড়বে, দ্বিতীয়ত. এদেশীয় বণিকরা ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে বিতাড়িত হবে; ভূভীমত ইংরেজদের রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, কারণ ফোর্ট উইলিয়াম কেন্দ্র করে তারা প্রায় এটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অন্য একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার আচরণ করছিল। তাই তিনি যুক্তি ও কৌশলের মাধ্যমে এ সমস্ত সুযোগ সুবিধা প্রদানে বাধা দেন- কোনটি রাষ্ট্রীয় আয় ঘাটতির অজুহাতে, কোনটি সম্রাটের সুস্পষ্ট আদেশের অনুপস্থিতিতে এবং কোনটি দেশের স্বার্থের পরিপন্থী বলে তাঁর জীবদ্দশায় ইংরেজদের উক্ত তিনটি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে দেননি। অন্যান্য ছোটখাটো সুযোগ-সুবিধা তাঁর প্রশাসনিক দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত বলে তিনি মেনে নেন। ইংরেজরাও এ সুবিধাগুলো আদায়ের প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। নানা কারণে পলাশীর যুদ্ধের প্রাক্কালে সুবিধাগুলো আদায়ের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

বস্তুতপক্ষে ইংরেজ কোম্পানী তাদের ব্যবসায়িক সুযোগ-সুবিধার চরম অপব্যবহার করে। কোম্পানীর কর্মচারীদের এসব দুর্নীতি সম্পর্কে তাদের বিলাত কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত সচেতন ছিলেন এবং সতেরশ' দুই থেকে সতেরশ' ছাপ্পান্ন পর্যন্ত-এতদসংক্রান্ত পঁচিশখানা চিঠিতে ফোর্ট উইলিয়ামের কর্মচারীদের সতর্ক করে দেন এবং দস্তকের 'অপব্যবহার সংক্রান্ত অপরাধের জন্য কোম্পানীর কর্মচারীদের বরখাস্ত করে পরবর্তী জাহাজে তাদেরকে দেশে পাঠানোর নির্দেশ দেন। কলকাতা কাউন্সিলের কর্মকর্তাগণ এসব নির্দেশ অমান্য করে দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে অনুপ্রবেশ করে, এমনকি লবণ, সুপারী, তামাক ও খাদ্যশস্যের মতো দৈনন্দিন ব্যবহারিক সামগ্রীর ব্যবসা আরম্ভ করে। একই সাথে কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়েও কোম্পানীর 'দস্তক' ব্যবহার করতে থাকে এবং এগুলো দেশীয় 'গোমস্তা ও প্রতিনিধির কাছে বিক্রি করা শুরু করে যাতে এরাও কোম্পানীর নাম ভাঙ্গিয়ে কোম্পানী বিনা শুল্কে ব্যবসা করতে পারে। বিভিন্ন অঙ্কের টাকার অথবা ব্যবসায়ের লভ্যাংশ নিয়ে তারা 'দস্তক' অন্যের কাছে বিক্রি করতো "Various were the terms of this illicit compact; sometimes the company's (ies) servant was entitled to (1,8) th, (1,4)th or (1,2) of the profits of the trade so covered; at other times, the company's 'Dastak" was sold at prices ranging from 25 rupees to 200 rupees each". (J.C. Sinha; Economic Anuals of Bengal, page-10).

অন্যান্য বণিকরা বিনা শুল্কে ব্যবসা করার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ায় তারা ব্যবসা ক্ষেত্রে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নওয়াব অত্যন্ত উদ্বিগ্নের সাথে লক্ষ্য করেন যে,

www.pathagar.com

দেশের ক্রমপ্রসারমান রপ্তানি বাণিজ্য মাত্র তিন হাজার টাকার বিনিময়ে ইংরেজরা সম্পন্ন করছে; সাথে সাথে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য শুল্কের বিপুল অংকের টাকা থেকেও নওয়াব বঞ্চিত হচ্ছে।

সিংহাসনে আরোহণের পরপরই নওয়াব প্রথমে কৃষ্ণদাসকে ফিরিয়ে দেবার জন্যে আদেশ দেন (১৫ এপ্রিল, ১৭৫৬)। কয়েক সপ্তাহ পরই তিনি ইংরেজদের ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের সংস্কার বন্ধ করতে বলেন এবং কলকাতার বসতির চতুপার্শ্বের পরিখা ভরাট করার আদেশ দেন। এতদসংক্রান্ত চিঠিপত্র ইংরেজরা শুধু অগ্রাহ্যই করেনি বরং নওয়াবের প্রতিনিধি নারায়ণ সিংকে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ থেকে অপমান করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। নারায়ণ সিং অপমানিত হয়ে সিরাজ-উদ-দৌলার নিকট ক্ষোভে ফেটে পড়ে ঃ "What honour is left to us (natives) when a few traders, who have not yet learnt to wash their bottous, reply to the ruler's orders by expelling his envoy?"(Muzzaffarnamah- page-53)।

এতে নওয়াব ক্ষীপ্ত হয়ে তাঁর সৈন্যদের কাশিমবাজার ফ্যাক্টরী অবরোধ করে সেখানকার ইংরেজদের সব রকমের সরবরাহ বন্ধ করার নির্দেশ দেন। এ অবরোধ অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয় এবং কাশিম বাজার কুঠি প্রধান উইলিয়াম ওয়াটস নওয়াবের কাছে উপস্থিত হয়ে অঙ্গীকার করে যে, কলকাতায় এ দেশীয় কাউকে আশ্রয় দেওয়া হবে না, দুর্গের সম্প্রসারণ বন্ধ করা হবে এবং এদেশীয় বণিকদের কোন দস্তক সরবরাহ করা হবে না। ওয়াটস্ অবশ্য বিনীতভাবে জানিয়ে দেয় যে, কোম্পানীর একজন কর্মচারী হিসেবে কোম্পানীর সমস্ত দায়-দায়িত্ব নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কোম্পানী প্রধান ড্রেক ওয়াটস-এর সাথে একমত না হওয়ায় নওয়াব কলকাতা আক্রমণ করেন এবং ইংরেজদেরকে কলকাতা থেকে বিতাড়িত করে দেন। এ সময়ে চৌষট্টিজন ইংরেজকে একটি ছোট্ট কক্ষে (১৮´ × ১৪´ - ১০´) সারা রাত বন্দী রাখার ফলে আহত সৈন্যসহ তেতাল্লিশজন মারা যায়। এ খবর অতিরঞ্জিত হয়ে মাদ্রাজ পৌঁছার সাথে সাথে ইউরোপ থেকে সদ্য আগত দু'হাজার সৈন্য ও আধুনিক গোলাবারুদসহ ক্লাইভ দ্রুত মাদ্রাজ থেকে কলকাতা এসে পৌঁছান।

কলকাতা থেকে ইংরেজদের বিতাড়নের পর পুনরায় ইংরেজদের এদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করার দুটো বিকল্প উপায় সামনে ছিল; একটি নওয়াবের কাছে ক্ষমা চেয়ে তাঁর ছত্রচ্ছায়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য করা; অপরটি, শক্তির দ্বারা নওয়াবকে মোকাবিলা করে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়া। স্বসম্পনে ব্যবসা করা এ সময়ে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। ইংরেজদের ধারণায়, Should the Nawab think fit to Permit the english to return and resettle we are afraid it would be not only with the loss of all their privileges but on such shameful terms that Englishman we hope will never consent to." (Gupta, Page-85)।

ক্লাইভ কলকাতায় পৌঁছার পর ইংরেজরা সহজেই কলকাতা পুনর্দখল করে (২রা জানুয়ারী ১৭৫৭)। পরদিন ড্রেক কলকাতা থেকে নওয়াবের বিরুদ্ধে এক ঘোষণা প্রচার করে যা যুদ্ধ ঘোষণারই শামিল ঃ "We do hereby on the behalf of the said East India Company and as their representatives in Bengal, in consideration of the several acts of hostility and violence already premised, declare open war against the aforesaid Sirajuddaullah and

www.pathagar.com

against the subjects of the said subah (Nawab), their cities, towns, shipping and effects according to the maxims and rules of all nations, until ample restitution be made [to] the East India Company, thir servants, tenants, and inhabitants-residing under their protection for all damages and losses sustained by them ..... and until full satisfaction be made the said East India Company for the charges by them incurred in equipping a large army and marine forces to procure a re-establishment of their factories and towns... (উদ্ধৃতি Gupta, Page-৯২ ।

এতে নওয়াব বিরক্ত হয়ে ইংরেজদেরকে সতর্ক করে দেন যে, তারা যদি মনে করে যে, নওয়াবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তারা এদেশে তাদের ব্যবসা করতে সক্ষম হবে তাহলে ভুল করবে। তবে এসময়ে রাজনৈতিক দিক থেকে নওয়াব খানিকটা সঙ্কটে রাজাকারের বিরোধ এবং আহম্মদ শাহ আবদালীর মুর্শিদাবাদ আক্রমণের হুমকি নওয়াবকে বিচলিত করে, অপরদিকে ইংরেজরা নওয়াবের সাথে চূড়ান্ত বোঝা-পড়া করে এদেশের কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তিকে হাত করার জন্য কিছুটা সময়ের প্রয়োজন বলে অনুভব করে; তাই ১৭৫৭ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী নওয়াব ও কোম্পানীর মধ্যে কলকাতায় একটি চুক্তি হয়। এ চুক্তির শর্তানুযায়ী নওয়াব সিরাজ-উদ-দৌলা ১৭১৭ সালের ফরমানের মাধ্যমে ইংরেজদের প্রদত্ত সুবিধাগুলো মেনে নেন এবং কাশিম বাজার ও কলকাতা অবরোধের সময় ইংরেজদের যে ক্ষতি হয়েছে তার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতেও সম্মত হন।

এ চুক্তির ফলে আপাতঃদৃষ্টিতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে মনে হলেও ইংরেজরা একটুও সময়ের অপব্যবহার করেনি। এদেশ থেকে ফরাসীদের রাজনীতিও প্রভাব চিরতরে নির্মূল এবং নওয়াব সিরাজ-উদ্-দৌলার পরিবর্তে তাদের আজ্ঞাবহ ও সমর্থনপুষ্ট একজনকে বাংলার সিংহাসনে বসানোর ষড়যন্ত্রে ইংরেজরা মেতে ওঠে। প্রায় তিন মাসের মধ্যে এ ব্যাপারে তারা সফল হয়। নওয়াবের প্রধান সেনাপতি মীরজাফরকে গদির লোভ দেখিয়ে এবং জগৎশেঠ ও অন্যদের নানা প্রলোভন দেখিয়ে বশ করে। ষড়যন্ত্র যখন সম্পন্ন ঠিক তখনই তারা নওয়াবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করে। এদিকে নওয়াব ইংরেজদের একটার পর একটা দাবি মেনে নিলেও নতুন নতুন দাবি ইংরেজদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত হয়; যাতে নওয়াবের সাথে কোনরূপ সমঝোতা না হয়। তাই ইংরেজদেরকে মোকাবিলা করার জন্য মুর্শিদাবাদ থেকে যাত্রার প্রাক্কালে নওয়াব মন্তব্য করেন, 'আল্লাহর কাছে হাজার শোকর যে, আমার পক্ষ থেকে চুক্তিভঙ্গ করা হয়নি।' মুর্শিদাবাদ থেকে ত্রিশ মাইল দক্ষিণে পলাশী প্রান্তরে নওয়াবের সাথে ইংরেজের যুদ্ধ হয়। মূলত প্রধান সেনাপতি মীর জাফর ও অন্যদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য নওয়াব সিরাজ-উদ্-দৌলার পরাজয় হয়। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মুর্শিদাবাদ হয়ে নৌপথে পাটনা যাবার পথে মীরজাফরের লোকজনের হাতে নওয়াব ধৃত হন এবং তারই মাতা আমেনা বেগম কর্তৃক লালিত পালিত একজন ইরানীয় রক্ষী মুহম্মদী বেগ তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করে (২রা জুলাই ১৭৫৭ ইং)। এর তিনদিন পূর্বে ক্লাইভের সহায়তায় মীরজাফর বাংলার সিংহাসনে বসে। এরপর থেকে বাংলায় ইংরেজ প্রাধান্য শুরু হয়।

www.pathagar.com

রূপকথার এক নায়ক

অধ্যাপক আবদুল গফুর

মায়ের নাম আমেনা, ছেলের নাম মুহাম্মদ। আমেনা তনয় এই মুহাম্মদই আমাদের ইতিহাসে যোগ করে গেছেন এক অনন্য অধ্যায়-এ অধ্যায় যেমনি করুণ, তেমনি গৌরবোজ্জ্বল। আমেনা তনয় এই মুহাম্মদের ছোটকালের পুরা নাম ছিল মীর্জা মুহাম্মদ। তেইশ বছর বয়সে উপাধিসহ তাঁর পুরা নাম হয় নবাব মনসুর-উল-মুলক সিরাজউদ্দৌলা শাহকুলী খাঁ মীর্জা মুহাম্মদ হায়বৎ জঙ্গ বাহাদুর। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা।

সেদিনের সেই মুহাম্মদ-ইতিহাসে যাঁর পরিচিতি নবাব সিরাজউদ্দৌলারূপে ঘাতকের অস্ত্রের আঘাতে শাহাদাত বরণ করেন ১৭৫৭ সালের তেসরা জুলাই। সেদিনের সে তেসরা জুলাই থেকে আজ পর্যন্ত কত দিন, কত সপ্তাহ, মাস, বছর, শতক মহাকালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু বাংলার ইতিহাসে আজও একটি নাম রূপকথার নায়কের মতো বাংলার স্বাধীনতার মূর্তিমান উজ্জ্বল প্রতীকরূপে ভাস্বর হয়ে আছে। সে নাম সেদিনের বালক মুহাম্মদের-সে নাম বাংলার তরুণ নবাব সিরাজউদ্দৌলার।

সিরাজউদ্দৌলার জন্ম ১৭৩৩ সালে। বাংলা তথা সারা ভারতবর্ষে চলছে তখন ঘোর দুর্দিন। উপমহাদেশ তখনও স্বাধীন। কিন্তু এ স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ঘরে-বাইরে নানা শত্রু সক্রিয়। মোগল সৌভাগ্য-সূর্য তখন অস্তমুখী। বিখ্যাত দরবেশ বাদশাহ আওরঙ্গজেব আলমগীরের পর যারা দিল্লীর সিংহাসনে বসেছেন তারা প্রায় সবাই ছিলেন দুর্বল, ভীরু, তদুপরি বিলাসিতার সাগরে নিমজ্জমান। এই সুযোগে ইউরোপের কিছু জাতি এ উপমহাদেশে সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন মেতে উঠল। এরা ছিল ইংরেজ, ফরাসী, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ। এদের মধ্যে আবার ইংরেজই সবচাইতে ধূর্ত। মোগল বাদশাহদের দুর্বলতার সুযোগে বিদ্রোহের চেষ্টা

www.pathagar.com

করে এদেশেরও কিছু লোক। পাঠানদের মতো মোগলরা বাইরের থেকে এলেও এদেশকেই তারা স্বদেশ মনে করতেন। মোগলরা মুসলমান হলেও তাদের রাজদরবারে আগাগোড়াই বহু হিন্দু আমীর-ওমরাহ উচ্চপদে আসীন ছিলেন। কিন্তু এক ধরনের হিন্দু নেতা এতে খুশী ছিলেন না। তারা মুসলমানদের ক্ষমতা থেকে হটাবার আশায় হাত মিলালেন বিদেশী ইংরেজদের সাথে। এদের অন্যতম ছিলেন মারাঠা নেতা শিবাজী। শিবাজীর সাথে গোপন চুক্তি হয় এদেশে বাণিজ্যরত ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর। এই ষড়যন্ত্রমূলক চুক্তির প্রভাব পড়ল মুসলিম রাজদরবারের বহু হিন্দু সভাসদের মধ্যেও। এই চক্রান্তের ঢেউ এসে লাগল বাংলা মুল্লুকেও।

সিরাজদ্দৌলার জন্মকালে তাঁর নানা আলিবর্দী খাঁ ছিলেন বাংলার নবাব। মোগল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে মারাঠা বর্গীরা তখন প্রায়ই হানা দিত বাংলায়। প্রতি বছর সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা বাংলার সম্পদ লুট করে অসংখ্য নারী, পুরুষ, শিশুর উপর নির্যাতন চালিয়ে তারা ফিরে যেত তাদের রাজ্যে। একদিকে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ, অন্যদিকে হানাদার মারাঠা, অপরদিকে রাজদরবারের ভিতরে ঘাপটি মেরে থাকা শত্রু-এতসবের মাঝেও আলীবর্দী সাফল্যের সাথে চালিয়ে নিলেন তাঁর দীর্ঘ পঁচিশ বছরের রাজত্বকাল। অবশেষে প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে একদিন তাঁর ডাক এলো পরপারের। ১৭৫৬ সালের ১০ এপ্রিল ইন্তেকাল করলেন আলীবর্দী। তাঁর ইচ্ছা অনুসারে বাংলার নবাব হলেন ২৩ বছর বয়সের তরুণ সিরাজউদ্দৌলা। আলীবর্দীর কোন পুত্র সন্তান ছিল না। ছিল তিন কন্যা-ঘষেটি, মায়মুনা ও আমেনা। আমেনার পুত্র সিরাজউদ্দৌলাকে তিনি অত্যধিক স্নেহ করতেন ছোট বয়স থেকেই। এই স্নেহের কারণও ছিল। দূরদর্শী আলীবর্দী বালক সিরাজের মধ্যে ভাবী নবাবের যোগ্যতা দেখতে পেয়েছিলেন। ঘরে-বাইরে শত্রু পরিবেষ্টিত অবস্থায় যে গভীর নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম, যে বীরত্ব ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার প্রয়োজন ছিল সবচাইতে বেশী, তার সবটাই সিরাজের মধ্যে ছিল। ছোট্ট বয়স হতে প্রাসাদে আরাম-আয়েশে বেড়ে ওঠায় সিরাজের মধ্যে যৎসামান্য যে সংসর্গ বর্জন করেন। সিংহাসনে আরোহণের পর সিরাজের একমাত্র চিন্তা ও ভাবনা হয়ে উঠল, ভেতর-বাইরের এতসব চক্রান্তের মুখে কি করে বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা করা যায়।

বয়সে তরুণ হলেও সিরাজের রাজনৈতিক পাঠ ছিল অত্যন্ত নির্ভুল। সিরাজউদ্দৌলা বুঝেছিলেন, বিদেশী ইংরেজরাই একদিন এদেশের স্বাধীনতার জন্য বড় হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। ১৬৯০ সালে বাণিজ্যের নামে সুতানটি গ্রাম ক্রয় করার পর ক্রমে ক্রমে তারা কলিকাতা ও গোবিন্দপুরসহ কলিকাতা নগরীর গোড়াপত্তন করে এবং সেখানে দুর্গ গড়ে তোলে। এরপর একদিকে মারাঠা শক্তি, অন্যদিকে মুর্শিদাবাদ দরবারের বিশ্বাসঘাতকদের সাথে ইংরেজদের গোপন সম্পর্ক স্থাপনের পর ইংরেজদের মতিগতি সম্বন্ধে সিরাজের মনে কোনই সন্দেহ ছিল না। সিরাজ যে কোন মূল্যেও এদেশ থেকে ইংরেজদের উৎখাত করাকে তাঁর জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন। দরবারের মধ্যকার কিছু গুরুত্বপূর্ণ লোকের যোগসাজশ না থাকলে সিরাজ এতে সফলও হতেন।

সিরাজ কিশোর হতেই অসম সাহসী বীরযোদ্ধা ছিলেন। মারাঠা আগ্রাসন দমনে তিনি বহুবার বীরত্বের প্রমাণ দেন। ১৭৫০ সালে আলীবর্দী যখন মারাঠা দস্যুদের

www.pathagar.com

প্রতিহত করতে ব্যস্ত তখন বিহারে জানকীরাস বিদ্রোহের চেষ্টা করলে সিরাজ অসম সাহসিকতার সাথে তা দমন করেন।

আলীবর্দীর অনুমতির তোয়াক্কা না করে বৃদ্ধ নবাব বেঁচে থাকতেই ইংরেজরা ১৭৫৪ সালে কলিকাতার দুর্গ সম্প্রসারণ করে। সিরাজ ইংরেজদের এ কার্যকে কখনও সুনজরে দেখেননি। সিংহাসনে আরোহণের মাত্র দেড় মাসের মধ্যে সিরাজউদ্দৌলা ১৭৫৬ সালের ২৪ মে ইংরেজদের হাত থেকে কাশিমবাজার দুর্গ দখল করে নেন এবং ২০ জুন দখল করেন কলিকাতা দুর্গ। ইংরেজরা পরাজয় বরণ করে সন্ধি করতে বাধ্য হয়। ১৭৫৭ সালে ক্লাইভ কলিকাতা দখল করলে ২০ জানুয়ারি সিরাজ পুনরায় কলিকাতা জয় করেন এবং মানিকচাঁদকে কলিকাতায় রেখে হুগলী যাত্রা করেন। কিন্তু মানিকচাঁদ বিশ্বাসঘাতকতা করে কলিকাতা ইংরেজদের হাতে তুলে দেয়। স্বদেশী বিশ্বাসঘাতকের ফলে এভাবেই সিরাজের স্বপ্ন ব্যর্থ হতে শুরু হয়। মানিকচাঁদ এ ষড়যন্ত্রে একা ছিল না, প্রধানও নয়। ষড়যন্ত্রের মূল হোতা ছিল জগৎশেঠ ও রাজবল্লভ। তাদের সাথে ছিল উমিচাঁদ, রায়দুর্লভ, নন্দকুমার প্রমুখ অনেকেই। ষড়যন্ত্রকারীরা দু'জন মুসলমান ইয়ার লতিফ ও মীরজাফরকেও হাত করল নবাবীর লোভ দেখিয়ে। আলীবর্দী সিরাজকে স্নেহ করতেন ও তাঁকে ভবিষ্যতে নবাব করতে চান- জানতে পেরে অপুত্রক আলীবর্দীর আত্মীয়স্বজনের অনেকে সিরাজকে হিংসার চোখে দেখতেন। তাদের এই মনোভাবকে কাজে লাগায় জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, রাজদুর্লভ, রায়লুর্ভ প্রমুখ কুচক্রীরা। কুচক্রীরা সিরাজের নবাবীর পক্ষপাতী না হলেও তাদের শেষ একটা আর ছিল যে, সিরাজ বয়সে তরুণ-সিংহাসনে আরোহণের পর তাঁকে বিলাসিতার স্রোতে ভাসিয়ে হয়ত কাজ উদ্ধার করা যাবে। কিন্তু সিংহাসনে আরোহণের পর সিরাজের জীবনে এলো শুভ বৈপ্লবিক পরিবর্তন। ফলে চক্রান্ত নতুন করে শুরু হলো।

কুচক্রী ও ইংরেজদের মধ্যে যে গোপন বৈঠক হয় তাতে একটি ব্যাপারে তারা একমত হয় যে, সিরাজকে সরিয়ে একজন মুসলমানকে নবাব করতে হবে, নইলে জনগণের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হবে। সে মতে, জগৎশেঠ প্রস্তাব করে তার বশংবদ ইয়ার লতিফের নাম।

কিন্তু ধূর্ত ক্লাইভ তা বাতিল করে মীরজাফরের নাম প্রস্তাব করে এই যুক্তিতে যে, সে সিরাজের আত্মীয়-কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলাই সহজ হবে। সিরাজের বদলে নবাব হতে পারবে এই লোভে প্রধান সেনাপতি মীরজাফর বিদেশী চক্রান্তের টোপ গিললেন।

এর পরের ইতিহাস সবার জানা। তেইশে জুন পলাশীতে যে যুদ্ধ হয় তা প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ ছিল না, ছিল যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা। মীরমদন, মোহনলালের আক্রমণে ইংরেজপক্ষ যখন ব্যতিব্যস্ত, মীরজাফরের সনির্বন্ধ অনুরোধে সিরাজ যুদ্ধবিরতিতে সম্মতি দিলেন। এরপর অপ্রস্তুত নবাব বাহিনীর উপর অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল ইংরেজরা। গদীলোভী প্রধান সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতায় এভাবেই পলাশীতে ইংরেজদের কাছে পরাজয় বরণ করলেন সিরাজউদ্দৌলা।

পলাশীর পরাজয়ের পর সিরাজ দ্রুত পালিয়ে যান রাজধানী মুর্শিদাবাদে। সেখানে অবস্থা সুবিধার নয় দেখে তিনি ছদ্মবেশে রওনা হন বিহারের দিকে। উদ্দেশ্য পুনরায়

www.pathagar.com

সৈন্য সংগ্রহ করে ইংরেজ বিতাড়নের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করা। কিন্তু বিধি ছিল বাম। তিনি পথিমধ্যে ধরা পড়লেন। অবশেষে তেসরা জুলাই তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করা হলো।

সিরাজ যদি মীরজাফরের মতো দেশের স্বার্থ বিক্রি করে ইংরেজদের বশংবদ 'নবাব' হতে রাজি থাকতেন তাহলে নিশ্চয়ই তাঁকে এভাবে হত্যা করা হতো না। কিন্তু সিরাজউদ্দৌলা তো চেয়েছিলেন বাংলার স্বাধীনতা, প্রকৃত স্বাধীনতা। বিদেশী শক্তির যোগসাজশে যে রাজত্ব পাওয়া যায় তার নাম আর যা-ই হোক স্বাধীনতা নয়।

বয়সে তরুণ হলেও সিরাজউদ্দৌলা ছিলেন গভীরভাবে ধর্মবিশ্বাসী। এক আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করেন না এমনি একজন অকুতোভয় বীর ছিলেন সিরাজ। ঘাতক যখন সিরাজকে হত্যা করতে উদ্যত হয়, একটি মাত্র অনুরোধ ছিল তাঁর। প্রাণভিক্ষা নয়, ওজু করে দু'রাকাত নামাজ আদায়ের সুযোগ দানের অনুরোধ তিনি জানান। তরুণ নবাবের এ অন্তিম অনুরোধ রক্ষা করেনি ইংরেজের সেবাদাস নবাবের বেতনভুক ঘাতক। ১৭৫৭ সালের তেসরা জুলাই ঘাতকের হাতে শাহাদাত বরণ করেন সিরাজউদ্দৌলা। সেদিন বেঁচেছিল ক্লাইভ, জগৎশেঠ, মীরজাফরেরা। কিন্তু আজ? আজ মুহূর্তে মুহূর্তে মৃত্যুর অভিশাপ কুড়াচ্ছে জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, মীরজাফরেরা। আর বাংলার স্বাধীনতার প্রতীকরূপে অমর হয়ে আছেন তরুণ নবাব শহীদ সিরাজউদ্দৌলা।

www.pathagar.com

নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও পলাশী বিপর্যয়

আসকার ইবনে শাইখ

পলাশী বিপর্যয়ের দিনটি ছিল ১৭৫৭ সালের ২৩ শে জুন বৃহস্পতিবার। এই দিনে সংঘটিত পলাশী যুদ্ধে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার বাহিনীকে 'পরাজিত' করেছিল ইংরেজ বেনিয়া কোম্পানীর অধিনায়ক রবার্ট ক্লাইভের বাহিনী। নবাব বাহিনীতে ছিল ঐতিহাসিক ম্যালিসনের মতে- ৩৫,০০০ পদাতিক, ১৫,০০০ অশ্বারোহী এবং ৫৩টি কামান; ওর্মির মতে- ৫০,০০০ পদাতিক, ১৪,০০০ হাজার অশ্বারোহী এবং ৫০টি কামান এবং স্ক্র্যাফটনের মতে- ৫০,০০০ হাজার অশ্বারোহী এবং ৫০টি কামান। আর কোম্পানী বাহিনীতে ছিল ৯০০ ইউরোপীয় সৈন্য, ১০০ তোপাসী এবং ২,১০০ দেশীয় সিপাহী। স্পষ্টতই, ইউরোপীয় ও দেশীয় সিপাহী নিয়ে সর্বমোট ২,০০০-এর মত এক ক্ষুদ্র কোম্পানী বাহিনী হারিয়ে দিয়েছিল প্রায় ৬৫,০০০-এর এক বিশাল নবাব বাহিনীকে। এমনিতে ব্যাপারটা একেবারেই অবিশ্বাস্য। কোন ইংরেজ ঐতিহাসিকই পলাশীর এই যুদ্ধকে যুদ্ধ ভাবেননি। ভেবেছেন 'যুদ্ধই ছিল না, ছিল একটা ষড়যন্ত্রমূলক যুদ্ধের অভিনয় মাত্র।' ঐতিহাসিক নিখিল নাথ রায়-এর কথায়, "বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই যে পলাশীতে ইংরেজরা জয়লাভ করিয়াছিল, ইহা নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক মাত্রেরই মত।" আমরা আর একজন ইংরেজ লেখকের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি ঃTruth will ascibe the achievement to treachery" (মুর্শিদাবাদ কাহিনী, ৩য় সংস্করণ, ১৩১৬, পৃঃ ২২২)। উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত প্রায় ৬৫,০০০ সৈন্যের মধ্যে প্রায় ৪৫,০০০ সৈন্যই ছিল বিশ্বাসঘাতক সেনাপতিদের অধীনে।

তাই তেইশে জুনকে ভদ্র ভাষায় অভিহিত করা যায়, 'পলাশী বিপর্যয়ের দিন' বলে। প্রকৃত

www.pathagar.com

প্রস্তাবে, এ দিনটিকে এতদ্দেশীয়দের বিশেষ করে, মুসলিমদের ভাগ্য বিপর্যয়ের দিনও বলা যায়। কার্য-কারণের নিরিখে বিশ্লেষণ করলে এ দিনটিকে বরং এতদ্দেশীয় মুসলিমদের ভাগ্য বিপর্যয়ের চূড়ান্ত ফল প্রকাশের দিন হিসাবে চিহ্নিত করতে হয়। সেই দৃষ্টিকোন থেকে দেখলে তেইশে জুন ছিল যুদ্ধাভিনয়ের মাধ্যমে বহুকাল ধরে চলমান একটা গভীর ষড়যন্ত্রের সাফল্য প্রকাশের দিন। বক্ষমান প্রবন্ধে এই দৃষ্টিকোণ থেকেই আমরা আমাদের বক্তব্য তুলে ধরতে চেষ্টা করব। তার আগে এখানে উদ্ধৃত করব ঐতিহাসিক সুপ্রকাশ রায়-এর কথাঃ "ভারতীয় সমাজের বিপর্যয়ের সুযোগ লইয়া বিদেশী ইংরেজ শক্তি সহজলব্ধ শিকার হিসাবে ভারতবর্ষকে গ্রাস করিতে আরম্ভ করিল। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের জয় তাহারই আরম্ভ মাত্র। .... তৎকালে ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী নিজ নিজ গভীর সংকটের আবর্তে তলাইয়া যাইতেছিল, সমাজের উপরতলার বিভিন্ন শক্তি পরস্পরের সহিত হানাহানি করিয়া পরস্পরের ধ্বংসের পথ প্রস্তুত করিতেছিল। বিদেশী ইংরেজের উন্নত শক্তির আক্রমণ প্রতিরোধের ক্ষমতা কাহারও আর অবশিষ্ট ছিল না। ইংরেজ শক্তিও এতদিন এই সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিল। এবার তাহারা দ্রুত অগ্রসর হইয়া ভারতের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ অঞ্চল বঙ্গদেশে ঝাঁকিয়া বসিয়া ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতবর্ষকেই গ্রাস করিতে আরম্ভ করিল।" (ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, ১৯৬৬, পৃঃ ৭)। পলাশী বিপর্যয়ের সাথে জড়িত ছিল তিনটি প্রধান শক্তি বা গ্রুপ। নবাবের অনুগত প্রধানেরা, নবাবের বিরোধী প্রধানেরা এবং ইংরেজরা। নবাবের বিরোধী গ্রুপটি নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হত জগৎশেঠ, মাহতাব চাঁদ, রাজবল্লভ, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, দুর্লভরাম প্রভৃতি প্রধানদের দ্বারা। ঐতিহাসিক তপন মোহন চট্টোপধ্যায় তাঁর 'পলাশীর যুদ্ধ' গ্রন্থে খোলাখুলিই লিখেছেন, "ষড়যন্ত্রটা আসলে হিন্দুদেরই ষড়যন্ত্র।.... হিন্দুদের চক্রান্তে হলেও বড়গোছের মুসলমানতো অন্তত একজন চাই। নইলে সিরাজ-উদ-দৌলার জায়গায় বাংলার নবাব হবেন কে? ক্লাইভতো নিজে হতেই পারেন না। হিন্দু গভর্নরও কেউ পছন্দ করবেন কি-না সন্দেহ। ..... জগৎশেঠরা তাঁদেরই আশ্রিত ইয়ার লতিফ খাঁকে সিরাজ-উদ-দৌলার জায়গায় বাংলার মসনদে বসাতে মনস্থ করেছিলেন। উমিচাঁদেরও এতে সায় ছিল। কিন্তু ক্লাইভ ঠিক করলেন অন্যরকম। তিনি এমন লোককে নবাব করতে চান যিনি ইংরেজদেরই তাঁবে থেকে তাঁদেরই কথা শুনে নবাবী করবেন। .... ক্লাইভ মনে মনে মীর জাফরকেই বাংলার ভাবী নবাব পদের জন্য মনোনীত করে রেখেছিলের।" (প্রথম মুদ্রন ১৯৫৩ পৃ ১৫৮-১৫৯)। এই যে তিনটি শক্তি বা গ্রুপ-পলাশীতে তাদের ভূমিকার স্বরূপ জানতে হলে সময়ের যে কিছু উজানে চলে যেতে হবে। সেই উজান থেকে ভাটির পথে পলাশীমুখী হলেই শক্তিত্রয়ের পরিচয়, উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলীর স্বাভাবিকতা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। উজান থেকে ভাটির দিকে এই পথ পরিক্রমায় প্রথমেই আসবে প্রাচ্যের মুসলিম ও প্রতীচ্যের খৃষ্টান শক্তির স্বার্থ-সংঘাত ও সংঘর্ষমুখী বৈরিতার কথা।

প্রাচ্যের অন্যতম সম্পদ সমৃদ্ধ বিশাল জনপদ ভারতবর্ষ অতীতে প্রতীচ্যের সাথে বাণিজ্যের মাধ্যমে যে বিপুল পরিমাণ অর্থোপার্জন করতো সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক শ্রী অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় বলেন, "তখন প্রাচ্যের তুলনায় অধিকাংশ প্রতীচ্য জনপদ নিরক্ষর জাতির আবাসভূমি বলিয়াই পরিচিত ছিল।" (ফিরিঙ্গি বণিক, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৩৬১ সন, পৃঃ ১)। তারপর পঞ্চম থেকে সপ্তম শতকের কথা উউরোপ বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপে চলছে তখন নতুন সমাজ বিন্যাস। রোমান শক্তির পতনে জনসাধারণের মাঝে এসছে এক বিরাট শুন্যতা। রোমান রাজশক্তি আর নেই, রোমান প্রভাবিত ধর্মীয় ধারণাও গতপ্রায় এবং তখন প্রায় সংস্কৃতিবিহীন সামন্ততন্ত্র মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। আর তার পাশাপাশি খৃষ্টীয় যাজকতন্ত্রও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। জন্ম দিয়েছে, খৃষ্টানুসারীদের অন্ধ বিশ্বাসপূর্ণ এক নৈরাশ্যজনক অবস্থা। এমনি অবস্থায় এসে গেল সপ্তম শতাব্দী। সপ্তম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মধ্যযুগের এই দ্বিতীয় পর্যায়ে ভুমধ্যসাগর কেন্দ্রিক বাণিজ্য প্রাধান্য পুরোপুরিভাবে এসে গেল মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে। আরবের ইসলামী রাষ্ট্র সপ্তম শতকের মাঝামাঝি সময়ের পারস্য ও বাইজানটাইন, সিরিয়া, জেরাজালেমসহ জাযিরারাতুল আরবসহ উত্তর-আফ্রিকাকে অন্তর্ভুক্ত করে ইউরোপের প্রান্তভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। অতঃপর তারেক বিন যিয়াদ স্পেনের মাটিতে মুসলিম বিজয়ের সূচনা করেন ৭১১ সালে; ৭১৭-৭১৮ সালে সিরীয় মুসলিমরা জয় করে নেয় রোডস দ্বীপপুঞ্জ এবং ওই শতকের মাঝামাঝি সময়ে সাইপ্রাসও। ৭৯৮ সালে বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করে নেন স্পেনে প্রতিষ্ঠিত উমাইয়াগন। কর্সিকা ও সার্ডিনিয়া বিজিত হয় ৮০৯ সালে এবং সিসিলি দ্বীপপুঞ্জ মুসলিম অধিকারে আসে ৮২৭ থেকে ৯০২ সালের মধ্যে। এই সিসিলি দ্বীপপুঞ্জের মাটি থেকেই মুসলিমরা ইটালিতে আক্রমণ চালিয়ে তার শাসকদের ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। মুসলিমদের এই যে বিরাট বিপুল বিজয়, স্বাভাবিকভাবেই তার প্রভাব অনুভূত হল শুধুমাত্র নববিজিত জনপদসমূহেই নয়, তার প্রভাব অনুভূত হল পাশ্ববর্তী অন্যান্য জনপদেও।। আর সে প্রভাব যেমন অনুভুত হল রাষ্ট্রীয় জীবনে, তেমনি অর্থনৈতিকক্ষেত্রেও এবং সেই সুবাদে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এবং তা অনুভূত হল বাণিজ্যের ক্ষেত্রে। সমগ্র অঞ্চলে মুসলিম নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এই যে সর্বনাশা বিপর্যয়, তার কারণ- প্রাচ্য প্রতীচ্যে বাণিজ্যের জন্য যে তিনটি প্রধান পথ ছিল, তার সবকটিই চলে গিয়েছিল মুসলিম শক্তির কঠোর নিয়ন্ত্রণে। ভূমধ্যসাগরের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব তখন মুসলিমদের। তাদের অনুমতিক্রমেই শুধুমাত্র অন্যান্য দেশ ও জাতির বাণিজ্য পোত সেখানে ভিড়তে পারত। একদিকে সমরকন্দ থেকে ভারতবর্ষের লাহোর, অন্যদিকে আটলান্টিক হয়ে স্পেন-বিশাল এ সাম্রাজ্যের অধিকারী মুসলিম শক্তির সামনে তখন উন্মুক্ত বাণিজ্য ভিত্তিক অতুল ঐশ্বর্যের দ্বার। এমনি অবস্থায় প্রতীচ্যের রাজ্যগুলো যে হিংসার আগুনে জ্বলে-পুড়ে মরবে, এতো স্বাভাবিক। একদিকে রাজ্যবিজয়ী অন্যদিকে বাণিজ্য বিজয়ী ইসলাম অনুসারীদের বিরুদ্ধে তাই প্রচন্ড আক্রোশ বিষিয়ে উঠল খৃষ্টান ইউরোপের মন ও মানস। খৃস্টান প্রতীচ্যের কাছে প্রাচ্যের এই ইসলাম অনুসারী শক্তিটি হয়ে দাঁড়াল এক জানী দুশমন।

জানী দুশমনের বিরুদ্ধে যাজক প্রভাবিত ইউরোপের প্রচন্ড আক্রোশ প্রকাশের অমোঘ উপায় হয়ে দাঁড়াল জেরুজালেম পুনরাধিকারের মাধ্যমেই মুসলিম শক্তির

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে খৃষ্টান শক্তির ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল ১০৯৫ সালে। ১০৯৫ থেকে ১২৯১ সাল পর্যন্ত এই প্রায় তিনশ' বছরের দৃশ্যমান ক্রুসেডকালকে ঐতিহাসিকেরা তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করেন। ১০৯৫ থেকে ১১৪৪ সাল পর্যন্ত প্রথম পর্যায়, ১১৪৪ থেকে ১১৯৩ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্যায় এবং ১১৯৩ সাল থেকে ১২৯১ সাল পর্যন্ত তৃতীয় পর্যায়। ফলাফলের দিক দিয়ে প্রথম পর্যায়ে পর্যুদস্ত হয়েছিল মুসলিমরা, কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে চরম পরাজয়বরলণ করেছিলল খৃষ্টানেরা। এমনিভাবে ক্রুসেড করে, এমনকি মুসলিম শক্তি ধ্বংস করার উদ্দেশ্য চেঙ্গিস খানের বংশধরদের প্ররোচিত করেও ব্যর্থকাম খৃষ্টান শক্তি তার পাশাবিক আক্রোশ বুকে চেপে একই উদ্দেশ্য ভিন্নতর পথ অনুসন্ধানে নিয়োজিত হল। উদ্দেশ্য একই-মুসলিম শক্তির ধ্বংস সাধন। ততদিন মুসলিম শক্তির জোয়ারে পড়েছে ভাটা টান। ১২৫৬ সালে হালাকু খানের বাগদাদ ধ্বংসের পর মুসলিমদের শক্তি কেন্দ্র স্থানান্তরিত হয় প্রথম মিসরে, পরবর্তীতে তুরস্কে। সেই ইতিহাসে না গিয়ে আমরা এবার ভারতমুখী হতে চাই। ক্রুসেড ব্যর্থকাম হয়ে উপরোপ প্রাচ্য বাণিজ্যের নতুন পথ আবিষ্কারের জন্য মরিয়া হয়ে উঠল। মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণ এড়িয়ে কি করে প্রাচ্যের বিশেষ করে ভারতবর্শের, উপকূলীয় অঞ্চলে পৌঁছা যায়, তা হয়ে দাঁড়াল ইউরোপের রাতদিনের চিন্তা। ক্রুসেডারদের দুঃসাহসী স্বাভাবই শেষ পর্যন্ত এক অনুসন্ধানী আাবিষ্কার যুগের জন্ম দিল ইউরোপে।

যাজকদের ভ্রান্তিপূর্ণ নির্দেশাবলীর প্রুতি অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারের আঁধার ভেদ করে ইউরোপের দিগন্তে দেখা দিল নবসূর্যের রক্তিমাভা। তখন পনের শতক শেষ হয়ে এসেছে। ১৪৯২ সাল। এই সালেই একদিকে কলাম্বাস অন্যদিক ভাস্কোদা গামা নতুন সমুদ্র পথ সন্ধানে অনিশ্চিতের পথে যাত্রা শুরু করেছিলেন। ১৪৯২ সালের জানুয়ারিতে রাজা-রাণী ফার্দিনান্দ ইসাবেলার বাহিনী

www.pathagar.com

মীরজাফর

ডঃ কিরণ চন্দ্র চৌধুরী

বিশ্বাসঘাতকতা, জালিয়াতি, শঠতা-সর্বপ্রকার নীচ স্বার্থপরতার মিলিত আঘাতে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পতন ঘটিলে (১৭৫৭) বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার-স্বরূপ ইংরাজদের সাহায্যে মীরজাফর বাংলার মসনদ লাভ করিলেন। ইংরাজদের সাহায্যলাভের আগ্রহে মিরজাফর নবাবের অর্থভান্ডারের ক্ষমতার অতিরিক্ত পুরস্কার ইংরাজ কোম্পানিকে দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু মসনদে আরোহণ করিয়া তিনি মুর্শিদাবাদের রাজকোষে সেই পরিমাণ অর্থ পাইলেন না। কিন্তু ইংরাজদের দাবি উপেক্ষা করা চলিল না। আসবাবপত্র, মূল্যবান ধাতুনির্মিত বাসনপত্র বিক্রয় করিয়া দেড় কোটি টাকারও অধিক অর্থ ইংরাজ কোম্পানিকে দিতে হইল। ক্লাইভ স্বয়ং প্রভূত পরিমাণ অর্থ পুরস্কার হিসাবে গ্রহণ করিলেন। তিনি বাৎসরিক ত্রিশ হাজার পাউণ্ডের একটি জায়গীর গ্রহণ করিলন। মীরজাফরের আর্থিক অনটনের কথা জানিয়াও ক্লাইভ তাহার নিকট হইতে এইভাবে অর্থ আদায় করিয়া মীরজাফরের শাসনব্যবস্থাকে পঙ্গু করিয়া দিয়াছিলেন। শাসনকার্যে মীরজাফরের অসাফল্যের পশ্চাতে ক্লাইভের অর্থগৃধ্নুতা যে বহুলাংশে দায়ী ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহা ভিন্ন উমিচাঁদ নামক জনৈক শিখ বণিকের মাধ্যমে মীরজাফরের সহিত ষড়যন্ত্র সম্পন্ন হইয়াছিল। এই কারণে উমিচাঁদ নিজ পারিশ্রমিক হিসাবে প্রভূত পরিমাণ কমিশন (Commission) বা বাট্টা দাবি করিয়াছিলেন। ক্লাইভ উমিচাঁদের দাবি স্বীকার করিয়া একটি জাল দলিল প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কিন্তু মীরজাফরের সহিত যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল তাহাতে উমিচাঁদের প্রাপ্য অর্থের কোন উল্লেখ তিনি করেন নাই। শুধু তাহাই নহে, এই জাল দলিলে ওয়াট-সন স্বাক্ষর করিতে অস্বীকৃত হইলে ক্লাইভ উহাতে ওয়াট্‌সনের স্বাক্ষর জাল করাইয়াছিলেন।

www.pathagar.com

কার্যসিদ্ধি হইলে পর ক্লাইভ উমিচাঁদের দলিল খাঁটি নহে-একথা বলিয়া তাহার প্রাপ্য এড়াইতে দ্বিধাবোধ করিলেন না। ষড়যন্ত্রকারী উমিচাঁদের তাহাতে উচিত শাস্তি হইলেও ক্লাইভ যে ইহা দ্বারা নিজ চরিত্র মসীলিপ্ত করিয়াছিলেন তাহাতে দ্বিমতের অবকাশ নাই।

মসনদে আরোহণ করিয়াই আর্থিক অনটনের মধ্যেও ইংরাজদের দাবি মিটাইবার ফলে মীরজাফরের শাসনব্যবস্থায় যে দুর্বলতা দেখা দিল উহার পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁহার পরবর্তী কার্যকলাপ বিচার্য। তিনি উচ্চপদস্থ হিন্দু কর্মচারী ও জমিদারগণের নিকট হইতে অন্যায়-অত্যাচারের দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিতে চাহিলেন। মেদিনীপুরের শাসনকর্তা রামরাম সিং, বিহারের শাসনকর্তা রামনারায়ণ এবং দেওয়ান রায়দুর্লভের সঞ্চিত অর্থ তিনি আত্মসাৎ করিতে চাহিলেন। রামরাম সিংকে তিনি পূর্বেকার কয়েক বৎসরের অনাদায়িকৃত খাজনার কৈফিয়ত দিবার জন্য মুর্শিদাবাদে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু এমন সময়ে ঢাকা ও পূর্ণিয়ায় বিদ্রোহ দেখা দিলে এ বিষয়ে তিনি আর অগ্রসর হইবার অবকাশ পাইলেন না। ক্লাইভের সাহায্যে ঢাকার বিদ্রোহ দমন করা হইল বটে, কিন্তু পূর্ণিয়ার বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হইবার কালে মীরজাফরের সেনাবাহিনী তাহাদের বহুদিন যাবৎ প্রাপ্য বেতন না পাইলে পূর্ণিয়ার দিকে অগ্রসর হইতে রাজী হইল না। মীরজাফর বাধ্য হইয়াই ইংরাজদের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। ফলে, সেই সাহায্যের জন্য ইংরাজ কোম্পানির নিকট তাঁহাকে আরও ঋণগ্রস্ত হইতে হইল। পূর্ণিয়ার বিদ্রোহ দমন করিয়া ক্লাইভ সৈন্য সাহায্যদানের জন্য কোম্পানির প্রাপ্য মিরজাফরের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইলেন। মিরজাফরের আর্থিক দুরবস্থা চরমে পৌঁছিল।

ইতিমধ্যে মীরজাফরের ন্যায় হীনচেতা ব্যক্তির পক্ষেও ইংরাজদের ঔদ্ধত্য সহ্য করা আর সম্ভব হইল না। সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে, ঢাকা ও পূর্ণিয়ার বিদ্রোহ দমনে এবং সম্রাট শাহ্ আলমের আক্রমণ প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে পুনঃ পুনঃ ইংরাজ সাহায্য গ্রহণের ফলে তাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, মীরজাফর নবাব হইয়াও নবাবের প্রকৃত ক্ষমতা ভোগ করিতে পারিলেন না। অতিষ্ঠ হইয়া তিনি ওলন্দাজগণের সাহায্যে বাংলাদেশ হইতে ইংরাজগণকে দূর করিবার জন্য গোপনে পত্রালাপ শুরু করিলেন। চুঁচুড়ার ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষ বাটাভিয়া হইতে এই উদ্দেশ্যে সাতখানি যুদ্ধজাহাজ আনাইলেন। ১৭৫৯ খ্রীস্টাব্দের শেষ ভাগে হুগলী নদীর মোহনায় ওলন্দাজ নৌবহর উপস্থিত হইল। ক্লাইভ পূর্ব হইতেই মীরজাফরের সহিত ওলন্দাজগণের গোপন যোগাযোগের সংবাদ পাইয়া ছিলেন। তিনি ওলন্দাজ নৌবহর আক্রমণ করিয়া বিদারা (Bidderah)-এর যুদ্ধে উহা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করিলেন। এই যুদ্ধে ওলন্দাজগণের পরাজয়ে ওলন্দাজ বণিক ও মীরজাফর উভয়েরই ভবিষ্যৎ আশা বিনাশপ্রাপ্ত হইল।

এমন সময় মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীরের পুত্র শাহ্জাদা আলি গৌহর, ওয়াজীর গাজীউদ্দিনের হস্তে পিতা এক প্রকার বন্দিদশা প্রাপ্ত হইয়াছেন দেখিয়া দিল্লী হইতে পলায়ন করেন। তিনি এলাহাবাদের শাসনকর্তা মহম্মদ কুলী খাঁ ও অযোধ্যার শাসনকর্তা সুজা-উদ্-দৌলার সাহায্য লইয়া বাংলাদেশ জয় করিতে চাহিলেন। এইভাবে তিনি এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করিতেছিলেন। তিনি কুলী খাঁর সাহায্য লইয়া ১৭৫৮ খ্রীস্টাব্দে বিহার আক্রমণ করিলেন। কিন্তু কুলী খাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া সুজা-উদ্-দৌলা এলাহাবাদ আক্রমণ করিলে কুলী খাঁ বাধ্য হইয়া নিজ রাজ্যে ফিরিয়া

www.pathagar.com

গেলেন। আলি গৌহর এককভাবে বিহার জয় করা অসম্ভব দেখিয়া এ যাত্রা ফিরিয়া গেলেন। কয়েক মাসের মধ্যেই ওয়াজীর গাজীউদ্দিন সম্রাট আলমগীরকে হত্যা করিলে আলি গৌহর 'দ্বিতীয় শাহ্ আলম' উপাধি ধারণ করিয়া দিল্লীর বাদশাহ হইলেন এবং সুজা-উদ্-দৌলাকে নিজ ওয়াজীর নিযুক্ত করিলেন। ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে তিনি ও সুজা-উদ্-দৌলা পুনরায় পাটনা আক্রমণ করিতে গিয়া পরাজিত হইলেন। ইহার পর তিনি মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইয়া ইংরাজদের হস্তে পরাজিত হইলেন।

মীরজাফরের অকর্মন্যতা ইংরাজদের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিলে হল্ওয়েলের প্রস্তাবক্রমে তাহাকে মসনদচ্যুত করা স্থির হইল।* ওলন্দাজদের সহিত ষড়যন্ত্র এবং আলি গৌহরের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের অভিযোগে মীরজাফর মসনদচ্যুত হইলেন। ইতিমধ্যে (১৭৬০) রবার্ট ক্লাইভ ইংলন্ডে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। কলিকাতায় ইংরাজ গভর্নর ছিলেন ভ্যান্সিটার্ট (Vansittart)। ইংরাজদের সাহায্যে মীরজাফরের জামাতা মিরকাশিম বাংলার নবাবপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। সম্রাট শাহ্ আলম বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা রাজস্বের পরিবর্তে মিরকাশিমকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব বলিয়া আইনত স্বীকার করিয়া লইলেন : ইংরাজ কোম্পানিও মিরকাশিমের নিকট হইতে উপযুক্ত পুরস্কার গ্রহণে ত্রুটি করিল না। নবাব পরিবর্তন তাহাদের নিকট একটি লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছিল। ঐ যুগের বাংলাদেশের ইতিহাসে ইংরাজদের এরূপ স্বার্থলোলুপতা ইংরাজ জাতির চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করিয়াছে সন্দেহ নাই। 'মানবতা' ও 'ভগবানের' নামে শপথ করিয়া তাহারা মীরজাফরকে বাংলার মসনদে স্থাপন করিয়াছিল এবং তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হইয়া স্বার্থসিদ্ধি করিতে তাহারা কুণ্ঠাবোধ করে নাই। এই সময়কার ইংরাজদের নীচ স্বার্থপরতার কথা উল্লেখ করিতে গিয়া স্যার আল্ফ্রেড্ লায়েল (Sir Alfred Lyall) বলিয়াছেন যে, উহা ইংরাজ নামে কলঙ্ক লেপন করিয়াছিল।

* "It cannot be doubted that Holwell and in turn Vansittart honestly believed that the Nawab, whom the English had enthroned after Plassey. was a person in whom no confidence could be placed. They held that he was not only incompetent but also treacherous .... " Ferminger.

"The only period of aAnglo. Indian histiory which throws grave and unpardonable discredit on the English nadme." Sir Afed lyall, vude Robevts p.149.

www.pathagar.com

তিমিরায়নের পটরেখা

ডঃ গোলাম কাদির

মধ্যাহ্ন দিনের উজ্জ্বল দীপ্তির অন্তরালে লুকিয়ে থাকে যেমন সন্ধ্যাতিমিরের বীজ, উনিশ শতকের ঘটনাবলীর উৎস সন্ধানে তেমনি আমাদের যাত্রা হবে আঠার শতক বা তার আরো পূর্বে। ১৭০৭ সালে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দ্রুত পরিবর্তন নেমে আসে। আওরঙ্গজেবের পুত্র ও উত্তরাধিকারী প্রথম বাহাদুর শাহ্ অতি অল্পকাল শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর পরবর্তী মুঘল সম্রাটেরা যোগ্যতা, দূরদর্শিতা এবং চারিত্রিক দৃঢ়তায় আওরঙ্গজেব বা তাঁর পূর্ব পুরুষদের কারো সমকক্ষ ছিলেন না। পক্ষান্তরে দাক্ষিণাত্যে মারাঠা শক্তির উত্থান, প্রাদেশিক শাসন কর্তাদের স্বায়ত্তশাসন লাভের সক্রিয় প্রচেষ্টা, আমীর-ওমরাহ্ ও বিভিন্ন শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীদের উচ্চাভিলাষ ও নানা প্রকার দুর্নীতিপরায়ণতা এবং সাগরপাড়ের ইউরোপীয় শক্তি বিশেষ করে ইংরেজদের ক্রমবর্ধমান ভারতীয় রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের ফলে সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় শক্তি এক অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে যে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, প্রশাসনিক দক্ষতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং বিচক্ষণ দূরদর্শিতার প্রয়োজন, দুর্ভাগ্যক্রমে পরবর্তী মুসলিম শাসকদের কারো মধ্যেই তার সমাবেশ ঘটেনি। ফলে অনিবার্য দ্রুততার সঙ্গে সেখানে ভাঙ্গন ধরে এবং অর্ধ শতকের মধ্যেই ভারতীয় রাজনৈতিক মঞ্চে নতুন এক শক্তির আবির্ভাব ঘটে। সে শক্তি অবাঞ্ছিত হলেও বাস্তব, অপরিচিত হলেও প্রায় দুই শতাব্দী কালের প্রভুশক্তি। বলা বাহুল্য, সাগর দ্বীপের অধিবাসী ইংরেজ জাতি সে শক্তির নিয়ামক।

প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছে আরো পূর্বে। সম্রাট জাহাঙ্গীর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী নামে ইংরেজদের একটি বাণিজ্য সংস্থাকে সুরাট বন্দরে বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের অনুমতি দেন

www.pathagar.com

১৬০৮ সালে। কিন্তু নানা প্রতিবন্ধকতার দরুন সে কুঠি স্থাপিত হয় ১৬১২ সালে। মুঘলদের ভারত সাম্রাজ্যে এটি এমনি এক তুচ্ছ ঘটনা যে, কারো তা নজরে পড়ার কথা নয়। পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরেজ প্রভৃতি বিদেশী বাণিজ্য দলগুলোর সম্মিলিত মূলধনেরও বহুগুণ বেশী মূলধনসম্পন্ন অনেক দেশীয় বাণিজ্য দল সক্রিয় থাকায়, সুরাট বন্দরে ইংরেজদের উপস্থিতি তখন অবজ্ঞা ও উপহাসের বিষয়। ইংরেজরা তাদের প্রতি সম্রাটের সুনজর বৃদ্ধির আশায় তাঁর দরবারে একজন দূত পাঠাতে দেশে অনুরোধ করে পাঠায়। ফলে ১৬১৫ সালে স্যার টমাস রো জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন এবং ইংল্যান্ডের রাজার দূতরূপে আজমীর, মান্ডু ও আহমদাবাদ তিন বছর অবস্থান করেন। তাঁর চেষ্টায় আরো কয়েক স্থানে ইংরেজদের বাণিজ্য প্রসারিত হয়। টমাস রো ইংরেজ কোম্পানীর জন্য যে নীতি ও আদর্শ নির্ধারণ করেন, তা নির্ভেজাল বাণিজ্য নীতি। তাঁর নিজের কথায়, "Let this be received as a rule that if you will profit, seek it at sea, and in quite trade ; for with controversy, it is an error to affect garrision and land wars in India".

এরপরের ঘটনা সতর শতকের মাঝামাঝি সময়ের (১৬৪৪-৫০)। সম্রাট শাহজাহান তখন দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করছেন। একদিন তাঁর কন্যার পরিধেয় বস্ত্রে আগুন লেগে প্রায় সর্বাঙ্গ দগ্ধ হয়ে যায়। দেশীয় চিকিৎসায় তেমন অগ্রগতি না দেখে সুরাট বন্দরের ইংরেজ চিকিৎসককে ডেকে পাঠালেন সম্রাট। এই ভাগ্যবান চিকিৎসক গাব্রিয়েল বাউটন সম্রাট নন্দিনীকে আরোগ্য করে তুলেন। স্বভাবতই সন্তান-বৎসল পিতা শাহজাহান চিকিৎসকের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ করেন। স্বজাতিপ্রাণ এই বাউটনের অনুরোধে ইংরেজ কোম্পানী বাংলাদেশে আংশিক বাণিজ্যের অধিকার সম্বলিত একটি শাহী ফরমান লাভ করে। বাংলার সুবাদার শাহজাদা শুজার পারিবারিক চিকিৎসকরূপে ১৬৪৫ সাল হতে তিন বছরের জন্য নিয়োজিত ছিলেন এই বাউটন। তাঁর অনুরোধে শাহী ফরমানটি না দেখেই শাহজাদা শুজা মাত্র ৩,০০০ হাজার টাকা বার্ষিক নজরের বিনিময়ে ইংরেজদের বাণিজ্যের অনুমতি দান করেন বাংলাদেশে। এই অধিকারবলে ১৬৫০ সালে হুগলীতে ইংরেজরা প্রথম কুঠি স্থাপন করে এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন বন্দরে বিনা শুল্কে তাদের অবাধ বাণিজ্যের সূত্রপাত হয়।

পরবর্তী সম্রাট আওরঙ্গজেবের নিকট হতে ১৬৭০ সালে কোম্পানী আর একটি ফরমান লাভ করে। এটির ব্যাখ্যা নিয়ে কোম্পানী ও নবাব সরকারের অফিসারদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। কোম্পানীর মতে, শুধু সুরাট বন্দরে তার মালামালের উপরে ৩ ত(১,২)% ভাগ শুল্ক সরকারের প্রাপ্য ; অন্যদিকে সরকারী ভাষ্য-মতে সুরাটসহ ভারতের সর্বত্রই ৩ ত(১,২)% ভাগ শুল্ক কোম্পানীর পণ্যদ্রব্যের উপর আদায় করা হবে। কোম্পানীর এজেন্টরা এ সমস্যা সমাধানের জন্য বিলাতে কোর্ট অব ডিরেক্টরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু কোর্ট প্রতিকূল ক্ষেত্রে নবাব কর্মচারীদের ঘুষ দানের পরামর্শ দেয়। এভাবে ঘুষের মাধ্যমে দুর্নীতি প্রসারের চেষ্টাও তারা এ দেশে শুরু করে। কিন্তু তাতেও কোম্পানীর বিনা শুল্কে বাণিজ্য সম্ভব হল না। নবাব শায়েস্তা খানের সঙ্গে এই নিয়ে কোম্পানীর বিরোধ বাঁধে। ফলে বাংলাদেশে কোম্পানীর প্রথম গভর্নর উইলিয়াম হেজেজে ঢাকায় শায়েস্তা খানের দরবারে নতুন সুবিধা লাভের আশায় দুই মাসকাল অবস্থান করেন। কিন্তু শায়েস্তা খান নতুন একটি ফরমান প্রাপ্তির ব্যাপারে দিল্লীর

www.pathagar.com

দরবারে কোম্পানীর পক্ষে কথা বলার প্রতিশ্রুতি ভিন্ন কোন সুযোগই দিলেন না। ফলে কোম্পানীর অবাধ ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেল, নবাব কর্মচারী তেমনি শুল্ক আদায় করে চলল।

ইতোমধ্যে ইংরেজ কোম্পানী টমাস রো-র নির্ধারিত আদর্শ হতে অনেক দূরে সরে গেছে। সম্ভবতঃ মুঘল সাম্রাজ্যের আসন্ন দুর্বল দিকগুলো সাগর পাড়ের ধনতান্ত্রিক মানসে ভারতীয় রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের প্রেরণা দিয়েছিল। এই সময়কার প্রামাণ্য দলিলপত্রে এ কথার সমর্থন মিলে। বৃটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা নগরীর পত্তনকারী জব চার্ণক, কোম্পানীর অন্যতম কর্মচারী জেরাল্ড আঙ্গিয়ের প্রভৃতির বক্তব্যে তার আভাষ পাই। কিন্তু ১৬৮৭ সালে বিলাতে কোম্পানীর সভাপতি ও কাউন্সিলকে লিখিত পত্রে এ বিষয়ের স্পষ্ট উল্লেখ আছে,– ---"establish such a politic of civil and military power and create and secure such a large revenue---- as may be the foundation of a large, well-grounded sure English domination in India for all time to come."

এই প্রেক্ষিতেই কোম্পানী তার অন্তরে লালিত অর্বাচীন উচ্চাভিলাসে ১৬৮৫ সালে নবাব-সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসে। ইংল্যান্ড থেকে ক্যাপ্টেন নিকলসনকে পাঠানো হয় ৬০০ সৈন্যসহ সজ্জিত দশটি জাহাজের অধিনায়ক করে। মাদ্রাজে কোম্পানীর আরো ৪০০ শত সৈন্য যোগ দেয় তাদের সঙ্গে। চট্টগ্রাম দখল করে পূর্বাঞ্চলীয় বাণিজ্যের স্থায়ী কেন্দ্র স্থাপনের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল নিকলসনকে। কিন্তু প্রথমেই তারা হুগলী বন্দর আক্রমণ করে টিকতে না পেরে পিছু হটে সূতানটী গ্রামে আশ্রয় নেয়। এদিকে সম্রাট আওরঙ্গজেব ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে ভারতীয় সব কটি ইংরেজ কুঠি হতে তাদের বিতাড়িত করেন। ওদিকে বোম্বের গভর্নর ও সুরাট বন্দরে কোম্পানীর এজেন্ট স্যার জন চাইল্ড মুঘলদের পণ্য ও হজ্ব যাত্রীবাহী জাহাজ আক্রমণ করে বসে। ফলে ক্রুদ্ধ সম্রাট ভারতভূমি হতে ইংরেজদের সমূলে উচ্ছেদের সক্রিয় চিন্তা শুরু করেন। কিন্তু ইংরেজদের শোচনীয় পরাজয় ও অপমানজনক আত্মসমর্পণে শেষ পর্যন্ত তিনি তাদের ক্ষমা প্রদর্শন করেন। পরাজিত ইংরেজ প্রতিনিধি জর্জ ওয়েল্ডন এবং আব্রাহাম নাভারোকে রজ্জুবদ্ধ হস্তে (their hands tied by a sash before them) দিল্লীর দরবারে সম্রাট আওরঙ্গজেবের নিকট হাজির করা হয়। সম্রাট তাদের পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড জরিমানা করেন এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ আদায় করেন। ভবিষ্যতে সদাচরণের প্রতিশ্রুতি এবং বাণিজ্যের পূর্বশর্ত মেনে চলতে অঙ্গীকার করে ইংরেজরা। পরবর্তীকালে সম্রাটের ক্রোধ কিছুটা উপশম হলে বার্ষিক ৩,০০০ টাকা নজরানা আদায় করে বাংলাদেশে আবার বাণিজ্যের অনুমতি লাভ করে তারা। সুবাদার ইব্রাহীম খানের সময় ১৬৯০ সালে জব চার্ণক আবার বাংলাদেশের সূতানটীতে ফিরে আসেন। এটি অবশ্য ইংরেজদের কূটনৈতিক সাফল্যেরই পরিচায়ক।

১৬৯৮ সালে শাহজাদা আজিম-উস-সানের সুবাদারী আমলে (১৬৯৭-১৭০৩) মাত্র ১৬,০০০ টাকা ঘুষের বিনিময়ে জব চার্ণকের চেষ্টায় কোম্পানী সূতনটী, গোবিন্দপুর ও কলকাতা–এই তিনটি গ্রামের জমিদারী অর্থাৎ খাজনা আদায়ের অধিকার লাভ করে। উপমহাদেশের মানচিত্রে অজ্ঞাত এক গ্রামাঞ্চলে ইংরেজ ভারতের ভবিষ্যৎ রাজধানী কলকাতা নগরীর পত্তন ইংরেজদের এই আর্থ-রাজনৈতিক স্বার্থের পটভূমিতেই।

www.pathagar.com

১৭০৭ সালে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তাঁর দেয়া ফরমানের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। নবাব মুর্শিদ কুলি খান এই সময় কাশিমবাজার, রাজমহল ও পাটনায় ইংরেজ কুঠি বন্ধ করে দেন। কোম্পানী জন সুরম্যানের নেতৃত্বে দিল্লীর দরবারে এক প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন। সম্রাট ফররুখ শিয়ার (১৭১৩–১৭১৯) মুঘলদের এককালের শত্রু মারওয়ারের রাজপুত রাজা অজিত সিংহের কন্যার পানি গ্রহণের ইচ্ছায় ছিলেন পুলক-শিহরিত। কিন্তু তাঁর সাময়িক শারীরিক অক্ষমতা তাঁকে দুশ্চিন্তায় নিমগ্ন করে রেখেছিল। জনৈক ইংরেজ চিকিৎসক এ সময় তাঁকে আরোগ্য করে তোলায় ইংরেজদের প্রতি কৃতজ্ঞতার ফলস্বরূপ একটি ফরামন ও দুটি হুস্‌বুল হুকুমের মাধ্যমে কোম্পানীকে তিনি প্রায় ঢালাও লাইসেন্স দিয়ে দিলেন। তারা স্থল ও নৌপথে বিনা শুল্কে বাণিজ্যের সুযোগ, কলকাতার নিকটবর্তী ৩৮টি গ্রামের রায়তি মালিকানার অধিকার এবং তাদের নিজস্ব মুদ্রা তৈরীর অনুমতি লাভ করল। এটিই ১৭১৭ সালের কোম্পানীর অধিকারনামে পরিচিত।

কিন্তু মুর্শিদকুলি খান ফররুখ শিয়ারের মত আবেগাপ্লুত ছিলেন না। তিনি কোম্পানীকে ভূসম্পত্তি লাভ, নিজস্ব মুদ্রা প্রচলন এবং করমুক্ত অবাধ বাণিজ্যের অনুমতি দিতে রাজী হলেন না। কোম্পানীর লোভী কর্মচারীরা তাদের নিজস্ব পণ্যদ্রব্য কোম্পানীর নামে চালাবার চেষ্টা করে। এই হীন প্রচেষ্টা থেকেই কুখ্যাত দস্তক প্রথার সৃষ্টি। পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ ও গুণাগুণ উল্লেখ করে কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী প্রদত্ত করমুক্তির অনুমতিপত্রকেই দস্তক বলা হত। কোম্পানীর নিজস্ব মালামালের সঙ্গে তার কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের পণ্যদ্রব্যও এই দস্তকের মাধ্যমে করমুক্ত বলে গণ্য হতো। আর এটি ব্যবহৃত হতো কর্মচারী, দেশীয় আমলা, ফড়িয়া প্রভৃতি কোম্পানীর আশ্রিত সকলের ক্ষেত্রে। এই প্রথার ফলে জালিয়াতির মতোই নবাব তথা মুঘল সরকারের প্রাপ্য অপরিমেয় অর্থলাভ করে কোম্পানী ও তার এজেন্টেরা। অন্যদিকে গ্রাম কেনার অনুমতি না পেয়ে কোম্পানী তার দেশীয় গোমস্তাদের নামে সম্পত্তি কিনে জমিদারী বাড়িয়ে তুলে। স্বভাবতই নবাব সরকার তাদের ইচ্ছা ও কোম্পানীর মধ্যে সম্পর্কের ক্রম অবনতি ঘটতে থাকে এবং পরবর্তী নবাব সুজাউদ্দিন খান (১৭২৫-৩৯), আলীবর্দী খান (১৭৪০–৫৬) এবং সিরাজউদ্দৌলার সময় (১৭৫৬–৫৭) এটি চরম পরিণতি লাভ করে।

পলাশীর সেই দুরপনেয় কলঙ্ক ও শোচনীয় পরাজয়ের অন্তরালে আরো যে সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব ফেলেছে সেগুলোর উল্লেখ প্রয়োজন বলে মনে করি।

আরওঙ্গজেবের মৃত্যুর পর প্রকৃতপক্ষেই মুঘল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। এই দুর্বলতার সুযোগে বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার স্বায়ত্তশাসিত রূপ ধারণ করে ক্রমশ স্বাধীনতা ঘোষণা করতে থাকে। মোহাম্মদ শাহের রাজত্বকালে (১৭১৯–৪৮) অযোধ্যার সা'দত আলী খান, দাক্ষিণাত্যে নিজামুল মুলক, বাংলাদেশে মুর্শিদকুলি খান, ফারুখাবাদে বাঙ্গাশ পাঠানগণ এবং রোহিলাখণ্ডে দাউদ খান স্বায়ত্তশাসনের প্রবর্তন করেন। আবার একই দুর্বলতার সুযোগে দিল্লীর উত্তর-পশ্চিমে শিখ ও রাজপুত বিদ্রোহ এবং দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের উত্থান মুঘলদের বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই সঙ্গে ১৭৩৯ সালে আফগান অধিপতি নাদির শাহের ভারত আক্রমণ এবং তাঁর উত্তরাধিকারী আহমদ শাহ্ আবদালীর বারবার ভারত অভিযানের কথাও উল্লেখযোগ্য। ১৭৬১ সালে

www.pathagar.com

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে রোহিলাধিপতি নজিবদ্দৌলার সহায়তায় এই আহমদ শাহ্ আবদালীই মারাঠা শক্তিকে চরমভাবে পরাজিত করেন।

এই সময় বিদেশী বাণিজ্য সংস্থাগুলো পরস্পরের প্রতিযোগী হয়ে ওঠে এবং স্বাধীনতাকামী দেশীয় রাজন্যবর্গকে ভাড়ায় সৈন্য ও রসদপত্র দিয়ে সাহায্য করতে থাকে। পরিণামে বিজয়ীদের সাহায্যে তারা ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভূমিসত্বের অধিকার লাভ করে। তার ফলে তারা ভারতীয় রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করতে সাহসী ও অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

মুঘল শক্তির দুর্বলতার প্রেক্ষিতে ভারতে হিন্দু জাতীয়তাবাদী উত্থানের সুযোগ দেখা দেয়। কিন্তু নিজেদের মধ্যে আদর্শের গড়মিল, স্বার্থের সংঘাত, ক্ষেত্রবিশেষে উদ্দেশ্যহীন লুণ্ঠন ও বেপরোয়া খন-জখমের ফলে এটি স্পষ্ট কোনরূপ লাভ করতে পারেনি। তবে সতর শতকের শেষার্ধ হতেই ইউরোপীয় বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে একটি শক্তিশালী হিন্দু বণিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। তাদের অতীত প্রায় অজ্ঞাত ; কিন্তু ইউরোপীয় ধনতান্ত্রিক ছত্রছায়ায় লালিত ও পুষ্ট হয়ে তারা বিদেশী স্বার্থের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করে দেখতে শিখে এবং বিভিন্ন প্রশাসন কেন্দ্রে স্বার্থপর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় বিদেশীদের সঙ্গে। ১৭৯৩ সালে প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এদের অনেকেরই বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হয় জমিদারী ক্রয়ের মাধ্যমে। এদেরই মাঝখান থেকে উনিশ শতকে ইংরেজদের আর্থিক আশ্রয়ে লালিত ও শিক্ষা-সংস্কৃতিতে আলোকপ্রাপ্ত একটি মধ্যবিত্ত হিন্দু সমাজের সৃষ্টি। প্রাদেশিক সরকারগুলোর উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বৈধ কোন নিয়ম-কানুন না থাকায় এ ষড়যন্ত্র আরো সহজে রূপ লাভ করে। নবাব সুজাউদ্দিন খানের আমলেই এ আলামত প্রথম প্রকাশ পায়। বিষয়টি সম্পর্কে ইংরেজরাও পুরোপুরি অবহিত ছিল। তাদের ভাষায়, – "The Hindu Rajas and inhabitants were very much disaffected to the Moor government and secretly wished for a change and opportunity for throwing off their tyrrinical yoke."

বিদেশী তথা ইউরোপীয় শক্তি সম্পর্কে দেশীয় নবাব-বাদশা-সুলতানদের অজ্ঞতা বিদেশীদের ভবিষ্যৎ প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁদের সতর্ক হতে দেয়নি। ইউরোপ সম্পর্কিত জ্ঞান দানে সম্রাটকে ভুল শিক্ষা দিয়েছিলেন বলে স্বয়ং আওরঙ্গজেব তাঁর শিক্ষককে অভিযোগ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে আঠার শতকের চতুর্থ দশকের পূর্বে তাদের সম্পর্কে ভারতীয়দের তেমন আগ্রহ বা ঔৎসুক্যের কোন কারণই ঘটেনি। তদুপরি আচার-আচরণে ইংরেজেরা বিভিন্ন সময়ে নিজের মধ্যেই প্রাচ্য ভদ্রতা বিরোধী নানারূপ অশোভন অশালীনতা, তাদের প্রতি উপেক্ষা বা অবজ্ঞার ধারণাই দেশীয় শাসক-সামন্তদের মনে গড়ে ওঠেছিল। নবাব শায়েস্তা খান ইংরেজ কোম্পানীকে 'অবৈধ কর্মে লিপ্ত বিবাদমান নীচমনা মানুষের দল' বলে অভিহিত করেছিলেন। ১৭৩৩ সালে খান দুরানকে লিখিত পত্রে ইংরেজদের প্রতি নবাব সুজাউদ্দিন খানের ঘৃণামিশ্রিত বিরক্তি প্রকাশ পেয়েছে।

পক্ষান্তরে, ইংরেজরা তাদের অর্থলিপ্সা, সম্মান-প্রতিপত্তি ও রাজ্য লাভে সুপ্ত বাসনাকে রূপ দিতে সুযোগের প্রতীক্ষা করতে থাকে। উপমহাদেশের আর্থ-রাজনৈতিক

www.pathagar.com

পরিবেশ তাদের আরো প্রলুব্ধ করে তুলে এবং ব্যবসায়ীর মুখোশ উন্মোচন করে সাম্রাজ্যবাদী স্বরূপের আত্মপ্রকাশ ঘটায় বাংলাদেশের মাটিতে। পরিণামে নবজাগ্রত ধনতান্ত্রিক ইউরোপীয় শক্তি ও ক্ষয়িষ্ণু মুসলিম ভারতীয় সামন্ত শক্তির মধ্যে অনিবার্য হয়ে ওঠে সংঘাত। আর এ সংঘাত বাংলাদেশ তথা ভারত ইতিহাসের প্রায় দু'শ বছরের ঘটনাবলীর নিয়ামক।

নবাব আলীবর্দী খানের শাসনামলে (১৭৪০-৫৬) ঢাকার দেওয়ান রাজবল্লভকে হিসাবপত্র নিরীক্ষণের জন্য কাগজপত্রসহ মুর্শিদাবাদ তলব করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে তহবিল তসরুফের প্রামাণ্য অভিযোগ ছিল। কিন্তু হিসাব পরীক্ষার পূর্বেই তিনি কাশিমবাজার কুঠির প্রধান উইলিয়াম ওয়াট্‌সের নিকট তাঁর পুত্র ও পরিজনের আশ্রয় প্রার্থনা করেন। রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণ দাস বা কৃষ্ণবল্লভ ৫৩,০০০০০ টাকা মূল্যের নগদ অর্থ ও সোনা-রূপাসহ কলকাতায় আশ্রিত হন। এই কৃষ্ণবল্লভকে প্রত্যর্পণের জন্য নবাব দরবার হতে বার বার নির্দেশ ও তাগিদ দেয়া সত্ত্বেও কোম্পানীর গভর্নর রজার ড্রেক তা পালন করতে অস্বীকার করেন। দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে ১৭৫৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে নবাবের নিষেধ সত্ত্বেও ইংরেজরা তাদের ফোর্ট উইলিয়াম (কলকাতায়) দুর্গটিকে সামরিক সাজে সজ্জিত করে তুলতে শুরু করে। বৃদ্ধ নবাব আলীবর্দী এ দুটি ঘটনার প্রতিকার করে যেতে পারেননি।

নবাবী লাভ করেই সিরাজউদ্দৌলা কৃষ্ণবল্লভকে প্রত্যর্পণ করতে গভর্নর ড্রেককে এবং দুর্গ দেয়াল ভেঙ্গে পরিখা বন্ধ করে দিতে ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিলকে নির্দেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নারায়ণ সিংহ নামক একজন বিশ্বস্ত দূতকে ইংরেজদের মনোভাব যাচাই করার জন্য কলকাতা পাঠালেন। কিন্তু ইংরেজরা নারায়ণ সিংহকে অপমান করে কলকাতা হতে তাড়িয়ে দেয়। নবাব আবার অন্যতম ব্যাংক ব্যবসায়ী খাজা ওয়াজিদকে একই উদ্দেশ্যে কলকাতা পাঠান। পরপর চার বার তিনি কলকাতা যান, কিন্তু ইংরেজেরা তাঁর সঙ্গেও সংযত আচরণ বা আপোষমূলক মনোভাব প্রদর্শন-কোনটিই করেনি। উইলিয়াম ওয়াটসের ভাষায়, "Khawaja Wajid ----- went four times to Calcutta in order to persuade the gentlemen to make up matters with the nawab but was threatend to be ill used if he comes again on the same errond"...

এভাবে নবাবের আন্তরিক সদিচ্ছা ব্যর্থ হবার ফলে তিনি দুর্লভরাম ও হুকুম বেগকে কাশিমবাজার কুঠি অবরোধের নির্দেশ দিলেন। মির মোহাম্মদ রেজা খান হুগলীতে জাহাজ নির্গমনের পথ রোধ করলেন এবং নবাবের উপস্থিতিতে কাশিমবাজারের পতন ঘটল। কুঠি প্রধান ওয়াট্‌স্ এবং কলেটকে সঙ্গে নিয়ে নবাব কলকাতার দিকে অগ্রসর হলেন। কাশিম বাজার অবরোধ ও পতনের মাধ্যমে সমঝোতায় আসতে ইংরেজদের উপর চাপ সৃষ্টি করাই নবাবের উদ্দেশ্য ছিল। পরবর্তী ঘটনায় তার প্রমাণ মিলে। খাজা ওয়াজিদের মিশন ব্যর্থ হবার পর উমিচাঁদ ও শ্রীবাবু নামক জনৈক ব্যবসায়ী সমঝোতার প্রস্তাব দেন। জবাবে ড্রেক বলেন,—"Sooner he (Sirajuddaullah) comes (to calcutta) the better, and that he (Dhaka) Would make another nawab." মীমাংসায় আসার জন্য নবাবের নিকট একজন দূত পাঠাতে ড্রেককে অনুরোধ করে পত্র লেখেন উইলিয়াম ওয়াট্‌স্ ও কলেট। এ পত্র পাঠান হয়

www.pathagar.com

ওলন্দাজ এজেন্ট বিসডমের (Bisdom)-এর মাধ্যমে। ড্রেক তাও রক্ষা করেননি। অবশেষে ফরাসী দেশীয় ম্যাকুইস দ্য সেন্ট জ্যাকুইস-এর মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পাঠান হয় কলকাতায়। উত্তরে উদ্ধত রজার ড্রেক প্রস্তাবকারীকে পক্ষ পরিবর্তনের উপদেশ দেন।

সুতরাং অনিবার্য হয়ে এলো সংঘাত। ১৭৫৬ সালের ১৩ জুন নবাব ফোর্ট উইলিয়ামে পৌঁছেন এবং যথারীতি কলকাতা অবরুদ্ধ হয়। ১৯ জুন কলকাতা নাটকের উদ্ধত অহংকারী নায়ক রজার ড্রেক সঙ্গী মিনকিন, ম্যাকেট ও গ্রান্টসহ সগৌরবে পেছন দিক দিয়ে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করেন। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ শিবিরে পলায়ন প্রক্রিয়া মহামারীর মত দ্রুত সংক্রমিত হয়ে পড়ে। এক ঘন্টার মধ্যে ইংরেজদের সকল জাহাজ পলাতকদের নিয়ে ভাটি পথে পাড়ি জমায়। ঘটনাটি তাদেরই ভাষায় শোনা যেতে পারে, "This ill-judged circumstance occasioned all the uproar and misfortunes that followed ; for the moment it was observed, many of the shore (who perhaps never dreamt of leaving the factory till everybody did) immediately jumped into such boats as were at the factory and rowed to the ships."

ড্রেক ও অন্যান্যদের পলায়নের পর ফোর্ট উইলিয়ামে মাত্র আটজন যুদ্ধ পরিষদের সদস্য অবশিষ্ট রইল। তাদের মধ্যে হলওয়েল রজার ড্রেকের স্থলবর্তী গভর্নর নিয়োজিত হলেন। হলওয়েল পলায়নের কোন নৌকার অভাবেই কলকাতায় থেকে যেতে বাধ্য হন এবং তিনিই পরবর্তীকালে তথাকথিত কাল্পনিক অন্ধকূপ হত্যার গল্প কাহিনীর জন্ম দান করেন। হলওয়েল গভর্নর হয়ে এক দুপুর টিকে ছিলেন ; তার পর আত্মসমর্পণ ভিন্ন কিছুই আর তাঁর করবার রইল না। ২০ জুন বিকেল চারটায় কলকাতার পতন ঘটে।

১৭ জুলাই বন্দীদের নবাবের সামনে হাজির করা হয়। হলওয়েল তখন নিবেদন করেন,- "That not withstanding my losses at Alinagore (Calcutta), I was still possessed of enough to pay a considerable sum of money for my freedom."

উত্তরে নবাবের মন্তব্য ছিল যেমন সহৃদয় তেমনি মানবিক। তিনি বলেন-"It my be ; if he has anything left, let him keep it ; his sufferings have been great ; he shall have his liberty."

অন্যদিকে কাশিমবাজার ও কলকাতার পতন সংবাদ পরপর মাদ্রাজ পৌঁছে। ফলে প্রথমে মেজর কিলপেট্রিক-এর নেতৃত্বে দুটি জাহাজ এবং পরে রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে প্রচুর সৈন্য, গোলাবারুদ ও সাজ-সরঞ্জামসহ বারটি জাহাজ পাঠান হয় বাংলাদেশে। এই অভিযানের প্রধান দুটি উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয় ; ক. নবাবের বিরুদ্ধে একটি অভ্যুত্থান ঘটিয়ে কোম্পানীর ইচ্ছানুরূপ ক্ষমতা পরিবর্তন ; খ. কোম্পানীর প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসীদের চন্দননগর হতে উৎখাত। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিলকে লিখিত মাদ্রাজের সেন্ট জর্জ কাউন্সিলের লিখিত পত্রে (১৩ অক্টোবর ১৭৫৬) 'The sword should go hand in hand with the pen' উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে নবাবের বিরুদ্ধে যে কোন স্বার্থান্বেষী মহলের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করতে এবং ফরাসীদের চন্দননগর হতে বিতাড়নের নির্দেশও দেয়া হয়।

www.pathagar.com

২৫ ডিসেম্বর ফুলতা পৌঁছেই ক্লাইভ ও ওয়াট্‌সন 'কলমের সঙ্গে সঙ্গে তরবারির' মহড়া শুরু করেন। ৩০ ডিসেম্বর তাঁরা বজবজ দখল করেন এবং ২ জানুয়ারী (১৭৫৭) কলকাতা পুনরুদ্ধার করে ড্রেক ও তাঁর কাউন্সিল সদস্যদের ফোর্ট উইলিয়ামে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই বিজয়ের গৌরবের ইংরেজেরা ৩ জানুয়ারী নবাব ও তাঁর দেশবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসে। হুগলী শহরটি ব্যাপকভাবে লুণ্ঠিত হয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলে তারা আগুন ধরিয়ে দেয়। সেদিনই নবাব তাঁর এক ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে হুগলীর উত্তরে পৌঁছেন। ইংরেজেরা ফিরে যায় কলকাতা। ফরাসী ও ওলন্দাজেরা নবাব ও ইংরেজদের বিবাদে মধ্যস্থতার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু ইংরেজেরা তাদের কাউকে বিশ্বাস না করে এবার খাজা ওয়াজিদের মাধ্যমে তাদের দাবীর কথা জানিয়ে দেয় ২২ জানুয়ারী। বলা হয়, কাশিমবাজার ও কলকাতা দখলের ক্ষতিপূরণ, ১৭১৭ সালের ফরমানানুযায়ী সকল সুবিধা, কলকাতায় সামরিক দুর্গ নির্মাণের অনুমতি এবং কোম্পানীর নিজস্ব মুদ্রা তৈরীর অধিকার দিতে হবে।

এই সময়কার অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, ভিন্নতর একটি ঘটনার আশঙ্কা নবাবের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। সে তুলনায় ইংরেজদের বিরোধ তাঁর মনে তেমন গুরুত্বলাভ করেনি। মধ্য ভারতে তখন আফগান অধিপতি আহমদ শাহ্ আবদালী বিভিন্ন শহর, নগর দখল করে চলেছেন এবং তাঁর গতি ক্রমশঃ পূর্বমুখী হবার সম্ভাবনাই অধিকতর। এই আশঙ্কায় নবাবের অন্যতম বিশ্বস্ত সেনাপতি রামনারায়ণের অধীনে একটি শক্তিশালী বাহিনী ও পাটনা সীমান্তে নিয়োজিত ছিল। নবাব তবু দুশ্চিন্তামুক্ত হতে পারেননি ; তিনি স্বয়ং সসৈন্যে পাটনা অভিমুখে অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন। কাজেই ইংরেজদের সঙ্গে বিরোধ দ্রুত মিটিয়ে ফেলতে তাঁর আন্তরিকতার কোন অভাবই ছিল না। তবুও শর্ত সম্পর্কিত নানা বাদানুবাদে বেশ কিছু সময় অতিক্রান্ত হল ; অবশেষে ৯ ফেব্রুয়ারী এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হল উভয়পক্ষের মধ্যে। এ সন্ধির ফলে নবাব পাটনা সীমান্ত চিন্তায় নিমগ্ন হলেন, আর ইংরেজরা পরবর্তী সংঘর্ষের প্রস্তুতি গ্রহণের সময় পেল এবং এই সুযোগে চন্দননগরে ফরাসীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

এ ঘটনায় নবাব অত্যন্ত বিব্রত হলেন। কারণ একে তো তিনি আবদালীর চিন্তায় ব্যস্ত, তদুপরি তাঁর রাজ্যে বিদেশীদের হাঙ্গামা পছন্দ করতেন না তিনি। বাংলার নবাবদের সকলের আমলেই এই নিরপেক্ষ নীতি অনুসৃত হয়ে এসেছে। সে জন্য পূর্বাহ্নেই সিরাজউদ্দৌলা তাঁর অন্যতম সহকারী নন্দকুমারকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন– "to assist th French with all his forces in case the English should atack Chanclernogore,or if the French should attack the English, to assist them in the same manner, that there may be no quarrels or disputes in his country." কিন্তু দুর্ভাগ্য নবাবের, এই সময় থেকেই তাঁর কর্মচারীরা গোপনে বিশ্বাসঘাতকতা শুরু করে। মাত্র ১৫০০ পাউন্ড ঘুষের বিনিময়ে নন্দকুমার তাঁর মনিবের আদেশ পালন করেননি ; অথচ তাঁর বার্ষিক বেতন ছিল ৩০,০০০ পাউন্ড। তারপরও নবাব ইংরেজ ও ফরাসী উভয় পক্ষকে ডেকে বিবাদ মীমাংসার চেষ্টা করেন এবং একটি খসড়া চুক্তিতে উভয় পক্ষকেই সম্মত করান। কিন্তু ভিতরে ভিতরে ইংরেজরা সুযোগের প্রতীক্ষা করতে থাকে এবং অবশেষে ইউরোপে ইংগ-ফরাসী যুদ্ধের বরাত দিয়ে চুক্তির অবমাননা করে ১৪ মার্চ

www.pathagar.com

(১৭৫৭) চন্দননগর অবরোধ করে। নবাব দুর্লভরাম ও নন্দকুমারকে আবার ফরাসীদের সাহায্যে পাঠান। ইংরেজদের দেয়া ঘুষে এবারও তারা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। ২৩ মার্চ চন্দননগরের পতন ঘটে। ফরাসীরা বাংলাদেশে তাদের সবগুলো কুঠি ইংরেজদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। তাদের কিছু সৈন্য কাশিমবাজারে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করে, কিছু প্রাণ দেয়, কিছু বন্দী হয়। ইংরেজপক্ষে মৃত দেশীয় সিপাহীদের ইংরেজ সেবার নিদর্শনস্বরূপ জনপ্রতি দশ টাকা করে পুরস্কার দেয়া হয়।

চন্দননগরের পতনকাল হতে পলাশী যুদ্ধের মধ্যে সময়ের ব্যবধান মাত্র তিন মাস। এই তিন মাসে হতভাগ্য সিরাজউদ্দৌলার নিয়তি, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা তথা সারা ভারতের স্বাধীনতা হরণ ও দুই শতকের জন্য তিমিরায়নের পথ নির্ধারিত হয়ে যায়। ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিল মুর্শিদাবাদে অভ্যুত্থান ঘটাতে আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ২৩ এপ্রিল (১৭৫৭)। প্রথমে ইয়ার লতিফের নাম প্রস্তাব করা হয়, কিন্তু ইয়ার খান মিরজাফরের পক্ষে তাঁর দাবী ত্যাগ করেন। মিরজাফর ছিলেন জগৎশেঠ ও অন্যান্য হিন্দু প্রধানদের মনোনীত ব্যক্তি। নবাব দরবারের এই ষড়যন্ত্রের প্রধান হোতা প্রখ্যাত কুসীদজীবী জগৎশেঠ ভ্রাতৃবৃন্দ এবং তাঁদের সহযোগী ঢাকার দেওয়ান রাজবল্লভ, সেনাপতি রায়দুর্লভ, নন্দকুমার, শিখ ব্যবসায়ী উমিচাঁদ প্রমুখ। মীরজাফর এই ঘটনার অপরিণামদর্শী উচ্চাভিলাষী নির্বোধ ক্রীড়নক। অবশ্য নবাবের বিরুদ্ধে তাঁকেই সামনে রাখা হয়েছে এবং দেখান হয়েছে যেন তাঁর নির্দেশেই ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। সঙ্গে রয়েছেন মির্জা আমীর বেগ ও খাদিম হোসেন খান। সিদ্ধান্ত হল, সিরাজউদ্দৌলাকে সরিয়ে মীরজাফরকে নবাব করা হবে; মীরজাফর ইংরেজদের সঙ্গে সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হবেন, কলকাতার ক্ষতিপূরণস্বরূপ ইংরেজ কোম্পানীকে ১০০ লক্ষ, ইউরোপীয়দের ৫০ লক্ষ, হিন্দুদের ২০ লক্ষ এবং আর্মানীদের ৭ লক্ষ টাকা দেবেন। কলকাতার আধিপত্য ইংরেজদের থাকবে, নবাব হুগলীর দক্ষিণে কোন ঘাঁটি রাখতে পারবেন না। এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ৪ জুন, ১৭৫৭ সালে। নবাব দরবারে ইংরেজ প্রতিনিধি উইলিয়াম ওয়াট্স্ ও লিউক স্ক্রেফ্টনের মাধ্যমে এ ষড়যন্ত্রের যোগাযোগ এবং চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় রাজধানী মুর্শিদাবাদেরই এক গোপন কক্ষে।

ষড়যন্ত্রের কার্যকারিতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েই ইংরেজেরা বিভিন্ন অজুহাতে নানা প্রকার দাবী উত্থাপন করে নবাবকে বিরক্ত করে তুলতে শুরু করে। নবাবকে উত্তেজিত করে হাঙ্গামা সৃষ্টিই এর মূল উদ্দেশ্য। ফরাসীদের সমুদয় সম্পত্তি, ফরাসী প্রতিনিধি জীন ল'-এর সমর্পণ এবং ৯ ফেব্রুয়ারী চুক্তির অজুহাতে বিভিন্ন ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি ন্যায় অন্যায় দাবী একটার পর আর একটা উত্থাপন করে নবাবের মানসিক স্থৈর্য বিঘ্নিত করার চেষ্টা চালায় ইংরেজরা। নবাব তাদের সকল ন্যায্য দাবীই পূরণ করে দিয়েছিলেন ; তবু যখন ইংরেজরা চুক্তির শর্ত পালনে নবাবের অবহেলার কথা প্রকাশ করে, তখন তাঁর কণ্ঠে বিরক্তি মিশ্রিত মানসিক ক্ষোভের সুরই ধ্বনিত হয়ে ওঠে। তিনি বলেন, "What shall I do to satisfy the English? Let me know their demand and I shall comply with it ; for I want to march to the northward.

আবদালীর ভয়ে উৎকণ্ঠিত নবাবের ব্যগ্রতার আড়ালে তাঁরই রাজধানীর নীরব গোপন মঞ্চে যে কালভূজঙ্গটি দ্রুত বেড়ে ওঠে ইতোমধ্যেই পেঁচক শকুনীদের সঙ্গে

www.pathagar.com

অশুভ আঁতাত জমিয়ে মরণ-ছোবল উঁচিয়ে ধরেছে তা এই নিঃসঙ্গ তরুণকে কে বলে দেবে!

মুর্শিদাবাদের অদূরে পলাশী প্রান্তরে ক্লাইভ তাঁর সৈন্য সমাবেশ শুরু করেন। মীরজাফর ও দুর্লভ রামের নেতৃত্বে নবাব ১৫,০০০ হাজারের এক বাহিনী প্রেরণ করেন। এদিকে মুর্শিদাবাদে ইংরেজ প্রতিনিধি ওয়াট্স তখনই যুদ্ধ না বাঁধিয়ে সৈন্য প্রত্যাহার করে কলকাতায় সুযোগের প্রতীক্ষা করতে ক্লাইভকে উপদেশ দেন। ক্লাইভ তা মেনে নেন এবং নবাবকেও তাঁর সৈন্য প্রত্যাহারের অনুরোধ জানান। ইংরেজদের আচরণ নবাবের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করে; তিনি তাঁর বাহিনী অপসারণের নির্দেশ দিলেন না। ক্লাইভ তাঁদের আচরণের সততার প্রতি নবাবের সন্দেহ দূর করার জন্য এক কূটচাল চালেন। মারাঠাদের লিখা এক চিঠি দিয়ে তিনি স্ক্রেফ্টনকে মুর্শিদাবাদ পাঠান। এ চিঠিতে ইংরেজ ও মারাঠাদের মধ্যে বাংলাদেশকে ভাগ করে নেবার প্রস্তাব ছিল। এবার নবাব ইংরেজদের বিশ্বাস করলেন এবং তার বাহিনীকে মুর্শিদাবাদ ফিরে আসার নির্দেশ দিলেন।

২৩ মে মীরজাফরকে পদচ্যুত করে খাজা আব্দুল হাদীকে বকশী পদে নিয়োগ করা হল। হাদি খান ও মির মদন মীরজাফরকে বন্দী করার পরামর্শ দিলেন। কারণ "Mir Mohammad Gafar Khan is treacherously bent on runing this royal house." তাঁদের এই আশঙ্কা ও সন্দেহ নিয়তির নিষ্ঠুর বিধানের মতই সত্যে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু মীরজাফর পবিত্র কোরান শরীফ হাতে নিয়ে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করায় নবাব তাঁর তরুণ সুলভ স্বাভাবিক ঔদার্যে মীরজাফরকে ক্ষমা করেন। সমকালীন ভারতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বাংলাদেশে বিদেশীদের আচরণ, নিজ দরবারের মধ্যে অবিশ্বাস ও চক্রান্ত–এই অনভিজ্ঞ তরুণ নবাবকে যেন তাঁর নিয়তি নির্ধারিত বিমূঢ়তায় আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। কাকে বিশ্বাস করবেন, কাকে না– তাও বুঝে উঠতে পারেননি তিনি ; সম্ভবত সে কারণেই এ সময়ে কোন দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি।

এদিকে সাময়িক পদচ্যুতিতে অপমানিত হয়ে মীরজাফর প্রস্তাবিত অভ্যুত্থান ত্বরান্বিত করার জন্য ইংরেজ কাউন্সিলর ও সৈন্য দলকে আরো ৫০ লক্ষ টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। সেই প্রতীক্ষায়ই ছিলেন ক্লাইভ। সকল দিক থেকে সময় সমাগত বিবেচনা করে ১৩ জুন তিনি চরমপত্র দিলেন নবাবকে। তাতে কোম্পানীর ব্যবসায়ে বাধা দানের জন্য অহেতুক অভিযোগ করা হয় নবাবকে। এতদিনে চৈতন্যোদয় হল নবাবে; আর এই অন্তিম চেতনা অপরিমেয় সমৃদ্ধ একটি রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী তরুণ নায়ককে এক করুণ সত্যের সম্মুখে দাঁড় করিয়েছিল। তিনি শেষ চিঠিতে ক্লাইভকে লিখলেন,– Something of this kind (ultimatun) - hindered me from re-calling the army from plassey for I knew some trick was intended. I thank god, howevrer, the treaty has not bean broken on my part"

১৭৫৭ সালের ২৩ জুন। মুর্শিদাবাদের অদূরে পলাশীর আম্রকাননে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার ভাগ্য নির্ধারণের দিন। নিয়তির নির্মম আহ্বানে নবাব

www.pathagar.com

সিরাজউদ্দৌলা তাঁর সম্মিলিত বাহিনীসহ ক্লাইভ ওয়াট্‌সনের মুখোমুখি। কিন্তু নিজের দেশকে পরদেশীর নিকট বিক্রয় করে দিতে যাদের কোন দ্বিধা নেই, এমন কি দ্বিধা নেই নিজের আত্মাকেও নিঃসঙ্কোচে পরের হাতে তুলে দিতে, সেই হীন নীচমনা বিশ্বাসঘাতকেদের চক্রান্তে স্বাধীনতার উজ্জ্বল সূর্য হলো বিদেশী কামানের ধোয়ায় আচ্ছন্ন। হতভাগ্য নবাব ব্যর্থ হয়ে বিহার সীমান্তে রক্ষিত তাঁর বিশ্বস্ত বাহিনীর সাহায্যে শেষ চেষ্টা চালাতে উত্তর দিকে ছুটে চললেন দ্রুত। কিন্তু সে আশাও ব্যর্থ। পথে ধরা পড়লেন তিনি। বন্দী হয়ে এবার ফিরে এলেন সেই সাধের মুর্শিদাবাদে। স্বাধীনতাকামী আত্মার কি নিদারুণ পরিণাম! তাঁরই পিতামাতার আদরে লালিত মোহাম্মদী বেগের হাতে নির্বিচারে নির্মমভাবে নিহত হলেন তিনি।

সিরাজউদ্দৌলাকে তবু দোষারূপ করেন কেউ কেউ। নিজেদের সীমাহীন লালসা, শঠতা ও চক্রান্তজালকে ঢেকে রাখতে তাঁর তরুণসুলভ ব্যক্তিগত সরলতা ও ঔদার্যকে দায়ী করেন। পাণ্ডিত্যের জালবয়নে তাঁর মহত্ত্বকেও আবৃত করতে চান কেউ কেউ। কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিরতা, শঠতা-ছলনা, হৃদয়হীন নির্মমতা, চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র আর জঘন্য লোভ-লালসার মাঝখানে মাত্র চব্বিশ বছরের জীবনে ও এক বছরের নবাবীকালে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিরেন নবাব সিরাজউদ্দৌলা, শেষ বিদায় বেলায় জগতকে তার চেয়ে কি অনেক বেশী দিয়ে যাননি তিনি? সাগর পাড়ের তাঁর প্রতিপক্ষীয়দের দোসর কোন সংযতবান বিদ্বানের ভাষায় তাঁর মূল্যায়ন শোনা যেতে পারে, Sirajuddaullah was more fortunate, and certainly les to be despise (he) had neither betrayed his master nor sold his country. Nay more, no unbiased Englishman, sitting in the judgement over the events that passed in the interval between the 9th February and 23d. June, can deny that the name of Sirajuddaullah stands higher in the scale of honour than does the name of clive. He was the only one of the principal actors in that tragic dramra who did not attempt to deceive."

ক্লাইভের কামান হতে নির্গত ২৩ শে জুনের ধোঁয়া দেখতে দেখতে পলাশীর আমবাগান হতে ছড়িয়ে পড়ল বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায়, ক্রমে এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ হয়ে দিল্লীর মাধ্যমে সারা ভারতে। সে উগ্র সাজানো ধোঁয়ার সঙ্গে ইংরেজী চিমনীর ধোঁয়া মিশে গিয়ে যে দুঃসহ কুহেলিকার জন্ম দিল, তার আচ্ছন্নতায় দৃষ্টি ও শক্তি হারালো কত মিরকাশিম, তাজাবুকের উষ্ণ রক্ত ঝরালো কত তিতুমীর ; মানমর্যাদা, পেশা-শিল্প, চাষের জমি ও কর্ম হারিয়ে কত সংখ্যাহীন জনতা হল নিশ্চিহ্ন, তার প্রকৃত খতিয়ান কেউ রাখেনি। বাঙ্গালী মুসলমানদের জন্য সে কাহিনী যেমন বেদনা করুণ, তেমনি চৈতন্য লাভেরও সোপান।

www.pathagar.com

পলাশীর তত্ত্ব কথা

আখতার ফারুক

স্বাধীন মুসলিম বংগের বাংগালীর গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলি সম্পর্কে স্বয়ং বংকিম বাবু বলেন ঃ

"পরাধীন রাজ্যের যে দুর্দশা ঘটে, স্বাধীন পাঠানদিগের রাজ্য বাংগালায় সে দুর্দশা ঘটে নাই। রাজা ভিন্ন জাতীয় হইলেই রাজ্যকে পরাধীন বলা যাইতে পারে না। পরাধীনতার প্রধান ফল ইতিহাসে এই শুনা যায় যে, পরাধীন জাতির মানসিক স্ফুর্তি নিভিয়া যায়। পাঠান শাসনকাল বাংগালীর দীপ্তি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছিল। এই দুই শতাব্দীতে বাংগালীর মানসিক জ্যোতিতে বাংগালার যেরূপ মুখোজ্জ্বল হইয়াছিল, সেরূপ তৎপূর্বে বা ত ৎপরে আর কখনো হয় নাই।"

মুসলিম বিদ্বেষী বংকিম বাবুর এ মন্তব্যের পরে আর কিছু বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। পরবর্তীকালে তো বাংগালীরাই মুসলিম হয়ে গেল। তাই একদিন বৌদ্ধ আধিপত্য বলতে যেরূপ বাংগালীর আধিপত্য ছিল, স্বাধীন মুসলিম বংগের আধিপত্য তেমনি বাংগালীর আধিপত্যই ছিল। তাই শুধু গৌড় কেন, বিহার উড়িষ্যার সাথে থাকতেও তাদের বিন্দুমাত্র আপত্তি ছিল না। আধিপত্য বিস্তার করে থাকতে কে-ই বা অপত্তি করে?

কিন্তু আর্য ষড়যন্ত্রে যেদিন নবাগত আর্যের হাতে বাংগালীর স্বাধীনতা সূর্য পলাশীর প্রান্তরে অস্তমিত হল আর নবীন আর্যের মাধ্যমে প্রাচীন আর্যের আধিপত্য মাথাচাড়া দিয়ে উঠল, সেদিন থেকেই বাংগালী শংকর বংগ ছেড়ে আসার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠল। বস্তুত, লক্ষণাবতীর লক্ষণ সেন সতেরজন মুসলিমের হাতে বিতাড়িত হলে আর্যরা যতই ব্যথিত হোক না কেন, অনার্যরা খুশীই হয়েছিল। ঠিক তেমনি পলাশীর প্রান্তরে ক্লাইভের হাতে সিরাজের পরাজয়ে অনার্য বাংগালী যতই ব্যথিত হোক না কেন, আর্যগগোষ্ঠী যে আনন্দে নাচছিল,

www.pathagar.com

বংকিমের আনন্দমঠ থেকে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলীর সর্বত্রই তার প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে। বিভাগোত্তর কালের 'পলাশীর যুদ্ধ' রচয়িতা তপন মোহন চট্টোপাধ্যায় নতুন দৃষ্টিতে ইতিহাসে লিখতে গিয়ে আমাদের অকপটে জানালেন ঃ

"ক্লাইভ এটাকে পাকা করে তুললেও ষড়যন্ত্রটা আসলে হিন্দুদেরই ষড়যন্ত্র। পশ্চিম বঙ্গ তখন বীরভূম ছাড়া আর সব বড় বড় পরগনায় হিন্দু জমিদার, সিরাজউদ্দৌলার হাতে তাদের নাকালের একশেষ। প্রকাশ্যে না হলেও ভিতরে ভিতরে প্রায় সব জমিদারই এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন।"

কিছুটা এগিয়ে তিনি বলেন ঃ

'প্রধানত হিন্দুদের চক্রান্ত হলেও বড় গোছের মুসলমান তো অন্তত একজন চাই। নইলে সিরাজউদ্দৌলার জায়গায় বাংলার নবাব হবেন কে? ক্লাইভ তো নিজে হতেই পারেন না। হিন্দু গভর্নরও সকলে পছন্দ করবেন কি-না সন্দেহ। দিল্লীর বাদশা কোন হিন্দুকে বাংলার গভর্নরী পরোয়ানা দেবেন বলে তো কারো বিশ্বাস হয় না। সুতরাং মুসলমান একজনকে নবাবি মসনদ নেবার জন্যে যোগাড় করতেই হবে।'

এই হল পলাশীযুদ্ধের তত্ত্বকথা। তাই পলাশীর প্রান্তর থেকে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী দু'টো চিত্র আমরা পাশাপাশি দেখতে পাই। একদিকে দেখছি, উমিচাঁদ রায়দুর্লভ জঘন্য ষড়যন্ত্র, অপরদিকে অনার্য মীরমদন-মোহনলালের অপূর্ব আত্মত্যাগ। একদিকে আর্য লেখক বংকিম বাবু তাঁর আনন্দমঠে ইংরেজকে ভগবানের আশীর্বাদ বলে বরণ করছেন, অন্যদিকে অনার্য বাংগালী সেনারা ইংরেজের দাসত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি লাভের জন্যে বারাসত সেনানিবাসে বিদ্রোহ ঘোষণা করছে। একদিকে ইন্দো-আর্য কবি রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় আর্যের পবিত্র পরশ নিয়ে মার অভিষেক পূর্ণ করার জন্যে-

'এস এস আজ তুমি ইংরাজ এস, এস খৃষ্টান'

-বলে আকুল আহ্বান জানিয়ে ইংরেজের আশীর্বাদে 'নাইট' উপাধি পাচ্ছেন, নোবেল প্রাইজ হাসিল করছেন। অপরদিকে অনার্য কবি নজরুল ব্যাকুল চিত্রে-

'প্রার্থনা কর যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটির মুখের গ্রাস
আমার রক্ত রেখায় তাদের লেখা হয় যেন সর্বনাশ।'

-বলে কেঁদে বুক ভাসিয়ে ইংরেজের অভিশাপে কঠিন কাবার লৌহশৃংখল স্বেচ্ছায় বরণ করেছেন। শুধু কি তাই? অনার্য কবি নজরুল যখন পলাশীর মর্মান্তিক বিপর্যয়ের ভাবনায় অধীর হয়ে গেয়ে উঠলেন ঃ

কাণ্ডারী! তব সম্মুখে ওই পলাশীর প্রান্তর
বাংগালীর খুনে লাল হল যেথা ক্লাইভের খঞ্জর
ওই গংগায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর
উদিবে সে রবি আমাদের খুনে রাংগিয়া পুনর্বার।

তখন আর্য কবি রবীন্দ্রনাথ অনার্য কবির এ মর্মভেদী কবিতার অতলস্পর্শী আবেদন হাল্কা করে বাংগালীর মন অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্যে ফার্সী 'খুন' শব্দ ব্যবহার করে বাংলা ভাষার সতিত্ব বিনষ্ট অভিযোগ তুলে তুমূল লঙ্কাকাণ্ড সৃষ্ট করলেন। বংগদেশ

www.pathagar.com

থেকে ইংরেজ তাড়ানোর চেয়ে যেন বাংলা ভাষা থেকে ফার্সী তাড়ানোটাই আর্যদের পরম ব্রত ছিল।

সন্দেহ নেই, এসব বড় বেদনাদায়ক প্রসংগ। এর দাস্তান বড় বিরাট। এক কথায়, এ দু'মুখী স্রোতের স্বাভাবিক পরিণতি হল দেশ বিভাগ।

বাংগালী যে কোনদিনই আর্য আধিপত্য সহ্য করতে পারে না, তার আধুনিক প্রমাণ পাই আমরা লর্ড কার্জনের সময়ে বংগ-ভংগের নামে আদি বংগের মুক্তি লাভের প্রয়াসে। অবশ্য আর্যরা বাংগালীর ওপরে কালাকালের গায়ের ঝাল মিটাবার সুবর্ণ সুযোগটি হেলায় হারাবার পাত্র ছিল না। যে সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা বংগ উপনিবেশে যুগ্ম শোষণের বদৌলতে রাঢ় সূশের আর্যরা লালে লাল হল, সে মধুর হাড়িটি কি করে সহসা হাতছাড়া হতে দেবে? মহাজনী, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি এক কথায় বংগের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইংরেজ আর্যের আশীর্বাদে জেঁকে বসে বাংগালকে হাইকোর্ট দেখানোর যে মহান (!) ব্রত তারা চালাচ্ছিল, কোন দুঃখে তারা তা থেকে বঞ্চিত হতে চাইবে?

তাই আর্য কবি সেদিন শংকর বঙ্গের আর্য-দুর্গ কোলকাতায় বসে বাংগালীর দরদে কুম্ভীরাশ্রুর ঝর্ণা ছুটিয়ে গগন-পবন বিদারিত করে হায় হোসেনের মাতম তুললেন ঃ

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাঙলার বায়ু বাংলার ফল
পূণ্য হউক, পপণ্য হউক, পূণ্য হউক হে ভগবান!

আর তাঁর সাথে সাথে গোটা আর্য সমাজ কোরাস মিলিয়ে সুর ধরল ঃ

বাংগালীর দেহ বাংগালীর প্রাণ
এক হউক, এক হউক, এক হউক যেহ ভগবান।

একেই বলে মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ! আশ্চর্য যে, তখনও যারা আমাদের অযোগ্য ভাবত, যারা আমাদের গরু-ছাগলের সাথে বেঁধে দহলিজে চীৎ করে রাখাটা পরম কর্তব্য বলে ভাবত, যারা আমাদের শেষ সম্বল দু'বিঘা জমিও কেড়ে নিয়ে সখের বাগান তৈরী করত, যাদের বিশ্বকবি তখনও বাংগালকে মানুষ বলে স্বীকার করতে অপারগ হয়ে ফরিয়াদ তুললেন ঃ

'সাত কোটি সন্তানের হে মুগ্ধ জননী
রেখেছ বাংগালী করে মানুষ করনি।'

যেই মাত্র আমরা সেই অমানুষ বাংগাল স্বতন্ত্র ও মুক্ত হতে চললাম, অমনি তারা রাতারাতি এরূপ বাংগাল বনে গেল যে, বেচারা কার্জন দিশেই পেল না, সত্যিকারের বাংগালী কি আমরা, না তারা? ফলে আমাদের মূল বংগের মুক্তির গোরস্তানে সংকর বংগের ব্যাঙের ছাতা নতুন করে গড়িয়ে উঠল। মুক্তি-পাগল বাংগালীর রাজধানী ঢাকা আর্য চক্রান্তের শিকার শোকবিহ্বল অনার্যের বেদনায় ঢাকা পড়ল। আর্য-দুর্গ কোলকাতা খুশীতে আবার ডগমগিয়ে উঠল।

এ তো গেল তাদের রূপ।

তারপর তাদের স্বরূপ ধরা পড়ল দেশ ত্যাগের নামে আমাদের শেষ ও চরম মুক্তি

www.pathagar.com

ঘোষণায়। উনিশ'শ ছেচল্লিশের গণভোটে খন আমরা অনার্য হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ বাংগালী সম্মিলিতভাবে আর্য নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেসের বিরুদ্ধে রায় দিলাম, দাবী জানালাম গোটা বাংলাকে আবার অনার্য কর্তৃত্বে ছেড়ে দিতে, অমনি ভণ্ড বাংগালীর মুখোশ খসে পড়ল। বংগ জননীর অখণ্ডত্ব রক্ষার ভীষণ পণ তাদের হাওয়ার উবে গেল। ঠিক সমান তালেই জিগীর তুলল তারা বাংলা থেকে কেটে পড়ার জন্যে। লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে রাতারাতি একেবারে বিপরীত কোরাস গেয়ে উঠল তারা ঃ

বাংগালীর দেহ বাংগালীর প্রাণ
ভাগ হউক, ভাগ হউক, ভাগ হউক হে ভগবান!

শুধু তা-ই নয়। আমাদেরি নিঃশেষিত রক্ত-মাংসে গড়া বিপুল ঐশ্বর্যশালী কোলকাতাসহ দু'তিনটি জিলাও ইউরোপীয় আর্যের আশীর্বাদে তারা কেটে নিয়ে গেল। নতুন জগৎশেঠ নন্দরাজী চক্রান্তে আমাদের মূল বংগটিও অখণ্ড রাখা গেল না। সে জন্যে আমাদের নেতৃবৃন্দের প্রাণান্ত প্রয়াস আর্য চক্রান্তে ব্যর্থ হল।

আরব প্রবাদে একেই বলে, 'কুল্লু শায়ইন য়্যারজেউ ইলা আসলিহী'-সব কিছুই অবশেষে মূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। অতীতের বংশ ও বাংগালী অবশেষে তাদের মূল রূপ ফিরে পেল। তেমনি ফিরে পেল সুহ্মের বাসিন্দারা তাদের সাবেক অবস্থা শংকর তথা মেকী বংগের এটাই ছিল স্বাভাবিক পরিণতি।

www.pathagar.com

পলাশীর স্মৃতি

কমোডোর এম আতাউর রহমান

৭ই জুন ১৯৯৭ একটা অনাড়ম্বর মধ্যাহ্ন ভোজে চাইনিজ রেস্তোঁরার আধো আলো আধো ছায়াতে বসে ২৪০ বছর পূর্বের পলাশীর আম্র বাগানে বাংগালি জাতির আত্মমর্যাদা কিভাবে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ইংরেজের ক্রীড়নক মীরজাফর কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়েছিল সে কাহিনীই শুনছিলাম। চাইনিজ রেস্তোরাঁর নিভু নিভু হেঁয়ালি আলোতে বক্তার বলিষ্ঠ ও জোরালো কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিল। একজন উদ্যোক্তা আবেগ মিশ্রিত কণ্ঠে উপস্থিত সকলকেই আহ্বান জানালেন যে, জেহাদী মনোবৃত্তি নিয়ে আমরা যেন শেকড়ের সন্ধানে অগ্রসর হই এবং উপলব্ধি করতে চেষ্টা করি যে ২৪০ বছর পূর্বের ২৩শে জুন ১৭৫৭ সালে আমরা সম্মুখ সমরে আমাদের স্বাধীনতা হারাইনি। সেদিন বিদেশী শক্তির সাহায্য নিয়ে আমাদেরই জ্ঞাতি মীরজাফর পলাশীর রণাঙ্গনে চক্রান্ত ও প্রতারণা করে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করেছিল এবং তারপর নৃশংস ভাবে হত্যা করেছিল। কোন স্বাধীনচেতা বাঙ্গালী মীরজাফর ও জগৎশেঠদের ক্ষমা করবে না। ভুলতে পারবে না তাদের কাপুরুষোচিত কীর্তিকলাপ। নবাব সিরাজদ্দৌলাই শুধু সেদিন পরাজিত হননি, শৃঙ্খলিত হয়েছিল বাংলার আপামর জনতা। ধুলিসাৎ হয়েছিল বাংলার গর্ব। আমাদের সেই খুঁয়ে যাওয়া এবং ছিনিয়ে নেয়া শিরস্ত্রাণ আবার আমাদের পুনরুদ্ধার করতে হবে এবং আমার গর্ব ভরে শিরে ধারণ করতে হবে।

সকলের চোখের দ্যুতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ভোজ কক্ষ। প্রত্যেকের কণ্ঠেই জেগে উঠল বজ্রনিনাদ-অবশ্যই-অবশ্যই। আমরা খুঁজে বের করব আমাদের ঐতিহ্য, ফুটিয়ে তুলব আমাদের গৌরবময় ইতিহাস-যেখান থেকে শুরু হয়েছিল আমাদের ঈমান-আকিদার যাত্রা, প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল ইসলামের জয়গান এবং স্বাধীনতার দীপ্ত হুঙ্কার। আমরা

www.pathagar.com

কি ভুলতে পারি, যে মীরজাফর যুগে যুগে আমাদের লাঞ্ছিত করেছে, আমাদের স্বাধীন সত্তাকে মুছে দিতে চেষ্টা করেছে এবং আমাদের অন্ধকার কালো গহ্বরে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। অসীম কালের সাগর থেকে তুলে আনতে হবে হারিয়ে যাওয়া মুকুটের মুক্তোগুলো, সংগ্রহ করতে হবে আমাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের খন্ড বিখন্ড টুকরোগুলো এবং নিষ্ঠা ও সাহসিকতার সাথে জুড়তে হবে সেগুলোকে। তবেই না আমরা চিনতে পারব-আমরা কারা-কোথা থেকে এলাম এবং ঠিকানাই বা আমাদের কি? তখনই আমরা দৃপ্ত পদক্ষেপে, স্ফীত বক্ষে এবং উন্নত শিরে চলতে পারব। অহঙ্কারের মদমত্ততায় নয় বরং দায়িত্বের বোঝা নিয়ে, কল্যাণমুখী সমাজ গঠনের লক্ষ্যে হাতে হাত মিলিয়ে এগিয়ে যেতে পারব।

তন্ময় হয়ে শুনেছি জাতীয় প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসানের উদাত্ত কণ্ঠের আহ্বান, শুনেছি কবি আল মাহমুদের আবেদন, আখতারুল আলমের এগিয়ে যাবার তাগিদ, প্রফেসর এমাজউদ্দিনের দিক নির্দেশনা, ড. আশরাফ সিদ্দিকুর উৎসাহ ব্যাঞ্জক বক্তব্য। সকলেরই একটাই উদ্দেশ্য-বাংলার মাটিতে যদি নবাব সিরাজদ্দৌলার হৃতগৌরব পুররুদ্ধার করা যায় এবং তাঁকে ন্যায্য আসনে বসানো যায় তবেই ঘুঁচবে বাংগালি জাতির লজ্জা এবং পুনরুদ্ধার হবে বাংগালিদের গৌরব।

২৪০ বছর পর অবশ্যই পলাশী দিবস পালিত হবে। এক মহড়া ও মিছিল বেরুবে। বিভিন্নজন ও বিভিন্ন মহল এই দিনটির সাফল্য কামনা করছে। আমিও বাদ যাইনি। আমার মনে হয় দেশব্যাপী গণজাগরণ আনতে হলে প্রয়োজন হবে নতুন পন্থা ও কার্যক্রম। বন্ধুবর জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরীর সাথে আলাপ করে বুঝলাম যে, তিনিও একই সুরে ভাজছেন তাঁর খোল তাল।

আলোর প্রক্ষেপণ এবং শব্দ তরঙ্গের বিন্যাসের মাধ্যমে মানুষের মনে গভীর রেখাপাত করা যায় এবং এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে কাজ বিশ্বের বহু দেশে Sight and sound Show "পরিচালিত হচ্ছে। আলোর উজ্জ্বলতা এবং শব্দ লহরী তারতম্য, ভাষা ও গান মানুষের মনে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে। আনন্দে আত্মহারা করে দিতে পারে, ব্যথায় জর্জরিত করে ফেলতে পারে, গর্বে বুক ফুলিয়ে দিতে পারে, ঘৃণায় মনে চরম বিতৃষ্ণার সৃষ্টি করতে পারে এবং লজ্জায় লুকিয়ে যাবার মত মনের অবস্থা করতে পারে। তাই "আলো ও শব্দ প্রদর্শনী" এর মাধ্যমে যদি ইতিহাসের কোন অংশকে ফুটিয়ে তোলার অভিপ্রায় নিয়ে গুণী, জ্ঞানী, লেখক, নাট্যকার ও শিল্পবৃন্দ সমন্বিত প্রচেষ্টা চালান তাহলে এমন প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে পারবেন যাতে একই সন্ধ্যায় এক ঘন্টার একটি অনুষ্ঠানে লক্ষ লোকের মানসপটে বাংলার ইতিহাস তুলে ধরে দর্শকদের হাসিয়ে কাঁদিয়ে একাকার করে তুলতে পারবেন। এই অতি শক্তিশালী মিডিয়ার ব্যবহার আমাদের দেশেও সম্ভব। তবে তার জন্যে প্রয়োজন হবে একটা বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা, অর্থায়ন ব্যবস্থা এবং বাস্তবায়ন প্রোগ্রাম। এ ধরনের প্রদর্শনীর মাধ্যমে দর্শকের সামনে বিভিন্ন সন্ধ্যায় আমাদের জাতীয় ইতিহাসের বিভিন্ন খন্ডচিত্র প্রকাশ করা সম্ভব যা শুধু আমাদের আনন্দ দেবে না। আমাদের করে তুলবে জাগ্রত নাগরিক। আবাল বৃদ্ধ বনিতা আমরা সকলেই অতি সহজেই আমাদের জাতিসত্তার সন্ধান পাব।

www.pathagar.com

পলাশী নাটকের প্রস্তুতিপর্ব

ফারুক মাহমুদ

৭১১ সালে সিন্ধুর উপকূলে মুহম্মদ বিন কাসিম বিজয় পতাকা উড়াবার পর উপমহাদেশে মুসলমানদের প্রথম পরাজয় ঘটে পলাশীর প্রান্তরে। আপাতঃদৃষ্টিতে এটা মুসলমানদের ওপর ইংরেজ বণিকদের বিজয় হলেও মূলতঃ এটা ছিলো মুসলমানদের ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত সর্বভারতীয় বর্ণ হিন্দু রাজা-মহারাজাদের দু'শত' বছরব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াসের পরিণতি। ১১৯৭ সাল থেকে ১৫২৬ সাল পর্যন্ত সোয়া তিনশ' বছরব্যাপী শাসনের শেষ পর্যায়ে ভারতের তুর্ক আফগান শাহ সুলতানেরা ভোগ-বিলাসিতায় মগ্ন ও ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। তখনই মধ্য ও উত্তর ভারতের হিন্দু রাজা-মহারাজারা তাদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হতে শুরু করে। এ সময় ১৫২৬ সালে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবর দিল্লী দখল করেন। এর এক বছর পরই ১৫২৭ সালে ১৬ মার্চ রাজপুতনা, মালব ও মধ্য ভারতের ১২০ জন রাজা-মহারাজা বাবরকে ভারত ছাড়া করার উদ্দেশ্যে সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ৮০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য ও ৪ শ' রণহস্তী নিয়ে তারা আগ্রার কাছে খানুয়া প্রান্তরে বাবরের মোকাবিলা করেন এবং ১০ হাজার মুসলমান সৈন্যের হাতে নিদারুণভাবে নাস্তানাবুদ হন। An advanced History of India R.C. Majumdar, H. C. Ray Choudhuri & Kalikinkar Datta. P-4211 তখনই তারা বুঝে নেন, সম্মুখ সমরে মুসলমানদের সাথে পেরে ওঠা যাবে না। তাদেরকে ঘায়েল করতে হবে পেছন দরজা দিয়ে–অন্দর মহল হয়ে। এরপর শের খাঁ সম্রাট হন। হুমায়ুন ইরানে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং শের খাঁর মৃত্যুর পর ১৫৫৬ সালে পুনরায় দিল্লী দখল করেন। সম্রাট বাবর ও তাঁর আমির-ওমরাহদের কোন লাম্পট্যলীলার হেরেম ছিলো না। হুমায়ুন ইরান থেকে হেরেম জীবনে অভ্যস্থ হয়ে আসেন। রাজপুত রাজা-মহারাজারা হেরেমের উপাচার সুরা ও সুন্দরী সরবরাহের মাধ্যমে তার সাথে সখ্যতা গড়ে তোলেন। অল্প

www.pathagar.com

কিছুদিন পর হুমায়ুনের মৃত্যু হলে ১৩ বছরের কিশোর আকবর সিংহাসনে আরোহণ করেন। নাবালক অশিক্ষিত সম্রাট, রাজা-মহারাজারা রাজপুতানী হেরেম-বালাদের মাধ্যমে ত্বরিত তালিম দিয়ে উঠতি যৌবনেই তাঁকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেন। তারা প্রাচীন ভারতে শক-হুন শাসনামলে আর্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের দ্বারা অনুসৃত 'তিন প্রজন্ম প্রকল্প" পুনর্বাস্তবায়নের কর্মসূচী হাতে নেন। এ প্রকল্পটি ছিলো নিম্নরূপঃ প্রথম প্রজন্মে একজন ১০০% মুসলমান পুরুষের সাথে একজন ১০০% হিন্দু নারীর বিয়ে দিতে হবে। তাদের মিলনে যে শংকর সন্তান জন্মাবে সে হবে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে ৫০% মুসলমান ও ৫০% হিন্দু। দ্বিতীয় প্রজন্মে সেই ৫০% মুসলমানের সাথে কোন ১০০% হিন্দু নারীর বিয়ে দিলে যে শংকর জন্মাবে যে হবে ১৭% মুসলমান ও ৮৩% হিন্দু এবং তৃতীয় প্রজন্মে সেই ১৭% মুসলমানের সাথে কোন ১০০% হিন্দু নারীর বিয়ে দিলে পরবর্তী প্রজন্মের সন্তানটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে হবে ৯৩% হিন্দু ও ৭% মুসলমান। অর্থাৎ তিন প্রজন্ম শেষ হতে হতে মুসলমানিত্বও শেষ হয়ে যাবে। আর এর সাথে সুরা ও নারীর প্রাচুর্য যুক্ত হয়ে যদি ক্যাটালেটিক এজেন্টে কাজ করে তবে ফারমেন্টেশনের প্রবৃদ্ধি আনুপাতিক হারের চেয়েও অনেক দ্রুত সাধিত হবে। এ নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একে একে রাজা-মহারাজার অনেকেই তরুণ আকবরের হাতে ভগ্নী ও কন্যা সম্প্রদান করেন। গড়ে তোলেন নিকটাত্মীয়ের সম্পর্ক মুসলমান ফৈজী, আবুল ফজল প্রমুখ আমির-ওমরাহের প্রতিপক্ষে বীরবল,

টোডরমল প্রমুখ হিন্দু সভাসদবর্গও আসন গ্রহণ করেন শাহী দরবারে। শুরু হয় কূটনীতির লড়াই জয়পুরের। রাজা বিহারীমল (মানসিংহের পিতামহ) মহারাজা মানসিংহের ফুফু জয়পুরী বেগমকে বিয়ে দেন ১৯ বছরের তরুণ সম্রাট আকবরের সাথে। বিনিময়ে পিতা, পুত্র, পৌত্র তিনজন আকবরের সেনাপতি পদে যোগদান করেন। বিকানীর ও জয়সলমীরের রাজার ও আকবরকে কন্যা দান করে তাঁর অনুসরণ করেন। An advanced History. ঐ পৃঃ ৪৪১-৪৩। মানসিংহ বোন রেবা রাণীকে বিয়ে দেন আকবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভাবী সম্রাট জাহাঙ্গীরে সাথে। (নূরজাহান, দ্বীজেন্দ্র লাল) এবং কন্যাকে বিয়ে দেন সম্রাট জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভাবী সম্রাট খসরুর সাথে। [ঐ]

উত্তর-মধ্য ও পশ্চিম ভারতের অন্যান্য রাজা-মহারাজারাও এ মহাজনপন্থা অনুসরণ করে মোগল যুবরাজ ও ওমরাহদের আত্মীয়ভুক্ত হন। অতঃপর নিকটাত্মীয়ের দাবীতে মোগল বাহিনীর প্রায় সবগুলো গুরুত্বপূর্ণ সেনাপতির পদ দখল করেন হিন্দু রাজা-মহারাজারা। মোগলশাহীর প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোও ধীরে ধীরে তাদের করায়ত্ত হয়। মোগলদেরকে হাত করে নিয়ে তারা কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার নীতি অনুসরণ করেন। সোয়া তিনশত বছর ধরে সারা ভারতে জেঁকে বসা তাদের 'পুরনো শত্রু' তুর্ক আফগান মুসলমান শাসকদেরকে নির্মূল করেন তারা মোগলদেরকে সাথে নিয়ে। নূরজাহান ও আসফঝার প্রাসাদ-কূটনীতির কাছে মার খেয়ে শাহজাহান ও আওরজেঙ্গবের জামানায় তারা এ তৎপরতায় খুব বেশী কামিয়াব হতে পারেননি। কিন্তু আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তাদের সে সুযোগ মিলে যায়। আকবরের আমল থেকে রাজপুত রাজা-মহারাজারা নিকটাত্মীয়ের দাবীতে মোগলশাহীর অন্দরমহল ও দরবার দখল এবং সেনাবাহিনী করায়ত্ত করার যে কর্মসূচী বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ করেন দু'শত বছরব্যাপী ক্রিয়াশীল থেকে এতদিনে মোগল সাম্রাজ্যের সর্বত্রই তার প্রতিক্রিয়া মারাত্মক ব্যাধিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। মোগলাই মুসলমানদের ঘরে ঘরে বিলাস-ব্যাভিচারে সম্বিতহারা মুসলিম নামধারী লম্পটেরা প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ও আত্মঘাতী

www.pathagar.com

সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনে। আর সেই আত্মঘাতী সংঘর্ষের সুযোগ গ্রহণ করেই ভারতব্যাপী হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনে ব্যগ্র হয়ে ওঠে মারাঠা, রাজপুত, জাঠ ও শিখ সম্প্রদায়। তাদের সে কর্ম প্রবাহের ঢেউ এসে প্লাবিত করে বাংলার বর্ণ হিন্দু উচ্চ শ্রেণীর মন-মানসিকতাকেও। সুরা ও নারীতে নিঃশেষিত পরবর্তীকালীন নিস্তেজ মোগলদের আমলে সারা উপমহাদেশের সকল এলাকা মুসলিম শাসনের নাম-নিশানা মুছে দেবার তৎপরতা তীব্র হয়ে ওঠে। মারাঠার সমগ্র মধ্য ভারত জয় করে দিল্লী শহর লুণ্ঠন করে। মারাঠা রাজপুত জাঠ-শিখদের বিভিন্ন সশস্ত্র বাহিনী, উপ-বাহিনী সমগ্র মধ্য, পশ্চিম ও উত্তর ভারতের মুসলমানদের অসংখ্য মসজিদ ধ্বংস করে, সম্পদ লুণ্ঠন করে ও তাদেরকে দলে দলে হত্যা করতে থাকে। এরূপ অবস্থায় প্রখ্যাত দার্শনিক শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভীর আকুল আবেদনে [শাহ ওয়ালিউল্লাহ আওর উনকি ইকতেসাদী তাহকিক, মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী, যে অতীত কথা কয়, এ.কে.এম. মহিউদ্দীন পৃঃ ১৩] আহম্মদ শাহ আবদালী নয়দফা সসৈন্যে অভিযান পরিচালনা করেন। তাতে দিল্লীর উপ-কণ্ঠে এক রণক্ষেত্রেই এক লক্ষ মারাঠা সৈন্য নিশ্চিহ্ন হয়। The Sannyali Rebellion. A. N. Chandra. পৃঃ ৬। তা সত্ত্বেও হিন্দু শক্তিগুলোর মুসলিম বিধ্বংসী তৎপরতা কমবেশী অব্যাহত থাকে। দক্ষিণের পথ ধরে বর্গী বলে অভিহিত মারাঠা বাহিনী সুবে বাংলা অবধি লুটতরাজ চালায়। তাদের শিকার হয়েছিলো সুবে বাংলার সম্পদশালী মুসলিম পরিবারগুলো। সমকালীন উচ্চশ্রেণী মোগলাই মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান সুরা ও নারী চর্চার বিরোধী প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ মুসলিম সমাজে। তাঁরা শরীয়তপন্থী গোড়া মৌলবাদী হয়ে ওঠেন আর তরিকতপন্থীরা সুফীবাদী ভাবধারা বিস্তারে ব্যাপৃত হন। এ সুফীদের দু'টি সম্প্রদায় ছিলেন কাদেরীয়া ও কলদরী তরিকার ফকিরেরা।

পক্ষান্তরে রাজপুত, জাঠ ও মারাঠাদের নেতৃত্বে হিন্দু পুনর্জাগরণ সূচীত হয়, হিন্দু সন্ন্যাসী সম্প্রদায় রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সক্রিয় হয়ে ওঠেন। তারা সংঘবদ্ধভাবে হিন্দুরাজ পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য মাঠে নামেন। নাগা সন্ন্যাসী বলে অভিহিত নাগপুর অঞ্চলীয় এ রকম সন্ন্যাসীরা রাজপুত ও মারাঠা সৈন্যবাহিনীর অংশ ছিলো। একমাত্র জয়পুর রাজ্যের সৈন্যবাহিনীতেই ১০ হাজারের বেশী নাগা সন্ন্যাসী কর্মরত ছিলো [সন্ন্যাসী রিবেলিয়ন, এ.এন. চন্দ্র, পৃঃ ২১] হোলকার ও সিন্ধিয়া বাহিনীরও একাংশ ছিলো সন্ন্যাসীদের নিয়ে গঠিত [দি সন্ন্যাসী রিবেলিয়ন, এ.এন. চন্দ্র পৃঃ ২২]। বাংলার হানাদার বর্গী বলে পরিচিত মারাঠা বাহিনীতেও বিপুলসংখ্যক নাগা সন্ন্যাসী ছিলো। [ঐ, পৃঃ ৫৭]। আহমদ শাহ আবদালীর হাতে মার খেয়ে রাজপুত মারাঠা শক্তিগুলো সাময়িকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ার পর 'এ সুর সন্ন্যাসীরা বিভিন্ন রাজা-মহারাজাদের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করতো এবং ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে সারা উপমহাদেশের বিত্তশালী ব্যক্তির বাড়িতে ডাকাতি করতো'। [ঐ, পৃঃ ২২]। বাংলাদেশেও নাগা সন্ন্যাসীদের অনুরূপ ভূমিকা ছিলো। মধ্য ভারতের মাকানপুর কেন্দ্রীয় কাদেরিয়া তরিকার ফকিরেরা, দিনাজপুরের বুরহানা ফকির সম্প্রদায় ও অন্যান্য সুফী ফকিরেরা মোগলাই সুবাদার, আমির-ওমরাহদের ইসলামবিমুখ ভোগ-বিলাসিতা ও লাম্পট্যলীলার দরুন মুসলমান সমাজের সমূহ বিপদ ঘনিয়ে আসতে দেখে বিশেষ বিচলিত ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই তাই তাদের ভূমিকা ছিল জুলুমবিরোধী ও মুসলিম সম্প্রদায়ের সংহতির অনুকূল। মোগল যুগের ২০০ বছরে গড়ে ওঠা বাংলার বিশেষ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে তাঁরা নিজেদের ভূমিকা পালন করেন। এ কারণে সে সব ফকিরদের ভূমিকা উপলব্ধির জন্য তৎকালীন বাংলার পরিস্থিতি সম্পর্কেও সম্যক ধারণা থাকা অপরিহার্য।

www.pathagar.com

বাংলায় মোগল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির সূত্রপাত হয় রাজপুত সেনাপতি মহারাজ মানসিংহের নেতৃত্বে এবং বাংলার ভূমি-ব্যবস্থা পুনর্বিন্যস্ত হয় মোগলশাহীর ভূমি-রাজস্ব বিভাগের সর্বেসর্বা সভাসদ রাজপুত টোডরমলের কর্তৃত্বে।

বাংলার স্বাধীন সুলতান সুলেমান কররানী শহীদ হবার পরবর্তী পর্যায়ে বাংলার দুর্দমনীয় বার ভুঁইয়া জমিদারদেরকে মানসিংহ এবং তার নিকটাত্মীয় ও উত্তরসুরিরা একে একে উচ্ছেদ করেন এবং সেসব জমিদারীর অধিকাংশ রাজপুত সেনাপতিদের প্রভাবে এবং অমাত্যবর্গের আনুকূল্যের রাজপুত ও উত্তর ভারতীয় কুলীন হিন্দু পরিবারগুলোর মধ্যেই বন্টন করা হয়। এভাবে পুটিয়া, চাঁচড়া, নলডাঙ্গা, বিক্রমপুর প্রভৃতি হিন্দু জমিদারীর পত্তন হয় [দি রোল লব জামিদারস ইন বেঙ্গল, শীরিন আখতার পৃঃ ৩২] অবশ্য মোগলাই মুসলমানেরাও কিছু কিছু জমিদারীর অধিকারী হন। বার ভুঁইয়া হিন্দু জমিদাররা ছিলেন অনার্য অকুলীন বঙ্গজ হিন্দু এবং মুসলমান জমিদাররা ছিলেন তুর্ক আফগান বংশোদ্ভূত অথবা অনার্য শূদ্র সম্প্রদায় ও বৌদ্ধ ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমানেরা। অবশ্য মোগল শাসন আমলে পশ্চিম থেকে আমদানীকৃত ব্রাহ্মণ্যদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে রাজশাহীসহ উত্তর বাংলায় প্রতিষ্ঠিত জমিদারীসমূহের অনেকগুলোই ইংরেজ আমল অবধি বহাল ছিলো। [ঐ শীরিন আক্তার, পৃঃ ২১]। সেন রাজাদের প্রভাব বহির্ভূত বরিশাল অঞ্চলে ছিলো বঙ্গজ কায়স্থদের জমিদারী [ঐ, শীরিন আক্তার পৃঃ ২১]। আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহানের আমলে পূর্বোক্ত জমিদারীগুলোর একটা বিরাট অংশ হস্তান্তরিত হয় মোগলাই মুসলমান, রাজপুত ও পশ্চিমা রাজা-মহারাজাদের কাছে। আওরঙ্গজেবের আমলে কিছু কিছু দেশবরেণ্য আলেম ও মাদ্রাসার জন্য জায়গীর মঞ্জুরি ব্যতীত ভূমি-রাজস্বের এ ব্যবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটেনি। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দিল্লী মসনদের অধিকার নিয়ে যখন দুর্বল দুশ্চরিত্র মোগলজাদারা হিন্দু সভাসদ, উপদেষ্টা ও আত্মীয়বর্গের ক্রীড়নক হিসেবে ষড়যন্ত্র ও সংঘাত সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং রাজপুত, মারাঠা, জাঠ ও শিখদের দৌরাত্ম্যে মুসলমান সমাজ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার আশংকা দেখা দেয় তখন ইরানী মুসলিম বণিকের হাতে লালিত ও মোগল বাহিনীতে বেড়ে ওঠা দাক্ষিণাত্যের এককালের ব্রাহ্মণ-সন্তান মুর্শিদকুলী খাঁ সুবে বাংলায় প্রায় স্বাধীনভাবে শাসন পরিচালনা শুরু করেন। (১৭১৭-১৭২৭)। আশৈশব মোগলাই পরিবেশে বেড়ে ওঠা ও মোগলাই প্রশাসনে অভ্যস্ত মুর্শিদকুলী খাঁ মধ্য-পশ্চিম-উত্তর ভারতে পরিদৃষ্ট পরিস্থিতির মতো আসন্নবিপদ এড়াবার আশায় বড় বড় অবাঙ্গালী হিন্দু জমিদারকে হাত করার জন্য নতুন প্রশাসন নীতি অনুসরণ করেন। তিনি এসব বড় জমিদারকে আদায়কৃত খাজনার কমিশন প্রদানের ব্যবস্থা করেন, মসনবদারী পন্থায় তাদের অধীনে সৈন্যবাহিনী রাখার অনুমতি দিয়ে প্রশাসনিক ও সামরিক গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিকসংখ্যক উচ্চবর্ণের হিন্দুদেরকে নিযুক্তি দিয়ে তাঁদের সাথে পার্টনারশীপ প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করেন [শীরিন আক্তার, পূর্বোক্ত পৃঃ]

'মুর্শিদকুলী খাঁ মুসলমান কর্মচারীর জায়গীর বাংলাদেশ হতে উড়িষ্যায় স্থানান্তরিত করেন। কয়েকজন মুসলমান জমিদার রীতিমত রাজস্ব আদায় করতে অসমর্থ হওয়ায় তিনি তাদের জমিদারী কাড়িয়া লন এবং হিন্দুদের সহিত ইহার বন্দোবস্ত করেন। এইরূপে মাহমুদপুর (নদীয়া-যশোহর) ও জামালপুর পরগনার কয়েকটি মুসলমান জমিদারী নাটোর জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা রামজীবনকে দেয়া হয়। সোনারগাঁয়ের ঈসা খানের বংশধরদিগকেও কয়েকটি মূল্যবান পরগনা হারাতে হয়। মুর্শিদকুলী খাঁ তাদের জমিদারীর আলেপশাহী ও মোমেনশাহী পরগণাদ্বয় কাড়িয়া লন এবং দুইজন বর্ণ হিন্দু রাজস্ব কর্মচারীর সহিত ইহার বন্দোবস্ত করেন। এই ব্যবস্থার ফরে আলেপশাহী ও

www.pathagar.com

মোমেনশাহীতে দুইটি প্রতাপশালী হিন্দু জমিদারীর উৎপত্তি হয়। মুর্শিদকুলী খাঁ মনে করিতেন যে, হিন্দুগণ স্বভাবত শাসকদের প্রতি অনুগত থাকে। এই জন্য তিনি রাজস্ব ব্যবস্থার বিষয়ে হিন্দুদিগকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করিতেন। তাহার পরবর্তী নবাবগণও তাহার প্রদর্শিত নীতি অনুসরণ করিয়া চলেন। ইহার ফলে বাংলাদেশের জমিদারীতে হিন্দুদের প্রাধান্য স্থাপিত হয় এবং এ দেশে একটি অভিজাত হিন্দু জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব হয়। রামজীবনের নাটোর (১৩৯টি পরগনা) জমিদারী ... দিঘাপাতিয়া জমিদারী, শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর মোমেনশাহী জমিদারী, মুক্তাগাছা জমিদারী (৫৭টি পরগনা) প্রভৃতি ইহাদের অন্যতম' [বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, এম.এ রহিম পৃষ্ঠা ৩২, রিয়াজুস সালাতিন ও তাওয়ারিখে বাঙলা থেকে উদ্ধৃতি]। কোচবিহারের রাজার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া বিভিন্ন অংশে মোগলরা প্রতিষ্ঠা করেন বর্তমান রংপুর জেলাধীন ফতেপুর, বামনডাঙ্গা, পাঙ্গা, মাথুনা, গাড়িয়ালডাঙ্গা, কাজীরহাট, মহীগুর, তুসভাঙ্গা, টেপা, ভিতরা ও বৈকুণ্ঠপুর– এই এগারটি হিন্দু জমিদারী। [শীরিন আক্তার ঐ, পৃষ্ঠা ৩২]। মুর্শিদকুলী খাঁর শাসন ধারা অব্যাহত থাকায় তাঁর জামাতা নবাব সুজাউদ্দিন খানের সময়ে সুবে বাংলার প্রায় অর্ধেক এলাকা নিয়ে গঠিত ৬১৫টি পরগনা মাত্র ১৫টি জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হয়– এর প্রায় সবাই ছিলেন পশ্চিম থেকে আমদানীকৃত বনেদী বর্ণ হিন্দু। কৃষ্ণরাম রায়ের ইউসুফপুর (যশোহর), রামদেবের মুহম্মদশাহী (ভূষণা; ২৯ পরগনা), রোকনপুর (ফরিদপুর; ৫২ পরগনা), বিশ্বনাথের ইদ্রাকপুর (ঘোড়াঘাট ; ৬০ পরগনা) জমিদারীগুলো এ সময়ে বিকাশ লাভ করে। এসব বড় বড় জমিদারীগুলোর মালিক ছিলেন মোগল যুগীয় পশ্চিমা কুলীন হিন্দুরা– বাংলাদেশী অনার্য বাঙালীরা নন। তাঁদের দেওয়া রাজস্বের পরিমাণ ছিল সেকালে মুদ্রামানে ৬৫ লক্ষ টাকা। সমগ্র বাংলার মোট রাজস্বের প্রায় অর্ধেক।

এসব বড় বড় জমিদারেরা সন্নিহিত এলাকার ছোট ছোট জমিদারীগুলোর ব্যবস্থাপনা তদারক করতেন। সেগুলোর রাজস্বও বড় জমিদারদের মধ্য থেকে নিযুক্ত বা সরাসরি নিযুক্ত চাকলাদার, চৌধুরী ইত্যাদি পদবীধারী উচ্চপদস্থ হিন্দু কর্মচারীরাই আদায় করতেন।

বড় জমিদারেরা আদায়কৃত সেসব রাজস্বের উপর কমিশন পেতেন। নাটোর জমিদারীতে মুর্শিদকুলী খাঁর সময়ে ছিলো ১৩৯টি পরগনা [আবদুর রহিম, ঐ পৃঃ ৩১]। ১৭৪৮ সালে আলীবর্দী খাঁর সময়ে তার আয়তন দাঁড়ায় ১৬৪টি পরগনায় [শীরিন আক্তার, ঐ, পৃঃ ১৮]। অবশ্য বড় বড় হিন্দু জমিদারীগুলোর পাশাপাশি তখনও বাঙালী মুসলমান ও বাঙালী অনার্য হিন্দু মালিকানাধীন মাঝারি জমিদারী বিরাজ করছিল। তাছাড়াও ছিল বড় জমিদারীর অধীন বিপুলসংখ্যক তালুকদার, হাওলাদার, শিকদার ইত্যাদি ভূস্বামীরা। এসব মাঝারি ও ছোট ছোট জমিদার-তালুকদারেরা ছিলেন বাংলার মাটি ও মানুষের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। মুর্শিদকুলী খাঁর সময় থেকে বাংলার সামরিক ব্যবস্থাও পুনর্বিন্যস্ত হয়ে জমিদার নির্ভর হয়ে পড়ে। বড় জমিদারদের অনেককে ৩৫ অথবা ৭ হাজারী মনসবদারী দেওয়া হয়– অর্থাৎ প্রয়োজনীয় মুহূর্তে নবাবকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ থেকে তারা জমিদারী রাজস্বের একটি বিশেষ অংশ দিয়ে নিজেদের অধীনে জমিদারকে আদায়কৃত খাজনার কমিশন প্রদানের ব্যবস্থা করেন. মনসবদারী পন্থায় তাদের অধীনে ৩, ৫ অথবা ৭ হাজার সৈন্যের সেনাবাহিনী রাখার অধিকার লাভ করেন। এ ছাড়া মুর্শিদকুলী খাঁ থেকে আলীবর্দী পর্যন্ত সময়ে (১৭১৭–১৭৫৬) সেনাবাহিনী বখশী, সেনাপতি, রাজস্ব বিভাগের দেওয়ান, প্রশাসন বিভাগের নায়েব-নাজীম প্রভৃতি বড় বড় পদগুলোতেও রাজা-মহারাজারা নিযুক্তি লাভ

www.pathagar.com

করেন। সেই সুবাদে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের জন্য সারা বাংলার জায়গীরস্বরূপ নির্ধারিত ৪১০টি পরগনার মধ্যে অনেকগুলো উচ্চশ্রেণীর বর্ণ হিন্দুদের হাতে চলে যায়। এর পাশাপাশি প্রশাসনিক ও সামরিক উভয় ক্ষেত্রেই পশ্চিমা কুলীন অর্থাৎ অবাঙালী উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা আশাতীতরূপে প্রাধান্য লাভ করে। মধ্য-পশ্চিম ও উত্তর ভারতের রাজনৈতিক আবহাওয়া থেকে আত্মরক্ষার আশায় অনুসৃত এ পার্টনারশীপ প্রশাসন ব্যবস্থার কারণেই 'মুর্শিদকুলী হিন্দুদিগকে রাজস্ব বিভাগের দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেন। তাঁহার শাসনকালে ভুপৎ রায়, দর্পনারায়ণ, রঘুনন্দন, কিংকর রায়, আলম চাঁদ, লাহোরীমল, দিলপত সিংহ, হাজারীমল এবং আরও কয়েকজন হিন্দু দীউয়ানও অন্যান্য উচ্চ পদে নিযুক্ত হন। মুর্শিদকুলীর জামাতা ও উত্তরাধিকারী নবাব সুজাউদ্দিনের আমলেও আলম চাঁদ, জগৎ শেঠ, যশোবন্ত রায়, রাজবল্লভ, নন্দলাল এবং আরও অনেক হিন্দু কর্মচারী দায়িত্বপূর্ণ রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। লক্ষণীয় যে, এসব বর্ণহিন্দু রাজা-মহারাজা, কর্মচারীরাই নবাব মহলের বিভেদের উস্কানি দিয়ে তাদেরকে বশীভূত করে নিজেরা উত্তরোত্তর অধিক ক্ষমতা লাভের প্রচেষ্টায় মেতে ওঠেন এবং মুর্শিদকুলীর দৌহিত্র সরফরাজের বিরুদ্ধে তাঁর বিহারের গভর্নরকে সক্রিয় সমর্থন দিয়ে বিদ্রোহ ঘটান। বিদ্রোহী আলীবর্দীর হাতে ১৭৪০ সালে সরফরাজ নিহত হন। রাজা-মহারাজাদের সমর্থনে আলীবর্দী নবাব হন। ফলে স্বভাবতঃই নবাব আলীবর্দীর সময়ে রাজপথে হিন্দুদের আরও উন্নতি হয়। এই সময় দিন রায়, বীরু দত্ত, কীরাত চাঁদ ও উমেদ রায় যথাক্রমে খালাসা বিভাগের দীউয়ান ছিলেন।

কর্নেল স্কটের সচিব চার্লস এক নোবল (কোলকাতা প্রতিরক্ষা প্রকল্পের প্রণেতা)-র লেখা থেকেও আমরা আরো জানতে পারি যে,'.... কর্নেল স্কট মন্তব্য করেন যে. বাংলার জেন্টু (হিন্দু) রাজা-মহারাজারা ও অধিবাসীরা মুর (মুসলিম) সরকারের প্রতি খুব বেশী অসন্তুষ্ট এবং একটা পরিবর্তন ঘটাবার ও তাদের অত্যাচারমূলক শাসন উৎখাত করার জন্য গোপনে গোপনে অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব। .... আমার ধারণা, উর্মিচাঁদ (উমিচান্দ) ইচ্ছা করলে বাংলায় আমাদের সর্বাধিক উপকার করার যোগ্যতা রাখেন। নিমো গোসাইং (নিমু গোসাই) নামক একজন উঁচুস্তরের ধর্মীয় নেতা আছেন, জেন্টু রাজাদের উপর এবং অস্ত্রধারী দলবদ্ধভাবে সারা দেশে ঘুরে বেড়ানো একটি ধর্মীয় ভিখারী (সন্ন্যাসী) সম্প্রদায়ের ওপর তাঁর বিপুল প্রভাব রয়েছে। আমাদের পক্ষে নিয়োগ করতে পারলে তারা সম্ভবতঃ আমাদের খুবই কাজে আসবে। আমার একান্ত বিশ্বাস, নিমো গোসাইং-এর মাধ্যমে তা করা যাবে। এই পুরোহিতটি কর্নেল স্কটকে অনেক ভালো ভালো গোপন খবর সরবরাহ ও বাংলার পরিস্থিতি সম্পর্কে নানা বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন এবং বলেছেন যে. প্রয়োজন দেখা দিলে. চারদিনের মধ্যেই তিনি ইংরেজদেরকে সাহায্য করার জন্য এরূপ এক হাজার অস্ত্রধারীকে হাজির করে দিতে পারেন। কর্নেল স্কট তাকে কিছু 'সার্ভিস' দিয়েছিলেন..."

কোলকাতা দুর্গ নির্মাণের প্রাক্কালেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কোর্ট অব ডাইরেক্টর্স ১৭৫৪ সালের ২৪ নভেম্বর তারিখে কোলকাতাস্থ ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিলকে লেখা এক চিঠিতে নওয়াবের অনুমতি নিয়েই. অথবা তাঁর জ্ঞাতসারে উক্ত কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন এবং নবাবের অনুমতি বা সম্মতি আদায়ের জন্য তৎকালীন মুদ্রায় ২,০০,০০০.= (দুই লক্ষ) ও বর্তমান মুদ্রামানে ৪০,০০,০০,০০০/= (চল্লিশ কোটি টাকা) ব্যয়ের মঞ্জুরী দেন। কিন্তু বাংলার রাজা-মহারাজা বাবুদের এবং তাদের পক্ষীয় বর্ণ হিন্দু বণিক ব্যবসায়ী ও গুরু পুরোহিতদের সর্বমুখী সহযোগিতার আশ্বাস ও আবেদন-নিবেদনে উৎসাহী হয়ে কোম্পানীর কোলকাতাস্থ কর্মকর্তারা লন্ডনস্থ কোর্ট অব

www.pathagar.com

ডাইরেক্টর্সের নির্দেশ পাশ কাটিয়ে যান।

[উইলসন, দি ইন্ডিয়ান রেকর্ডস ঃ ওল্ড ফোর্ট উইলিয়াম ইন বেঙ্গল, ভল্যুম ২, পৃঃ ১৫]।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনী লেখক রাজীব লোচন লিখেছেন যে, 'হিন্দু জমিদার ও প্রধানগণ সিরাজউদৌল্লাকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন। [কে. কে. দত্ত, আলীবর্দী এন্ড হিজ টাইম, পৃঃ ১১৮]।

পলাশী যুদ্ধের প্রাক্কালে ক্লাইভের সাথে বর্ধমান, দিনাজপুর ও নদীয়ার জমিদারদের পত্রযোগাযোগ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ মেলে যে, অগ্রিম আনুগত্য প্রকাশ করে তারা ক্লাইভকে যুদ্ধযাত্রার দাওয়াত জানান [শীরন আক্তার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৭] নদীয়া, বর্ধমান, বিষ্ণুপুর, মেদিনীপুর, দিনাজপুর, বীরভূমের রাজা-মহারাজারা মুর্শিদাবাদ সমবেত হয়ে দেওয়ান-ই সুবা মহারাজা মহেন্দ্রের কাছে অনেকগুলো দাবী পেশ করেন– তাদের ক্রমবর্ধিষ্ণু দাবী মিটাতে নবাব অপারগ হলে জগৎ শেঠের পরামর্শে তারা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নেতৃত্বে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে সিরাজদ্দৌলাকে উৎখাতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সভার পক্ষে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কোলকাতায় মিঃ ড্রেকের সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার আহবান জানান এবং সর্বমুখী সাহায্য-সহযোগিতার আশ্বাস দেন। Territorial Aristocracy of Bangla-the Nadia Raj: C. R. 1872 L. V., 107-110. উদ্ধৃতি [শীরিন আক্তার, পূর্বোক্ত ১০৭] সুবে বাংলার কুলিন বর্ণহিন্দু রাজা-মহারাজারা আলীবর্দীকে দিয়ে নবাব সরফরাজকে উচ্ছেদ করে যেরূপ ফায়দা হাসিল করেন, নবাব আলীবর্দীর মৃত্যু মুহূর্তেও তেমনি দীউয়ান রাজবল্লভের নেতৃত্বে তাদের একদল সিরাজের বড় খালা ঘষেটি বেগমকে উস্কানি দিয়ে, সসৈন্যে সাথে করে নিয়ে মুর্শিদাবাদ আক্রমণের জন্য নগরীর দ্বারপ্রান্তে হাজির করেন। সিরাজউদ্দৌলা তাঁর খালার মন জয় করে তার সমর্থন পেয়ে যাওয়ায় দিশেহারা দেওয়ান রাজবল্লভ নিজ পুত্র কৃষ্ণবল্লভকে দিয়ে নবাবের ঢাকাস্থ যাবতীয় অর্থবিত্ত সম্পদ-সম্ভার কোলকাতায় ইংরেজদের আশ্রয়ে পাচার করে দেন। অন্যদিকে সিরাজের খালাতো ভাই পুর্নিয়ার গভর্নর শওকত জংকেও শ্যামসুন্দর বাবুরাই উস্কানি দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অবতীর্ণ করেন।

মুর্শিদাবাদ দরবারকে ঘিরে ষড়যন্ত্রের গুটি চালছিলেন রাজা-মহারাজা, সভাসদ, উচ্চপদস্থ 'কুলিন' হিন্দু সামরিক প্রশাসন ও রাজস্ব বিভাগীয় কর্মকর্তারা। আলীবর্দী খাঁ ও সিরাজউদ্দৌলা নিজেরা তুর্কী হলেও তাদের আমীর-ওমরাহরা ছিলেন মোগলাই মেজাজের, বিলাস ব্যভিচারের বিনিময়ে সবকিছু বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। এদিক দিয়ে অবস্থা 'কুলীন' বাবুদের অনুকূলেই ছিল। কিন্তু অসুবিধা ছিল অন্যত্র। বাংলার বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ছিল বিপুলভাবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ। বাংলার এই জনসাধারণ ছিল শিক্ষিত, বিশেষ করে মুসলমান সমাজে একটিও অশিক্ষিত নর বা নারী খুঁজে পাওয়া অসম্ভব ছিল [উইলিয়াম হান্টার, দি ইন্ডিয়ান মুসলমান, শাহ ওয়ালিউল্লাহ আওর উনকি ইকতিশাদী তাহকিক, মওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী; নূর উদ্দিন আহমদ কৃত অনুবাদ 'শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী' ও তার চিন্তাধারা ম্যাক্সমুলারের উদ্ধৃতি, পৃঃ ১৪৮]। এসব অনার্য বাঙালী মুসলমান হিন্দুর উৎপাদিত নানা জাতীয় পণ্য তখন মুসলিম সওদাগরদের মাধ্যমে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, আর্মেনীয়, ইংরেজদের হাত ঘুরে উপমহাদেশে, বহির্বিশ্বে ও ইউরোপের বাজার দখল করে আছে। উর্বরা জমিতে উৎপাদিত ফসলে সুলতানী আমলে ১/১০ থেকে ৬/১০ অংশ, মোগল যুগে ১/৩ অংশ এবং নবাবী আমলে সর্বোৎকৃষ্ট জমিতে অর্ধেকাংশ খাজনা দিয়েও হিন্দু মুসলমান চাষীরা সচ্ছল ছিলেন, ২ ত

www.pathagar.com

(১,২) থেকে ৫% হারে শুল্ক দিয়েও মুসলমান সওদাগরেরা ছিলেন বিপুল সম্পদ-সম্ভারের মালিক।

[ডক্টর ইউসুফ হোসেন, গ্লিম্পসেস অব মিডিয়েভাল ইন্ডিয়ান কালচার; ফারুক মাহমুদ অনূদিত মধ্যযুগের পাক-ভারতীয় সংস্কৃতি, [শীরিন আক্তার, পূর্বোক্ত] তাদের কেউ-ই মুসলিম শাসনের প্রতি বিরূপ ছিলেন না, কেউ-ই ছিলেন মুর্শিদাবাদের নবাবদের পতন দেখতে আগ্রহী। এ পরিস্থিতিতে পশ্চিমা কুলিন রাজা-মহারাজারা শুধুমাত্র নিজেরা কতদূর পেরে উঠবেন সে ব্যাপারে তাদের নিজেদের মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিলো। এ সন্দেহের কারণেই তারা সহযোগী হিসাবে গ্রহণ করেন ইংরেজদেরকে। ঘষেটি বেগম হাতছাড়া হওয়ায় ও শওকত জং নিহত হবার পর তারা সবাই মিলে ইংরেজ কোম্পানীকেই এ খেলায় যোগ্যতম রেসের ঘোড়া হিসেবে বেছে নিলেন। [সরকার, ঐ, পৃঃ ৪৮৬]। তাঁদের বিশ্বাস ছিল মোগলদেরকে সাথে নিয়ে তুর্ক আফগানদেরে উৎখাত করার মত ইংরেজদেরকে সাথে নিয়ে মোগলাই মুসলমানদের উৎখাত করা সম্ভব হবে– মোগলেরা এ দেশে রয়ে গেলেও সাত সমুদ্র তের নদী পাড়ের ইংরেজরা এদেশের মাটিতে শিকড় গাড়তে পারবে না। মুসলিম প্রাধান্য লোপ করার পর সহজেই তাদের বিতাড়িত করা যাবে। এ কারণেই ইংরেজদেরকে সামনে দিয়ে সর্বমুখী সহযোগিতা দান করতে থাকেন হিন্দু রাজা-মহারাজারা। কোলকাতার ৩ ফেব্রুয়ারী ১৭৫৭ তারিখের যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে ক্লাইভের মোট ৮১১ জন সৈন্যের পাশে তারাই দাঁড় করিয়ে দেন ১৪টি কামানসহ ১৩শ' এ দেশীয় সৈন্য [যদুনাথ সরকার, হিস্ট্রী অব বেঙ্গল, পৃঃ ৪৮২] পলাশীর প্রান্তরে ক্লাইভের ৮শ' ইংরেজ সৈন্যের সারিতে তারাই শামিল করে দেন ৮টি কামানসহ ২ হাজার ২শ' ৫০ জন দেশীয় গোলন্দাজ ও পদাতিক সৈন্য [সরকার, ঐ, পৃঃ ৪৮৭]। বৃদ্ধ অথর্ব লোভী মীর জাফরকে বেঈমানীর বেদীতে দাঁড় করিয়ে দিয়ে মুচকি হাসিতে পলাশীর যুদ্ধ নাটক উপভোগ করেন উপ-প্রধান সেনাপতি রাজা রায়দুর্লভ– আর তাঁর সঙ্গী-সাথী সেই ষড়যন্ত্র নাটকের অন্যান্য ঝানু খেলোয়াড়েরা।

Power was practically monopolised by a great Multitude of Isolated officials---far removed from control.

পলাশী যুদ্ধের কারণে বাংলায় যে শূন্যতার সৃষ্টি হয় এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক **Leeky**

www.pathagar.com

ওপারে পলাশী এপারে আমরা

গিয়াস কামাল চৌধুরী

তেইশে জুন। হারাবার দিন। বেনিয়াদের আনল কারা। বেঈমানরা। ফায়দা লুটপাট, সেই যে শুরু, থামেনি আর, থামছে না আর।

শির দেগা, নেহী দেগা আমামা। এ লড়াই-এ জিততে হবে।

হে বীর মুজাহিদ, হও আগুয়ান। সামনে চলো। অভিযাত্রী এগিয়ে চলো। ফিরে এল সেই বেদনানীল ষড়যন্ত্র-চাতুরী খল ছলনার ঘাতকদের কাল দিনটি। প্রতিবাদ, প্রত্যাখ্যান আর প্রতিরোধী হে জন্মভূমি। হে স্বদেশবাসী, এসো রুখে দিই। রুদ্র-রূঢ় কসম খেয়ে বলি, লড়ছি এবং লড়েই যাব। হুশিয়ার, সাবধান! রোখ দুশমন। নাশো বেঈমান।

মওলানা শওকত আলী, মৌলানা মোহাম্মদ আলী জওহর, শহীদ সৈয়দ আহমদ, সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী, স্যার সৈয়দ আহমদ, হাজী শরীয়তুল্লা, শহীদ তিতুমীর, নওয়াব সলিমুল্লা, মওলানা ইসলামাবাদি, শেরে বাংলা ফজলুল হক, মৌলানা ভাসানী, শহীদ জিয়া স্মরি তোমাদের। লহ সালাম।

বেনিয়া বৃটিশ খেদাও সংগ্রাম উঠানামা করেছে। তবে হটেছে তারা। গান্দারী হটেনি। খুন দিল বরকত-সালাম-রফিক-জব্বার। কাফেলা চলেছেই এগিয়ে। থামেনি কো কোথা।

বৃটিশমুক্ত ওপার মুর্শিদাবাদে সবুজ-সাদা ঝাণ্ডা উড়েছে পত্‌পত্‌। বেনিয়া রেডক্লিফ্‌ বানরের পিঠা ভাগ করেছে। গলাধঃকরণ করেছে অনেক। রোয়েদাদ সদস্য এপার প্রতিনিধি মেধাবী আইনজীবী চৌধুরী প্রমুখের অবহেলা-স্তুতি অমার্জনীয়। মুর্শিদাবাদ-বহরমপুর পুরো পরগনা হারিয়েছি। তবে, ফিরে চাই। ১৮৫৭-তে

www.pathagar.com

হারালাম মীরজাফর জগৎশেঠদের ছুরির আঘাতে পেছন থেকে। ১৯৪৭-এ হারালাম পতাকা লোভ-অবহেলার গৃধ্নু লালসার বেদীমূলে। ফিরে পাব, ফিরে চাই। এখানেই থামত যদি। পূর্ব পার ঢাকা, ঐতিহাসিক নগরী-মুসলিম ঐতিহ্যের ধারাবাহী এ জনপদে, ধারে কাছে রয়েছে অনেক ঐতিহাসিক স্মৃতি কণিকা। ছিল এক রাস্তা। মুর্শিদকুলি খাঁর নামবহ। জনান্তিকে স্বরান্তিকে হয়ে গেল 'কুলি রোড'। সুপরিচিত সম্ভাবনা ঋদ্ধ কৃষি ফার্ম পূর্ব মাথা হতে কোনাকুনি প্রাচীন ধানমন্ডির নীলক্ষেত প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণী চরিত্র পরিচায়ক তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানী এক নেতার খেয়ালে নাম হয়ে গেল "গ্রীন রোড"। সোনালী বর্ণালী ইতিহাস হয়ে গেল "গ্রীন"। তাও আজ ধূসর। খোদ সে নেতার 'নিরিবিলি' মহলই এখন বারোয়ারী দখলদারির হামলার মুখে।

ইতিহাস শুধু পুনরাবৃত্তই হয় না। নির্মম প্রতিশোধও নেয়। কেবল অনুষ্ঠান, আলোচনা, আহা-উহু নয়। এবারের ২৩শে জুন-এ হারানো ভূখণ্ডও আমরা ফিরে চাই।

কবি ঐতিহাসিক সতীর্থ আবদুল হাই শিকদার রচিত 'সিরাজদ্দৌলা-মুর্শিদাবাদ' বইটির ছাত্রে ছাত্রে বিধৃত এমন এক মাতম, এমন আহাজারি যার জবাব ইতিবাচক হতেই হবে।

যে লালিত অবহেলার ধূলি ধূসরতায় 'শুভ্রসমুজ্জ্বল' 'তাজমহল' সংলগ্ন মথুরার রিফাইনারী নিসৃত ধূম্রকুণ্ডলে হারিয়ে ফেলছে তার পবিত্র রূপ, দিওয়ান-ই-খাস, মসজিদ-ই-নাগিনা যে প্রচ্ছন্ন অবহেলার গুপ্ত শিকার– এবং এটাই তাদের গুপ্ত ও গুপ্ত স্বীকৃত ভংগী। অথচ লক্ষ কোটি বৈদেশিক মুদ্রা মুনাফা আসছে পর্যটকদের সফর থেকে।

সময়ের চলমান দাবি ওপারের ভগ্ন স্মৃতি বিশেষত মুর্শিদাবাদ-পলাশী ও পূর্ণ অঞ্চলকে নাম দিয়ে প্রোজ্জ্বল করে তোলার সুযোগ ও পথ আমরা অর্জন করতে চাই। এবারের তেইশ এ ডাক দিতে আবার এসেছে।

www.pathagar.com

পলাশী চক্রান্তের নেপথ্য কাহিনী

এরশাদ মজুমদার

তখনকার সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (১৭০৩-৭৬) সাহেবের মতো একজন জ্ঞানী ব্যক্তির কি ধারণা ছিল তা পাঠকদের জন্য তুলে ধরলাম।

কর্ণেল সি বি মেলোসন তাঁর 'ডিসাইসিভ ব্যাটল্‌স অব ইন্ডিয়া' পুস্তকে লিখেছেন- 'পলাশীর ঘটনাকে কখনই যুদ্ধ বলে বিবেচনা করা যায় না। এখানে শুধু বিশ্বাসঘাতকতাই কাজ করেছে, এই বিশ্বাসঘাতকতা নবাবকে বিতাড়িত করেছে, সৈন্যবাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। আর এ কারণেই ক্লাইভ নিশ্চিহ্ন না হওয়ার ব্যাপারে ষোল আনা নিশ্চিত হয়েই সামনে এগিয়ে গেছে।

১৭৫৭ সালের পূর্ববর্তী চল্লিশ বছর ছিল বাংলার নবাবী আমল। ১৭১৭ সালে বাংলার স্বাধীন নবাবদের যাত্রা শুরু হয়। ১৭ সালের পরে দিল্লীর কোন সম্রাট বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেননি। কারণ, তখন ছিল মোগল বাদশাহীর দুর্দিন। তারা কার্যতঃ নামমাত্র দিল্লীর বাদশাহ ছিলেন। মুর্শিদ-কুলি খাঁ ছিলেন-প্রথম স্বাধীন নবাব। আর সিরাজউদ্দৌলা ছিলেন শেষ।

বাংলার নবাবদের ইতিহাসে আর পলাশীর চক্রান্ত বিখ্যাত হবার কারণ এই সময়েই পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম ন্যক্কারজনক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এ অঞ্চলে। বাংলার কিছু স্বার্থান্বেষী ষড়যন্ত্রীর দেশদ্রোহিতার কারণে সারা ভারতের স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়েছিল এ সময়ে। ইতিহাসে এ সময়ের ঘটনাকে নানাভাবে দেখানো হয়েছে। কেউ দেখেছেন সমগ্র ব্যাপারটাকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে। আবার কেউ দেখেছেন নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে। যেমন শাহ ওয়ালীউল্লাহর দৃষ্টিতে তখনকার শাসকরা নীতিহারা হয়ে পড়েছিলেন। প্রজা-পালনে তাদের কোন খেয়ালই ছিল না। আবার কেউ বলছেন, ত

www.pathagar.com

ৎকালীন বাংলার শাসকদের পারিবারিক ও প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের ফলেই ইতিহাসের এই বিশাল ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।

অনেকেই সমগ্র ব্যাপারটাকে বিশ্লেষণ করেছেন অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে। কালমার্কস বলেছেন, ষোল শ' সালে যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয় তখন ইংল্যান্ডে ফিউডালতন্ত্র চালু ছিল। জমির মালিক ছিল জমিদারেরা। কৃষক বলে কেউ ছিল না। ভূমিদাস প্রথা ছিল। ভূমিদাসরা জমিদারের জমিতে বেগার খাটাতো। অথচ তখন বাংলাদেশের ভূমিব্যবস্থা ছিল অনেক উন্নত। এখানে রাষ্ট্রের সাথে কৃষকরা সরাসরি জমি বন্দোবস্ত নিতে পারতো। তৎকালীন সরকার জমির বিনিময়ে চাষী বা প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতো। সরকার সেচ ব্যবস্থার প্রচলন করে জমির উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করতেন। এ ছাড়া পুনর্বাসন কাজের জন্য ছিল সরকারের পূর্ত বিভাগ। কিন্তু ইংরেজরা লুণ্ঠন ও যুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই করেনি। মার্কসের মতে, এই সময়টা ছিল ইউরোপের বাইরে বৃটেনের লুটতরাজ দাস-বানানো, খুনের মাধ্যমে সম্পদ দখল করার যুগ। আর ইংল্যান্ডে পুঁজির বিকাশের যাত্রা শুরু। ভারতের শিল্পবিকাশের পথ রুদ্ধ করে বৃটেনে শিল্প বিপ্লব ঘটানো। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে যে শিল্প পুঁজির প্রয়োজন ছিল পলাশী চক্রান্ত বৃটেনের জন্য সে স্বর্ণ সুযোগ এনে দিলো। বাংলার সম্পদ এবং কালক্রমে সমগ্র ভারতের সম্পদ স্রোতের মতো ইংল্যান্ডে যেতে শুরু করলো। সুতরাং বৃটেনের জন্য পলাশীর মতো একটা ঘটনা অপরিহার্য ছিল।

কোম্পানীর কেরানী ক্লাইভ পরবর্তীতে যিনি ধীরে ধীরে কর্ণেল ও লর্ড হয়েছেন, তার নিজের ভাষায়-ইংরেজরা ঘরের টাকা খরচ করে যুদ্ধ করে ভিনদেশ জয় ও দখল করেছে। কিন্তু ভারত দখল করতে ইংল্যান্ড থেকে তাদের এক পয়সাও আনতে হয়নি। সমস্ত অর্থই পাওয়া গেছে ভারতে।| বাংলা দখলের পর কোম্পানীতে মূলতঃ কোন ব্যবসা করতে হয়নি। সমস্ত অর্থই পাওয়া গেছে ভারতে।' লুণ্ঠনই ছিল মূল পেশা। কোম্পানীর কর্মচারীদের লুটতরাজের খবর ইংল্যান্ডে কোম্পানীর সদর দফতরে গেলো-তখন পরিচালকবৃন্দ তদন্তের ব্যবস্থা করেছিলেন। লর্ড ক্লাইভ কমন্স কমিটির কাছে আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেছিলেন- 'নবাবের উদারতায় আমার সৌভাগ্যকে সহজলভ্য করেছি। এখন আমার ভারতে অবস্থানের একমাত্র উদ্দেশ্য কোম্পানীর মঙ্গল সাধন করা। আমি একথা কোনদিনই গোপন করিনি, বরং ভারতের পরিচালকবর্গের সিক্রেট কমিটিতে প্রেরিত পত্রে আমি সেকথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলাম। আমি কোম্পানীর কাজে বহুবার জীবন বিপন্ন করেছি। এরপর কোম্পানীর ক্ষতি সাধন না করেও সৌভাগ্য অর্জনের যে একমাত্র সুযোগ পেয়েছি তা প্রত্যাখ্যানের জন্য কিছু অজুহাত কোম্পানী আমার কাছে আশা করতে পারেন? আমি যদি স্বল্পলাভ করতাম কোম্পানী নিশ্চয়ই অধিকতর লাভবান হতেন না।

লর্ড ক্লাইভ সর্বশেষ ১৭৬৫ সালে ভারতে আসেন। ৩০ সেপ্টেম্বর ১৭৬৫ সালে ক্লাইভ কোম্পানীর বোর্ডের কাছে যে চিঠি দেন তাতে কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যবহারের এক করুণ চিত্র তুলে ধরেন। ঐ চিঠির উত্তরে বোর্ড কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের প্রস্তাব অনুমোদন করে এবং কর্মচারীদের স্থলবাণিজ্য করার প্রস্তাব নিষিদ্ধ করে। বোর্ড মন্তব্য করে-স্থলবাণিজ্যের নামে কোম্পানী কর্মচারীরা যে বিপুল অর্থ আদায় করেছে তা মূলতঃ উৎপীড়ন ও স্বেচ্ছাচারের মাধ্যমে। এমন স্বেচ্ছাচার কোন যুগে

www.pathagar.com

কোথাও সংঘটিত হয়নি। ক্লাইভ বোর্ডের নির্দেশ মানেননি। তিনি আরও দুবছর স্থল বাণিজ্য চালিয়ে যান এবং বাংলায় অবাধ লুণ্ঠন চালিয়ে যান। মন্ট গোমারী রিপোর্টে বলা হয়েছে- তিরিশ বছরে কোম্পানী আর তার কর্মচারীরা বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৭৩ কোটি টাকা ইংল্যান্ডে পাচার করে। লর্ড মেকলে উল্লেখ করেছেন, মুসলমান রাজন্যবর্গের স্বেচ্ছাচারিতা আর মারাঠাদের লুণ্ঠনের পরেও বাংলা ছিল প্রাচ্যের স্বর্গ।

অথচ এই সুন্দর ও ধনী দেশটাই ইংরেজ দখলের কিছুদিনের মধ্যেই দরিদ্র দেশে পরিণত হয়। দেশে দেখা দেয় মহাদুর্ভিক্ষ। এরমধ্যেও ক্ষমতা বদলের মাধ্যমে কোম্পানীর কর্মচারীরা প্রথম ৮ বছরে ৯ কোটি টাকা ঘুষ হিসেবে আদায় করে। এ ঘুষের কিছু কিছু রিপোর্ট কোম্পানীর সদর দফতরে স্বীকৃত হয়েছিল।

পরবর্তী পর্যায়ে কমন্সসভার সিলেক্ট কমিটি কোম্পানীর প্রশাসন সম্পর্কে এক মন্তব্যে বলে-প্রস্তাবে নিপীড়ন ও উৎসাহদান উভয়নীতির নিখুঁত পরিকল্পনা রয়েছে। যা নিশ্চিতভাবে বঙ্গদেশের শিল্পোৎপাদনে বিপুল ক্ষতিসাধন করবে। প্রস্তাবের উদ্দেশ্য হলো-গ্রেট বৃটেনের শিল্পোৎপাদনের গোলাম স্বরূপ ঐদেশকে কাঁচামাল উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরিণত করা।' সময়টা ছিল কর্ণওয়ালীসের।

১৬০০ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। রাণীর সনদ নিয়ে কোম্পানী পূর্ব ভারতে ব্যবসা করতে আসে। এর আগে ফরাসী ও পর্তুগীজ ব্যবসায়ীরা আসে। ইংরেজ বণিকদের সম্পর্কে শায়েস্তা খাঁ যে মন্তব্য করেছেন তা হচ্ছে-এরা ছিল নীচ, ঝগড়াটে এবং অসৎ। প্রাচ্যের স্বর্গ বাংলায় ভাগ্যলাভের আশায় এসেছিল কোম্পানীর কর্মচারীরা। মূলতঃ কুটবুদ্ধিসম্পন্ন পুষ্ট লোকেরাই কোম্পানীর কর্মচারী হিসেবে ভারতে এসেছিল। ক্লাইভ নিজেই বলেছিলেন-কোম্পানীর ডিরেক্টরদের সুদূর ইংল্যান্ড থেকে কোম্পানীর কর্মচারীদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা ছিল একেবারেই অসম্ভব। আর এ ছাড়া কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডারদের মূল লক্ষ্য ছিল টাকা কামানো' সুতরাং যেভাবেই হোক টাকা আসলেই হলো। ক্লাইভ এবং পরবর্তী প্রতিনিধিরাও তা বুঝতে পেরেছিলেন। এক পয়সা খরচ না করে যে দেশটা তারা দখল করেছিল, সেই দেশে মানুষের জন্য ভিনদেশী কোম্পানী কর্মচারীর দরদ থাকার কথা নয়।

১৬৫১ সালে কোম্পানী প্রথম বাংলায় এলো এবং হুগলীতে কুঠি স্থাপন করলো গেরিয়েল বাউটন নামে এক ডাক্তারের প্রভাবের মাধ্যমে তারা সম্রাট শাহজাহানের মন জয় করে। তারপর বাদশাহী এক নিশান নিয়ে বাংলাদেশে স্থল বাণিজ্যের জন্য প্রবেশ করে। কোম্পানী কর্মচারীদের প্রতিটি পদক্ষেপই ছিল শঠতা নির্ভর। টাকা কমানোর লোভে যখন মানুষ পাগল হয় তখন তার যে অবস্থা হয়। ওদিকে ইংল্যান্ডে ব্যবসা-বাণিজ্যের মালিকরা বেপরোয়া হয়ে উঠতে শুরু করেছে। তাদের অধিক মুনাফা ও পুঁজি দরকার। এরই প্রেক্ষিতে বাংলায় ব্যবসা করার জন্য ইংরেজ বণিকরা পাগল হয়ে উঠলো। কিন্তু দিল্লীর শাসন ব্যবস্থা যতদিন শক্ত ছিল ততদিন তারা কিছুই করতে পারেনি।

১৭১৭-১৭৫৭ সালে বাংলার নবাবী আমলে এখানে হিন্দু-মুসলমান মিলিতভাবে দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করতো। শাসকরা মুসলমান হলেও তারা এদেশের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গিয়েছিলো। এসব মুসলমান এসেছিল আরব, তুর্কী, আফগান ও পারস্য থেকে। তাদের ভাষা ছিল আরবী-ফারসী। মুসলমানরা মূলতঃ এদেশে আসতে শুরু করে

www.pathagar.com

সাতশ সালের দিকে। তখন আসতো ব্যবসা ও ধর্ম প্রচারের জন্য তারপরে বাংলায় মুসলমানরা শাসক হিসেবে নয়শ' সালের শেষের দিকে আসে। এসময়ে স্থানীয় আচার, ব্যবহার ও সংস্কৃতি তেমন উন্নত ছিল না। মুসলমানরা সাথে করে উন্নত জীবনধারা ও শাসন ব্যবস্থা নিয়ে এলো। সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করলো। ঐক্যবদ্ধ সমাজ ব্যবস্থার ধারণা তৈরি করলো। স্থানীয় হিন্দুরাই ছিল মুসলমান শাসকদের বন্ধু ও সহযোগী।

নবাবী আমলে বাংলার প্রশাসন, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমরনীতিতে হিন্দুদের প্রভাব ছিল অপরিসীম। নবাবদের আত্মীয়স্বজনরা ছিলেন মুষ্টিমেয় কয়েকটি পদে।

ঐতিহাসিক আদর্শের মত নবাব আলীবর্দীর শাসন ব্যবস্থায় হিন্দু কর্মচারীদের ব্যাপক প্রভাব ছিল। জানকীরাম, দুর্লভ রায়, দর্প নারায়ণ, রাম নারায়ণ, কিরীট চাঁদ, উমেদ রায়, রাজবল্লভ, রামরাম সিংহ ও গোকুল চাঁদ নবাবের দরবারে উচ্চ পদে আসীন ছিলেন।

জগৎশেঠ পরিবারের প্রভাব সব-সময়েই অক্ষুণ্ন ছিল। ১৭৪৪ সালে ফতেচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁর পৌত্র মাহ্তাব চাঁদ জগৎশেঠ হন এবং খালাতো ভাই স্বরূপ চাঁদের সাথে যৌথভাবে অর্থলগ্নীর ব্যবসা শুরু করেন। পাঞ্জাবী বণিক আমীর চাঁদের সাথেও আলীবর্দীর সুসম্পর্ক ছিল। এ ছাড়াও বহু হিন্দু জমিদার ছিল বাংলার বিভিন্ন এলাকায়। এতদসত্ত্বেও স্থানীয় হিন্দু নেতারা হিন্দু রাজা ও জমিদারগণ শেষ পর্যন্ত বিশ্বস্ততার পরিচয় দেননি। নবাব আলীবর্দীর বিরুদ্ধে হিন্দুদের ধূমায়িত অসন্তোসের উল্লেখ করে কোম্পানীর ইঞ্জিনিয়ার স্কট যে গোপন রিপোর্ট দিয়েছিলেন তা ছিল নিম্নরূপ ঃ হিন্দু রাজা ও জমিদারগণ মুসলমান শাসনের অবসান চায়। স্কটের এ রিপোর্ট ছিল ১৭৫৪ সালের।

উল্লেখ্য যে, আলীবর্দীর অগেও নবাব দরবারে হিন্দুদের ব্যাপক প্রভাব ছিল? নবাব সুজাউদ্দীনের তিনজন প্রধান পরামর্শক ছিলেন। এরা হচ্ছেন-শ্যালম চাঁদ, ফতেচাঁদ (জগৎশেঠ) ও হাজী আহম্মদ। হরিনন্দ শাহ, মানিকচাঁদ ও ফতেচাঁদ ছিলেন আত্মীয়। এরা বিভিন্ন টাকশালের দায়িত্বে ছিলেন। হিন্দুরা অনেকেই সাতহাজারী মনসবদার ছিলেন।

১৭৫৪ ঢাকায় রাজবল্লভ ছিলেন দেওয়ানীর দায়িত্বে। ১৭৫৬ সালের মার্চ মাসে তহবিল তছরুপের দায়ে তাঁকে মুর্শিবাদে গ্রেপ্তার করা হয়। রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণবল্লভ অবস্থা বেগতিক দেখে আত্মরক্ষার জন্য ধনরত্নসহ সপরিবার জলপথে কলকাতা পৌঁছেছেন। ইংরেজ কোম্পানীর গভর্নর ড্রেককে ঘুষ দিয়ে কৃষ্ণবল্লভ ফোর্ট উইলিয়ামে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ১৭৫৭ সালের মে মাসের দিকে নবাব সিরাজউদ্দৌলা কাশ্মীরী যোদ্ধা মীর মদনকে নবাবী ফৌজের অধিনায়ক করেন। মোহন লাল ছিলেন কার্যতর প্রধানমন্ত্রী।

যেই সিরাজউদ্দৌলাকে নিয়ে ইংরেজ ও হিন্দু ঐতিহাসিকদের এত বিতর্ক সেই সিরাজ ১৭৪৮ সালে ১৫ বছর বয়সে প্রথম রাজনৈতিক ক্ষমতায় আসেন) আলীবর্দী খাঁ তাকে বিহারের নায়ের সুরা নিযুক্ত করেন। প্রকৃত ক্ষমতা রাখা হলো রাজা জানকী রামের হাতে।

১৭৫৬ সালের এপ্রিল মাসে সিরাজ আলীবর্দীর মৃত্যুর পর বাংলার নবাব হন। সময়টা একেবারেই সিরাজের অনুকূলে ছিল না।

www.pathagar.com

ক্ষমতাসীন হিন্দু রাজন্যবর্গ, নবাব পরিবারের সিরাজ বিরোধীরা এবং অসৎ ইংরেজ কোম্পানীর কর্মচারীরা এ সময়ে একেবারে ঐক্যবদ্ধ সিরাজকে ক্ষমতা থেকে অপসারণের জন্য। নবাব পরিবারের লোকজনের মনে ছিল স্বজনের বিরুদ্ধে হিংসা। হিন্দু রাজন্যবর্গ আর কোম্পানী কর্মচারীদের ছিল দেশের সম্পদ লুণ্ঠন করে ভাগভাগি করা। ইংরেজদের ছিল সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি আর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধা। হিন্দু রাজন্যবর্গের ছিল দেশদ্রোহিতা আর বিশ্বাসঘাতকতা। বিদেশী বেনিয়া কোম্পানীর অস ৎ, নীচ ও শঠ কর্মচারী আর দেশীয় দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল হচ্ছে পলাশীর চক্রান্ত। কিন্তু নিজেদের প্রয়োজনেই বিশ্বাসঘাতকরা ইতিহাস তৈরি করে বললো-সিরাজ ছিল দুশ্চরিত্র লম্পট আর মাতাল।

পলাশী চক্রান্তের পেছনের কথা আগেও বলেছি। আবার বলছি-প্রাচ্যের স্বর্গ বাংলাকে লুণ্ঠন করে ইংল্যান্ডকে গড়ে তোলা ছিল ইংরেজ কোম্পানীর লক্ষ্য। আর এজন্যে কোম্পানী সুযোগ খুঁজছিলো দীর্ঘ দিন ধরে। দেশের সন্তান হিন্দুরা কোম্পানীর লুটেরাদের সেই সুযোগ করে দিল।

'৫৬ সালের এপ্রিলে ক্ষমতালাভের পর সিরাজ '৫৭ জুন পর্যন্ত এই চৌদ্দ মাসে একদিন ঘুমাবার মতো সময় পাননি। তাকে একটার পর একটা ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে হয়ছে। '৫৬ সালের ২০ জুন কলকাতার দুর্গ দখল করে ১১ জুলাই মুর্শিদাবাদ ফিরে গেলেন। কলকাতার দায়িত্ব দিয়ে এলেন মানিকচাঁদের উপর। এরপর সিরাজ গেলেন শওকতজঙ্গ-এর বিদ্রোহ দমন করতে। মানিকচাঁদ গোপনে খবর পাঠালেন মাদ্রাজে ক্লাইভের কাছে। সিরাজের এখন এদিকে ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই। '৫৬ সালের ১৭ ডিসেম্বর ক্লাইভ আবার কলকাতা দখল করে নিল। মানিকচাঁদ ক্লাইভের বন্ধু হিসেবে তারই আশ্রয়ে থেকে গেলেন।

১৭৫৭ সালের ৫ জুন কলকাতায় মীরজাফরের সাথে কোম্পানীর গোপনচুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। চুক্তির শর্ত ছিল নিম্নরূপঃ

১। ফরাসীদের বাংলা থেকে তাড়াতে হবে, ২। সিরাজের কলকাতা আক্রমণের ফলে ইংরেজদের ও স্থানীয় বাসিন্দাদের যে ক্ষতি হয়েছে সেটা পূরণের জন্য মোট এক কোটি সাতাত্তর লাখ টাকা দিতে নবাব বাধ্য থাকবেন, ৩। ইংরেজ বণিকরা বাণিজ্য সংক্রান্ত যে সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছিল সেগুলো বজায় থাকবে, ৪। কলকাতায় কোম্পানীর সার্বভৌম অধিকার থাকবে, ৫। কলকাতার দক্ষিণে কুলপি পর্যন্ত ভূখণ্ডে (২৪ পরগণা) কোম্পানী জমিদারী স্বত্ব পাবে, ৬। ঢাকা ও কাশিমবাজার কুঠির নিরাপত্তার জন্য কোম্পানী ইচ্ছামতো বন্দোবস্ত করতে পারবে, ৭। হুগলী শহরের দক্ষিণে গঙ্গার নিকটে নবাব কোন নতুন দুর্গ নির্মাণ করতে পারবে না, ৮। কোম্পানী প্রয়োজন মতো নবাবকে সামরিক সাহায্য দিবে, ব্যয়ভার নির্বাহের দায়িত্ব থাকবে নবাবের। ৫ জুনের চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে ষড়যন্ত্র পাকা করার জন্য যে সভা হয়েছিল তাতে উপস্থিত ছিলেন নবাবের দরবারে কোম্পানীর প্রতিনিধি ওয়াটস নবাবের অন্যতম সেনানায়ক ইয়ার লতিফ খাঁ, জগৎশেঠ, আমিরচাঁদ। ঘসেটি বেগম মীরজাফরকে অর্থ যোগানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। ওয়াট্স এই ষড়যন্ত্র সভার কথা ক্লাইভকে জানালেন। জগৎশেঠ ইয়ার লতিফকে নবাব করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ক্লাইভ মীরজাফরের নাম প্রস্তাব করলেন। প্রথম ষড়যন্ত্র সভা অনুষ্ঠিত হয় জগৎশেঠের বাড়িতে মুর্শিদাবাদে। দ্বিতীয়

www.pathagar.com

সভা হয় কলকাতায়। এ সময় নবাব মুর্শিদাবাদে ছিলেন না। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও রাজা রাজবল্লভ মুর্শিদাবাদের সভায় উপস্থিত ছিলেন।

পলাশী যুদ্ধের কয়েকদিন আগে নবাব মীরজাফরের সাথে সমঝোতায় এলেন এবং তাকে আবার প্রধান সেনাপতির পদে নিয়োগ করলেন। এসময় নবাব ৫ জুনের কলকাতার চুক্তি ও ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারেননি। ইংরেজরা জানতো সময় ও সুযোগ পেলেই নবাব তাদেরকে বাংলা থেকে উৎখাত করবে। তাই তারা সময় নষ্ট না করে তাড়াতাড়ি যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলো। '৫৭ সালের ১৩ জুন যুদ্ধের জন্য যাত্রা করে ২২ জুন পলাশীতে উপস্থিত হলো কর্নেল ক্লাইভের সৈন্য। ক্লাইভের সাথে ২,১০০ ভারতীয় সৈন্য ১,১০০ গোরা সৈন্য। নবাবের ছিল ৫০,০০০ সৈন্য আর ৫৩টি কামান।

'৫৭ সালের ২৩ জুন ছিল বৃহস্পতিবার। যুদ্ধ শুরু হলো। ইয়ার লতিফ খাঁ, মীরজাফর আর রায়দুর্লভ নিজ নিজ সৈন্য নিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন। মীর মদন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন। মোহন লাল আহত হলেন।

ঐতিহাসিক হান্টার বলেছেন, পলাশীর ইতিহাস লেখার মতো মাল-মশলা আছে। তবে সে ইতিহাস এত বিশাল যে, কোন ব্যক্তির উদ্যোগে লেখা সম্ভব নয়। এজন্যে প্রয়োজন প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ ও সাহায্য।

আমরা বলি পলাশীর যুদ্ধ। আর সত্যান্বেষী ইংরেজ ঐতিহাসিকরা বলছেন- এটা ছিল একটা বিশ্বাসঘাতকতা আর নিম্নশ্রেণীর ষড়যন্ত্রের ফসল। ২৩৫ বছর পর আমরা পলাশীর চক্রান্তের কথা বলছি। এ চক্রান্তের বিস্তারিত ইতিহাস বাংলাদেশের মানুষের জানা উচিত।

হিন্দু জমিদার ও প্রধানগণ সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন।

-কৃষ্ণচন্দ্রের জীবন কাহিনী রচয়িতা রাজীব লোচন।

www.pathagar.com

শহীদ নবাব সিরাজউদ্দৌলা

ডঃ মুহাম্মদ ফজলুল হক

শহীদ নবাব সিরাজউদ্দৌলার ইতিহাস অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে বিবৃত করা হয়েছে। তৎকালীন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠাকল্পে এবং স্বদেশী ষড়যন্ত্রকারীদের অবস্থানকে বিপদমুক্ত করবার জন্য শহীদ নবাব সিরাজের সামগ্রিক চরিত্রকে এমনভাবে কলংকিত করা হয়েছে যে, বিগত দুইশ' বত্রিশ বছরেও প্রকৃত ইতিহাস নির্মাণ সম্ভব হয়নি। তবে, অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় ব্রিটিশ শাসন শেষে আমরা দু'বার স্বাধীনতা অর্জন করেছি, অথচ সঠিক ইতিহাস নির্মাণ ও শহীদ নবাবের আসল মূল্যায়নের প্রচেষ্টা এ পর্যন্ত হয়নি বললেই চলে। আমাদের দেশে বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে, শত শত ডিগ্রী কলেজ বর্তমান। হাজার হাজার ইতিহাসের অধ্যাপক ও গবেষক নিয়মিতভাবে কাজ করে চলছেন অথচ কারও এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেবার খবর আমরা আজও জানতে পারিনি। আমার মনে হয়, আমরা আমাদের প্রকৃত ইতিহাস উদঘাটন করতে পারলে জাতি গর্বিত হতো, এ জাতি স্বাধীনতার মূল্য বুঝতে পারতো এবং শহীদ নবাবের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারতো।

দুইশ' বত্রিশ বছর বিগত হবার পর এই প্রথমবারের মত গত বছরের ৩রা জুলাই এ দেশের প্রেসিডেন্ট শহীদ নবাবের অবদানের কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেছেন এবং শহীদানের রক্ত আমাদের চলার পথে সর্বযুগে অনুপ্রেরণা যোগাবে, স্বাধীনতা প্রতিরক্ষায় সাহস-শক্তি যোগাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। প্রেসিডেন্টের এ মূল্যায়ন জাতির জন্য পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে সিরাজউদ্দৌলা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। আলীবর্দী খাঁর জীবিতাবস্থায় তরুণ সিরাজকে বহুযুদ্ধ বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিতে হয়েছিল। সিরাজের সাহস, রণকৌশল ও বীরত্বে অগাধ বিশ্বাস ছিল বলেই নবাব আলীবর্দী খাঁ তরুণ সিরাজকে বহুবার কঠিন

www.pathagar.com

দায়িত্ব দিতে ভরসা পেয়েছিলেন।

নবাব আলীবর্দী খাঁ বিদেশী ও দেশী ষড়যন্ত্রকারীদের সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ ছিলেন এবং সিরাজকে ঐসব শত্রুদের ব্যাপারে বার বার অবহিত করে গিয়েছিলেন। এখানে স্মর্তব্য যে বৃটিশ, ফরাসী, ডাচ ও পর্তুগীজ নাবিকরা এদেশে ব্যবসার অজুহাতে এসে এখানে দুর্গ নির্মাণ, সৈন্য সংগ্রহ, ষড়যন্ত্র ও অবৈধ ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত হয়ে এদেশকে শোষণ করবার জন্য রাজনৈতিক শক্তি ও দেশ পরিচালনার ক্ষমতা অর্জনের জন্য নানান অপকৌশল ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ঠিক ঐ সময়ে রাজ্যের ঐ দুর্দিনের সন্ধিক্ষণে সিরাজউদ্দৌলা নবাবের মসনদে আরোহণ করেই সম্ভাব্য সর্বদিক থেকেই ষড়যন্ত্র ও শত্রুতার মুখোমুখি হন।

প্রথমত. ঘষেটি বেগম সিরাজের নবাবিত্ব সহ্য করতে না পেরে নবাবকে উৎখাত করবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন।

দ্বিতীয়ত. বেশ কয়েকজন অমুসলমান ও মুসলমান উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা, সিরাজের মতো সাহসী ও বলিষ্ঠ শাসনকর্তার পরিবর্তে একজন দুর্বল নবাবকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করবার মানসে নানা রকম দুরভিসন্ধির আশ্রয় গ্রহণ করে।

তৃতীয়ত. বৃটিশ ও ফরাসী তথাকথিত নাবিক ও ব্যবসায়ীরা অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক শক্তি হাসিলের জন্য দেশীয় বিশ্বাসঘাতকদের সাথে নানাভাবে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

চতুর্থত. আহাম্মদ শাহ আবদালীর হুমকি তরুণ নবাব সিরাজকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে রেখেছিল। নবাব আলীবর্দী খাঁ আশি বছর বয়সে ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১০ এপ্রিল পরলোক গমন করেন। তার চারদিন পর অর্থাৎ ১৫ এপ্রিল মীর্জা মোহাম্মদ সিরাজউদ্দৌলা বাংলা বিহার উড়িষ্যার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

জেড হলওয়েলের বিবরণ থেকে জানা যায়, নবাব আলীবর্দী খাঁ-এর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে সিরাজকে উপদেশ দেন, ইউরোপের বণিকদের শক্তি ও প্রতিপত্তি সম্পর্কে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। আল্লাহ আমাকে আরও কিছুদিন বেঁচে থাকার সুযোগ দিলে আমি এই ভয় থেকে তোমাকে মুক্ত করে যেতে পারতাম। এখন এই দায়িত্ব তোমার।

সিংহাসনে আরোহণের পর অল্পদিনের মধ্যেই নবাব সিরাজ কঠোর হস্তে ঘরের শত্রু দমন করেন এবং শাসন ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করেন। অতঃপর দেশপ্রেমিক সিরাজ বিদেশী শত্রু দমনের জন্য অস্থির হয়ে ওঠেন। এ পর্যায়ে তিনি ফরাসী বণিকদের সাহায্যে ইংরেজ শত্রুদের সমূলে ধ্বংস করবার প্রস্তুতি নেন। পর পর কয়েকবার নিজে যুদ্ধ পরিচালনা করে কাশিমবাজার কুঠি, চন্দননগর কুঠি, এমনকি কোলকাতাকে ইংরেজদের হাত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করেন।

১৭৫৬ সালের ১৫ এপ্রিল থেকে ১৭৫৭ সালের ২৩ শে জুন পর্যন্ত অর্থাৎ সিরাজ শাসনের এই চৌদ্দ মাস সাত দিনের দিনপঞ্জী পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, নবাব সিরাজ প্রতিটি দিন শাসনকার্য সুসংগঠন, শত্রু ও ষড়যন্ত্র দমন, ফরাসী বণিকদের সঙ্গে সমঝোতা রক্ষণ ও ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি অতিব্যস্ত ও চিন্তিত সময় কাটিয়েছেন।

এ ধরনের রাজকীয় ব্যস্ততা ও দুশ্চিন্তার মাঝে তার ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কিংবা বিলাসিতার সময় আসলো কোত্থেকে? অথচ, বৃটিশ আমলের ঐতিহাসিকগণ সিরাজের ব্যক্তিগত চরিত্রকে ঘৃণ্য ও জঘন্য হিসাবে চিত্রায়িত করতে দ্বিধাবোধ করেনি।

www.pathagar.com

শুধু বৃটিশ নয়, হিন্দু ও মুসলমান অল্পশিক্ষিত তথাকথিত ঐতিহাসিকগণও দু'শ' বছর ধরে নবাব সিরাজকে অন্যায়, অত্যাচার, বিলাসী, লোভী এমন কি দুশ্চরিত্র দুর্বল নবাব হিসেবে প্রমাণিত করার প্রয়াস পেয়েছে। অথচ কিছু কিছু ফরাসী পর্যটক, বণিক, গভর্নর ও ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় সিরাজ চরিত্রের প্রকৃত রূপের বর্ণনা আছে। তাঁদের বর্ণনা একত্র করে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সিরাজ রাজনৈতিক চরিত্রে অত্যন্ত সাহসী ও সূক্ষ্ম, কূটনীতিবিদ এবং ব্যক্তি চরিত্রে সহজ-সরল ও বলিষ্ঠ নবাব ছিলেন।

তিনি স্ত্রী বেগম লুৎফুন্নেসাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। আবার শত্রুপক্ষের সঙ্গে মোকাবিলায় অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। তিনি শাসনকার্য পরিচালনায় দক্ষতার বহু স্বাক্ষরও রেখে গিয়েছেন। সিরাজ মাতা আমিনা বেগম ও স্ত্রী লুৎফুন্নেসা বেগম উভয়েই দানশীলতা, ক্ষমতা প্রদর্শন ও দরিদ্র সেবার জন্য সুখ্যাতি অর্জন করেন।

দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য নবাব সিরাজকে জীবন বিসর্জন দিতে হয়েছে। ইচ্ছে করলে তরুণ নবাব বৃটিশ বণিকদের বাণিজ্য সুবিধা কিছুটা বৃদ্ধি করে এবং তাদের ঔদ্ধত্য সহ্য করে বহু যুগ শান্তিতে নবাবী করে যেতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসার নিদর্শনস্বরূপ তিনি সব শত্রুকে চিহ্নিত করে তাদের চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেশের স্বাধীনতাকে মজবুত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তা পারেননি। আমাদের ইতিহাস বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস ও আমরা ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি না। আমরা আজও আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম শহীদ নবাব সিরাজকে তাঁর উপযুক্ত মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারিনি। আজও আমরা আমাদের সঠিক ইতিহাস জানবার চেষ্টা করি না। তৎকালীন ফরাসী, বণিক, পর্যটক ও ঐতিহাসিকদের বর্ণনা যোগাড় করিনি। এমন কি, তেমন কোন ঐতিহাসিক গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করিনি। জাতি হিসেবে আমাদের জাতীয় ইতিহাস উদ্ধারের এই ব্যর্থতা আমাদেরকে পরনির্ভর করে তুলেছে। অসহায় জাতির আত্মা এ জন্য ছটফট করে উঠে অহরহ। অথচ আমরা যারা তথাকথিত শিক্ষিত, জাতির এ নৈতিক চাহিদা পূরণে তাদের যেন কোন চিন্তা নেই, বিকার নেই, অবসর নেই। আমরা যেন ভুলেই গেছি যে, নবাব সিরাজউদ্দৌলা প্রাণপ্রিয় স্ত্রী বেগম লুৎফুন্নেসাসহ পরিবারের অন্যান্যের সঙ্গে প্রায় পাঁচ বছরকাল ঢাকায় বুড়ীগঙ্গার অপর তীরে জিঞ্জিরায় বসবাস করেছেন। সে বাড়ীটা এখনও বিদ্যমান। ১৭৬২ সালে ইংরেজদের হাতে ধরা পড়লে তাঁকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করা হয়। তাঁকে সেখানে একটা বাড়ী ও মাসিক মাসোহারা দেওয়া হয়।

বেগম লুৎফুন্নেসা খোশবাগে সিরাজের কবরের কাছে একখানি কুঁড়েঘর তৈরী করে বাকী জীবনটা সেখানেই কাটিয়ে দেন। কতবড় বিদূষী ও মহিয়সী নারী হলে জীবনের সব লোভ ও আয়েশ পরিত্যাগ করে তিনি জীবনের বেশীর ভাগ সময় প্রাণাধিক প্রিয় স্বামী সিরাজের ধ্যান করেই কাটিয়ে দেন।

তিনি প্রতিদিন নিয়মিত কবরের পাশে বসে কোরআন শরীফ পড়তেন এবং মাসিক যে মাসোহারা পেতেন তা দিয়ে প্রতিদিন কাঙ্গালী ভোজের ব্যবস্থা করতেন। বেগম লুৎফুন্নেসা সুদীর্ঘ আটাশ বছর ধরে এভাবে স্বামীসেবা করে ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসে পরলোকগমন করেন এবং সিরাজের পদতলে সমাধিস্থ হন। বেগম লুৎফুন্নেসার এ একনিষ্ঠ প্রেম-ভালোবাসা ও ত্যাগ বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বকালে সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবে। আর এ ইতিহাস কি সিরাজ চরিত্রের পবিত্র গুণাবলীর স্বাক্ষর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে না?

www.pathagar.com

আমাদের ইতিহাসে পলাশীর প্রভাব

মুন্‌শী আবদুল মাননান

পলাশী যুদ্ধ ইতিহাসের মোড় পরিবর্তনকারী একটি যুদ্ধ। এই যুদ্ধ বিশেষভাবে বাংলার সামগ্রিকভাবে গোটা ভারতের দীর্ঘ সাড়ে ৫শ' বছরের মুসলিম শাসন ও আধিপত্যের অবসান সূচিত করে। পলাশী যুদ্ধের পর ১৯৬৪ সালে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে মীর কাসিম সুজাউদ্দৌলাহ এবং সম্রাট শাহ আলমের যৌথ বাহিনীর বিজয় ঘটলে ইতিহাস হয়তো তার মূল ধারায় প্রত্যাবর্তন করতে পারতো। কিন্তু এই যুদ্ধে যৌথ বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় গোটা ভারতে মুসলমানদের পরাজয় তথা মুসলিম শাসনের অবসানকে ত্বরান্বিত করে। তাই পলাশী যুদ্ধকে নিছক নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় বা পতন এবং ইংরেজের বিজয় বা উত্থান হিসাবে বিবেচনা করার কোনো অবকাশ নেই। এটি ছিল এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ যার মধ্যদিয়ে ক্ষমতার হাত বদল ঘটে একটি রাজশক্তির ওপর আর একটি রাজশক্তির বিজয় ঘোষিত হয়। আর এর পরবর্তী ধারাবাহিকতায় সর্বদিক থেকে উন্নত ও সমৃদ্ধ বিজিত জাতির সার্বিক বিপর্যয় সাধিত হয়। একটি সমৃদ্ধ সভ্যতার ধ্বংসস্তূপের ওপর আর একটি সভ্যতার সৌধ গড়ে ওঠে।

এই যে পরিবর্তন তার শোচনীয় শিকার হয় ভারতের বিশেষ করে, বাংলার মুসলমানেরা। ইংরেজের রাজ্য বা শাসন প্রতিষ্ঠার আগে বাংলা ও ভারতের একমাত্র শাসক ছিল মুসলমানরা। স্বভাবতই রাষ্ট্র এবং রাজনীতির ক্ষমতা কেন্দ্রের তারাই ছিল সর্বস্রষ্টা। অর্থনৈতিক, সামাজিক, সামরিক, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ছিল তাদের আধিপত্য। কিন্তু ইংরেজ শাসনের এক শতাব্দীকালের মধ্যে তারা রাষ্ট্রক্ষমতা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয়। নিরবচ্ছিন্ন অর্থনৈতিক

www.pathagar.com

শোষণ ও পীড়নে সীমাহীন দারিদ্র্যের কবলে পতিত হয়। সামাজিক ক্ষেত্রে হয়ে পড়ে অবনত ও অপাংক্তেয়। সামরিক আধিপত্য ও শক্তি নিঃশেষিত হয়। নিরক্ষরতার অভিশাপ চেপে বসে। সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে কুসংস্কারের ব্যাপক বিস্তার ঘটে এবং নিজস্ব স্বতন্ত্র বিলোপের অবসান ঘটিয়ে এনে উপনীত হয়। এক সুসভ্য ও সম্ভ্রান্ত জাতির সার্বিক ক্ষেত্রে এহেন মহাবিপর্যয় বিশ্ব ইতিহাসে খুব বেশী একটা খুঁজে পাওয়া যায় না।

পলাশী যুদ্ধ এই বাংলাতেই সংঘটিত হয়েছিল এবং এই যুদ্ধের সুদূরপ্রসারী বিরূপ প্রতিক্রিয়া বাংলাতেই সবচেয়ে বেশী পড়েছিল। পলাশী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলার রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক ক্ষমতা কার্যত মুসলমানদের হাত থেকে ইংরেজদের হাতে চলে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতাও তাদের হাতে চলে যায়। এই চতুর্বিদ ক্ষমতার অপব্যবহারের মধ্য দিয়ে সামাজক, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে মুসলিম জাতিকে রীতিমত একটি পতিত জাতিতে পরিণত করা হয়। প্রসঙ্গত বলা দরকার এই প্রক্রিয়ায় প্রতিবেশী হিন্দু সমাজ ও সম্প্রদায় ছিল তাদের নব্য প্রভু ইংরেজের একনিষ্ঠ সহযোগী।

পলাশী যুদ্ধের পরে বাংলার মুসলিম জাতি সমাজ ও সম্প্রদায়ের ওপর যে সর্বগ্রাসী বিপর্যয় নেমে আসে তার বিস্তারিত বিবরণ ক্ষুদ্রকায় কোনো নিবন্ধে দেয়া সম্ভব নয়। কিছুটা ধারণা দেয়া যায় মাত্র।

(এক)

পলাশী যুদ্ধের পর বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। নবাব মীরজাফর পরিণত হন ইংরেজের হাতের পুতুল। বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। ১৭৬৫ সালে বাংলার দেওয়ানী লাভের মধ্যদিয়ে ইংরেজের অষ্টক্ষেত্রক সার্বভৌমত্বও প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়সীমার মধ্যে চলে ব্যাপক সম্পদ লুণ্ঠন ও শোষণ। পরবর্তীতে এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। ঐতিহাসিকরা মোটামুটি হিসেব ধরে বলেছেন, ১৭৫৭ থেকে ১৭৮০ পর্যন্ত মাত্র ২৩ বছর বাংলা থেকে ইংল্যান্ডে পাচার হয়ে যায় প্রায় ৩ কোটি ৮০ লাখ পাউন্ড। সমকালীন মূল্যে ৬০ কোটি টাকা। বিভিন্ন ঐতিহাসিকের তথ্য থেকে জানা যায়, ইংরেজকে খুশী করার জন্যে পুতুল নবাব ৬ জন ইংরেজ কর্মচারীকে ১ লাখ ৫০ হাজার পাউন্ড প্রদান করেন। তার কাছ থেকে লর্ড ক্লাইভ লাভ করেন ব্যক্তিগতভাবে ২ লাখ ৩৪ হাজার পাউন্ড। কলিকাতা কাউন্সিলের অন্যান্য সদস্যরা প্রত্যেকে ৫০ থেকে ৮০ হাজার পাউন্ড লাভ করেন। এ ছাড়া কোম্পানীর ও কলিকাতার অধিবাসীদের ক্ষতিপূরণ ও ইংরেজ সৈন্যের ব্যয় বাবদ কোম্পানী তার কাছ থেকে প্রায় ২৫ লাখ ৩১ হাজার পাউন্ড লাভ করে। পরবর্তীতে নবাব ও নবাব পরিবারের কাছ থেকে কোম্পানী ও তার কর্মচারীরা আরও অর্থ লাভ করে। ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৫ সাল পর্যন্ত সময়ে নবাবদের প্রদত্ত মোট অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ১ কোটি ৭৩ লাখ ১ হাজার ৬শ' ৮৩ পাউন্ড। ১৭৬৫ সালে মীরজাফরের মৃত্যু হলে তার পুত্র নজমুদৌলাহ মসনদ লাভের জন্য কোম্পানীর কর্মচারীদের ৮ লাখ ৭৫ হাজার টাকা এবং রেজা খান নায়েবে নাজিম নিযুক্ত হওয়ার জন্যে আর ২ লাখ ৭৫

www.pathagar.com

হাজার টাকা প্রদান করেন।

দেওয়ানী লাভের পর কৃষকদের নজিরবিহীন শোষণের শিকারে পরিণত হতে হয়। একদিকে ভূমিকর যথেচ্ছভাবে আদায়ের ব্যবস্থা নেয়া হয়। অন্যদিকে কৃষিপণ্য জোরপূর্বক নাম মাত্র দামে কিনে তাদের নির্বিচারে ঠকানোর পথ করা হয়। ঐ সময় শিল্পের ক্ষেত্রে বাংলা বিশ্বের দেশসমূহের মধ্যে অগ্রবর্তী সারিতে ছিল। শিল্প পণ্য বিশেষ করে বিশ্ব বিখ্যাত মসলিনসহ সুতী বস্ত্রের ব্যাপক বাজার ছিল বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। এই সমৃদ্ধ শিল্পকে ধ্বংস সাধন করা হয় অবিশ্বাস্য কম সময়ের মধ্যে। ভূমি রাজস্ব আদায় ও কৃষিপণ্য ক্রয়ের জন্যে নব্য দালাল, গোমস্তা, বেনিয়া গোষ্ঠীকে নিয়োজিত করা হয়। এরা তাদের ইচ্ছেমত ভূমি রাজস্ব আদায়ে স্বাধীনতা ভোগ করতো। শুধু ভূমি রাজস্বই বা কেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন নতুন কর আরোপ করেও এরা প্রজাসাধারণকে শোষণ করতো। উল্লেখ করা যেতে পারে, যে বছর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব লাভ করে সেই ১৭৬৫-৬৬ সালেই তারা প্রায় দ্বিগুণ রাজস্ব আদায় করে, যার পরিমাণ ২ কোটি ২০ লাখ টাকা। এ থেকেই অনুধাবন করা যায় পরবর্তীকালে পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। অনুরূপভাবে কৃষি পণ্য বিশেষত স্থানীয় শিল্পের কাঁচামাল তুলা ও রেশম অকল্পনীয় নিম্নমূল্যে একচেটিয়াভাবে কিনে নিয়ে বস্ত্র ও রেশম শিল্পের ধ্বংস সাধন করা হয় এবং এ দেশের তুলনায় গড়ে তোলা হয় ম্যানচেস্টারের বস্ত্র শিল্প। শিল্পের কারিগরদের ওপরও অপরিসীম জুলুম করা হয়, এমন কি তারা যাতে পণ্য উৎপাদন করতে না পারে সে জন্য তাদের হাতের আঙুল পর্যন্ত কেটে দেয়া হয়। এই শোষণ ও নিষ্ঠুরতার মধ্যদিয়ে পণ্য রফতানীকারী দেশে বাংলা বিলেতী পণ্যের অবাধ ও স্থায়ী বাজারে পরিণত হয়। কৃষক শিল্প মালিক ও কারিগররা দারিদ্র্য ও বিপর্যয়ের চরমে এসে উপনীত হয়। এই প্রেক্ষাপটেই নেমে আসে ১৭৭০-৭১ সালের মহা-দুর্ভিক্ষ। দুর্ভিক্ষে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ লোক মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করে। এই দুর্ভিক্ষ ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ও তার এ দেশীয় দালাল, গোমস্তা ও বণিক শ্রেণীর সৃষ্টি। এদের ষড়যন্ত্র, শোষণ ও নিষ্ঠুরতা কোন্ পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল ঐ বছর রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ তারই প্রমাণ বহন করে। তথ্য পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, ঐ বছর রাজস্ব আদায় পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় অনেক বেশী হয়েছিল।

মহা দুর্ভিক্ষে এত মানুষ মৃত্যুবরণ করেছিল এবং এত অত্যাচারের ভয়ে পাহাড়-জঙ্গল ও অন্যত্র পালিয়ে গিয়েছিল যে, বাংলার এক-তৃতীয়াংশ জমি পতিত জমিতে পরিণত হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে রাজস্ব কমে যাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী রাজস্ব হ্রাস মেনে নিতে রাজি ছিল। কিভাবে জমি থেকে আয় বাড়ানো যায় তার জন্যে কোম্পানী কর্তারা তৎপর হয়ে ওঠেন যার ফল নতুন ভূমি বন্দোবস্তের ব্যবস্থা। প্রথমে ইজারা চুক্তিভিত্তিক ব্যবস্থা এবং পরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনা। নতুন ভূমি ব্যবস্থায় ভূমিতে প্রজার বদলে জমিদারের স্বত্ব-স্বামিত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়। নতুন ব্যবস্থায় জমিদারী কেনার মত অবস্থা মুসলমানদের ছিল না। পূর্বে যে সব মুসলমান জমিদার ছিল তাদের অধিকাংশের আর্থিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত নাজুক। সূর্যাস্ত আইনের মাধ্যমে বিশেষভাবে মুসলমান জমিদাররাই জমিদারী হারাতে বাধ্য হয়। কোম্পানীর দালালী গোমস্তাগিরি ফড়িয়াগিরি ও মজুদদারি করে হিন্দু সম্প্রদায়ের যারা সে সময় অর্থ সঞ্চয় করেছিল তারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুযোগ নিয়ে

www.pathagar.com

জমিদার হয়ে বসে।

দেখা যায়, কোম্পানী শাসনের ৬০ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে বাংলার কৃষি শিল্প ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। স্বয়ংসম্পন্ন গ্রামগুলো ছারখার হয়ে গেছে। সাধারণ মানুষ যাদের অধিকাংশই ছিল মুসলমান পরিণত হয়েছে ভূমি ও শ্রমদাসে। এককালের সম্ভ্রান্ত মুসলমান জমিদার ভূস্বামীদের অধিকাংশই পরিণত হয়েছে হতদরিদ্র শ্রেণীতে।

(দুই)

মুসলিম শাসনামলে রাষ্ট্রীয় চাকরির বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলমানদের আধিপত্য ছিল সঙ্গত কারণেই। বাংলার ১৬শ' ৬০টি পরগনায় আমীন, আলিম, কারকুন, খাজাঞ্চি, কানুনগো প্রভৃতি পদে হাজার হাজার মুসলমান চাকরি করতো। এর নিম্নস্তরের পদগুলোতে কাজ করতো হিন্দুরা। বিচার বিভাগীয় সকল গুরুত্বপূর্ণ পদে অর্থাৎ কাজী, মুফতি, মীর ই আদল পদে মুসলমানরাই ছিল একচেটিয়া। অন্যদিকে সামরিক বাহিনীর চাকরিতেও মুসলমানদের প্রাধান্য ছিল। দেখা যায় ইংরেজ শাসন কায়েমের প্রথম সুযোগেই নবাবের সৈন্যবাহিনীর ৮০ হাজার সৈন্যকে একবার বরখাস্ত করা হয়। এর মধ্যদিয়ে মুসলমানদের সামরিক শক্তি ও ক্ষমতা চিরদিনের মতই খর্ব করে দেয়া হয়। অন্যান্য চাকরির ক্ষেত্রে মুসলমানরা প্রায় শূন্যের কোঠায় এসে যায় ১শ' বছরের মধ্যেই। চাকরির ওপর সবচেয়ে বড় আঘাত করা হয় ফারসীর পরিবর্তে ইংরেজীকে রাজভাষা করার মধ্য দিয়ে। এর ফলে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে হাজার হাজার মুসলমান চাকরিজীবী চাকরি হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। এদের স্থান দখল করে নেয় ইংরেজী শিক্ষিত নব্য সৃষ্ট হিন্দু শ্রেণীটি। কোম্পানী ধীরে ধীরে প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে বা নতুন প্রশাসন গড়ে তোলে, যে বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে, তাতে ইংরেজ ও হিন্দু যুগপৎভাবে অধিষ্ঠিত হয়। আর এর মধ্য দিয়ে মুসলিম মধ্যবিত্ত চাকরিজীবী শ্রেণীর অপমৃত্যু ঘটে।

(তিন)

বিদ্যা শিক্ষাকে মুসলমানেরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় দায়িত্ব বলে মনে করে। সঙ্গত কারণেই সুদীর্ঘ মুসলিম শাসনে শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি মজবুত ভিত্ এবং ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল। ধর্মীয় ও ব্যবহারিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সম্ভবত বাংলার কোনো মানুষেরই অশিক্ষিত ও নিরক্ষর থাকার কোনো সুযোগ ছিল না। ম্যাক্স মুলার উল্লেখ করেছেন, ইংরেজের ক্ষমতা দখলকালে বাংলায় ৮০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল। প্রতি ৪ জনের জন্য ছিল একটি মাদ্রাসা। এ থেকেই অনুমান করা যায় কোনো নাগরিকের অশিক্ষিত বা নিরক্ষর থাকা সম্ভব ছিল কি না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনায় মুসলিম শাসকগণ একটি বিশেষ ব্যবস্থা বরাবরই অনুসরণ করে গেছেন। তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য লাখেরাজ সম্পত্তি প্রদান করতেন। যার আয় থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর নির্মাণ সংস্কার পরিচালনা এবং শিক্ষকদের বেতন-ভাতার ব্যয় মিটানো হতো। অনুরূপভাবে মসজিদ খানকাহ্ ইত্যাদি চালানো এবং বিভিন্ন প্রকার জনহিতকর কাজ করার জন্য সম্পত্তি প্রদান হতো। কিন্তু দুষ্টচক্র ইংরেজ শুরুতেই এই লাখেরাজ ও

www.pathagar.com

নিষ্কর জমি বাজেয়াপ্ত করে নেয়। জানা যায়, ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার সময় বাঙলার মোট ভূমির এক-চতুর্থাংশই ছিল লাখেরাজ বা নিষ্কর। এই বাজেয়াপ্তির ফলে ঐসব সম্পত্তির ওপর নির্ভরশীল হাজার হাজার মানুষ রাতারাতি আয়-রোজগারহীন হয়ে পড়ে এবং শিক্ষা ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলো দিনে দিনে ধ্বংস হয়ে যায়।

মুসলমানরা শুধু ধনে নয়, মানে নয়, শিক্ষায়ও মারা পড়ে। দেশের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা ব্যবস্থা ও পাঠ্যক্রমের ধ্বংসস্তূপের ওপর ইংরেজরা যে নব্য শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করে, যে পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করে, তার লক্ষ্য ছিল এমন একটি শিক্ষিত সমাজ গড়ে তোলা যারা শাসক ও শাসিতের মধ্যে দোভাষীর কাজ করবে। তারা রক্ত মাংসে ও গড়নে ভারতীয় হবে বটে তবে রুচি মতামত ও বুদ্ধির দিক থেকে হবে খাঁটি ইংরেজ। স্বভাবতই এই ষড়যন্ত্রমূলক ও ক্ষতিকর শিক্ষানীতি ও ব্যবস্থায় শিক্ষা গ্রহণ করতে মুসলমানরা অস্বীকার করে। তারা ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ ও ইংরেজ পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাওয়া বর্জন করে। পক্ষান্তরে প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায় মনে-প্রাণে এই শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং কালক্রমে রুচি মতামত ও বুদ্ধির দিক থেকে খাঁটি ইংরেজ ধরনের শিক্ষিত শ্রেণীর উদ্ভব হয় যারা ইংরেজী সেবায় নিজেদের একনিষ্ঠভাবে নিবেদন করে। শিক্ষা ক্ষেত্রে অর্থাভাব, পৃষ্ঠপোষকতা এবং অন্যান্য কারণে মুসলমানেরা প্রয়োজনীয় বিদ্যাশিক্ষা থেকেই বঞ্চিত হয় না, কাল প্রবাহে কার্যত একটি নিরক্ষর জাতিতেও পরিণত হয়।

(চার)

রাষ্ট্র, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক চাকরি, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে এহেন বিপর্যয়ের সার্বিক প্রতিক্রিয়া সমাজ দেহে, ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভয়াবহভাবে প্রতিফলিত হয়। সমাজ ধর্ম সংস্কৃতি বিভিন্ন অপপ্রভাব ও কুসংস্কারের আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়। একটি সমৃদ্ধ ও উন্নত জাতি সমাজ ও সম্প্রদায় কোম্পানী শাসনের ১শ' বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরু বা অবস্থানে এসে উপনীত হয়।

প্রসঙ্গত বলা আবশ্যক যে, সীমাহীন অত্যাচার, শোষণ পীড়ন বিপদ ও বিপর্যয়ের মধ্যেও এদেশের মুসলমানরা হৃদয়ের অতল গহীনে জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও অহং বংশ পরম্পরায় পালন করে এসেছে। তারা একদিনের জন্যে ইংরেজ শাসন মেনে নিতে পারেনি। যখনই সুযোগ এসেছে তখনই মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে এবং দেশের স্বাধীনতার সশস্ত্র লড়াইয়ের বিশাল অধ্যায়টির দিকে যদি আমরা তাকাই দেখতে পাবো মুসলমানদের মৃতপ্রায় দেহের মধ্যেও প্রাণের অবিনাশী বিদ্যুৎ ঝলক আলোক ছড়াচ্ছে। সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলনগুলোর দিকে তাকালেও একই দৃশ্য দেখতে পাবো। আসলে মুসলমানদের সব যুদ্ধ, আন্দোলন ও সংগ্রাম একই লক্ষ্যে অর্থাৎ স্বাধীনতার লক্ষ্যে স্বতন্ত্র রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছে। বাংলার মুসলমানেরা যে এখনও মুসলমান রয়েছে এবং সাবেক বাংলার একাংশে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে জাতীয় গৌরব ও ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছে তা এ কারণেই।

www.pathagar.com

বাংলায় পলাশী যুদ্ধোত্তর লুণ্ঠন

খন্দকার হাসনাত করিম

বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে সর্বনাশের দিনটি ছিলো প্রথম বৃটিশ জাহাজের নোঙর করার দিনটি। বৃটেন থেকে বণিকরা এসেছিলো বাংলায় বাণিজ্য করতে। কিন্তু বাণিজ্য নয়, সবুজ এই দেশটি গ্রাস করার মতলবেই তারা নোঙর করেছিলো এই ঘাটে। রাজ্য দখলের অভিপ্রায় নিয়েই ক্লাইভ যুদ্ধের আয়োজন করে। ১৭৫৭ সালে রাক্ষুসী পলাশীর প্রান্তরে দেশীয় পুঁজিপতি শ্রেণীর চক্রান্তে ও ক্ষমতালোভী সেনা কর্মকর্তাদের সহায়তায় বাংলার উপর সহজ বিজয় সাধন করে বৃটিশ কোম্পানী। পলাশীর শোচনীয় ভাগ্য বিপর্যয়ের পর আট বছর এ দেশে প্রতিষ্ঠিত থাকে কুখ্যাত কোম্পানীর শাসন। ১৭৬৫ সালের দেওয়ানী লাভের পর তারা পরিণত হয় বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার ভাগ্যবিধাতা। কোম্পানীর দেওয়ানী বলবৎ থাকে ১৭৬৫ থেকে ১৮৫৭ সালের প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম পর্যন্ত। এই কোম্পানীর আমল থাকাকালেই রাজশক্তির হাতবদল ঘটে। স্বাধীন ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হয় বৃটেনের মহারাণীর শাসন। ১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং অ্যাক্টের উদ্দেশ্যই ছিলো বণিক কোম্পানীর শাসনে এদেশ হয়েছে লুণ্ঠিত আর মহারাণীর শাসনে লুণ্ঠিত উপনিবেশে প্রতিষ্ঠিত হয় এক চরম উৎপীড়ক রাজকীয় সরকার, রাজস্বই ছিলো যাদের রাজত্বের একমাত্র উদ্দেশ্য।

লর্ড মেকলে তার বিখ্যাত 'Essay on lord clive' গ্রন্থে দেখিয়েছেন, '.... কোম্পানীর কর্মচারীরা এদেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ক্ষেত্রে নিজেদের একচেটিয়া প্রতিষ্ঠা করে। দেশীয় লোকদের তারা দেশীয় উৎপাদিত দ্রব্য অল্পদামে ও বৃটিশ পণ্যসামগ্রী বেশি দামে ক্রয় করতে বাধ্য করতো। কোম্পানীর আশ্রয়ে প্রতিপালিত দেশীয় কর্মচারীরা সমগ্র দেশে সৃষ্টি করেছিলো শোষণ ও অত্যাচারের ভয়াবহ বিভীষিকা।

www.pathagar.com

কোলকাতায় ধন-সম্পদের পাহাড় তৈরি হলো; অপরদিকে তিন কোটি মানুষ দুর্দশার শেষ স্তরে উপনীত হলো। বাংলার মানুষ শোষণ ও উৎপীড়ন তারা কোনদিন দেখেনি।'

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এদেশের কৃষক রাজস্ব দিয়ে এসেছে শস্য দিয়ে। শস্য দিয়ে কর শোধ করার সুবিধার্থে মোঘল জামানায় ফসলী সন বা বাংলা বর্ষ গণনা পর্যন্ত শুরু হয়।

কিন্তু বৃটেনের লুটেরা বেনিয়ারা শস্যের পরিবর্তে রাজস্ব পরিশোধে মুদ্রা ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। এদিন থেকেই বাংলার ভাগ্যাহত কৃষকের সর্বনাশের শেষ ট্র্যাজেডি শুরু হয়। কৃষককে কর দিতে হবে মুদ্রায়। তাই তারা শস্য বিক্রি করতে শুরু করলো। তখনকার দিনে মূলধন একমাত্র কোম্পানীরই হাতে। তার দেশের সর্বত্র খুলতে লাগলো শস্য ক্রয়কেন্দ্র। এই খাদ্যশস্য গুদামজাত করেই ইংরেজ জাতির দেশে কৃত্রিম খাদ্য সংকট সৃষ্টি করে-যার সবচেয়ে বড় আঘাতটি আসে ছিয়াত্তরের মহামন্বন্তরে। এই মন্বন্তরকে স্থায়ী রূপ দিতেই আনা হয় সর্বনাশা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। শাসকের জাতি মুসলমানদেরকে নিঃস্ব, রিক্ত প্রজা বানিয়ে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলাই ছিলো ইংরেজ শাসক ও নব্য হিন্দু জমিদারদের একমাত্র উদ্দেশ্য। ইংরেজ শাসনের সর্বনাশা প্রতিক্রিয়ার ফলে শুধু এদেশের কৃষক বা কৃষি ব্যবস্থার ধ্বংসই হয়নি- সাথে বিনাশ সাধিত হয় এদেশের শিল্প উৎপাদনের। ইংরেজদের শাসন ছত্রতলে নব্য জমিদার হিন্দুরা ছিলো একই সাথে জমিদার ও লগ্নিদার সুদী মহাজন। আর রাজ্যহারা মুসলমানেরা ছিলো কৃষক প্রজা। এদেশে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার সংঘাতের পিছনে সামাজিক বা রাজনৈতিক পটভূমিকায় রয়েছে শাসক ও শাসিতের এই যুগদ্বন্দ্ব। মুসলমানেরা যখন শাসন করেছেন দেশ, এদেশের উৎপাদন ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় তখন আনুপাতিক সামাজিক ভারসাম্য এত স্থিতিশীল ছিলো যে, ভারতের মুঘল জামানাকে ঐতিহাসিকেরা পৃথিবীর প্রথম রেনেসাঁ বলে আখ্যা দিয়েছেন। প্রজা সাধারণ হিন্দু সমাজ বৃটিশ করুণার দৌলতে শাসন ক্ষমতা বা জমিদারী হাতিয়ে নিয়েই শুরু করে চরম মুসলিম নিপীড়ন এবং নিষ্ঠুর রাজস্ব নীতি। মুসলিম জামানার সমুদয় নিষ্কর জমি বৃটিশ জামানায় হিন্দু জমিদারদের হাতে শোষণের কসাইখানায় পরিণত হয়। এই উৎপীড়ক জমিদার মহাজন শ্রেণীর পুরোধা ছিলেন রাজা রামমোহন, দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং এমনি আরো অনেকে। প্রজা নিপীড়নের নিষ্ঠুর বিলেতী নীতির বিরোধিতা দূরে থাক, তারা উপরন্তু মুসলিম কৃষক শ্রেণীর উপর অত্যাচারের স্টিমরোলার চাপিয়ে দেবার কাজে নীলকর সাহেবদের সক্রিয় সাহায্য করেন। নীলকররা যখন কৃষকের মুখের গ্রাস হরণ করে বেনিয়াদের জাহাজে আগত ইংলিশ মিলের কাপড় তখন বাংলার ঐতিহ্যবাহী চারুকারু ও হস্তশিল্প (বয়ন শিল্প) কারিগরদের মুখের গ্রাস হরণ করে।

মুসলিম আমলের বাংলায় বাণিজ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিলো শিল্প পণ্য রপ্তানি। এক কপর্দকও আমদানি করতে হয়নি বাংলাকে। আর আজ বাংলাদেশ যা রপ্তানি করে আমদানি করে তার আড়াই থেকে তিনগুণ। চোরাচালানীর হিসাব ধরলে, বাংলাদেশ যা বেঁচে, কিনে আনে তার চার-পাঁচগুণ। এদেশে ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব এক হাজার বছরের পশ্চাদপদতার অভিশাপ বয়ে আনে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাংলার প্রধান রপ্তানি পণ্য ছিলো কার্পাস ও রেশম। 'বালেশ্বর থেকে বাকেরগঞ্জ কিংবা মালদা থেকে ঢাকা বাংলার সর্বত্র ছড়িয়ে ছিলো কার্পাসের আড়ত। এসব আড়তে তৈরী হতো মোটা

www.pathagar.com

থান থেকে শুরু করে মিহিতম মুসলিন। এ মুসলিনের খোঁজে বাংলা থেকে বিলেতগামী ফিরতি জাহাজের খবর নিতেন মহারাণী ভিক্টোরিয়া। রংপুর, রাধানগর, বীরভুম ও যশোরে তৈরী হতো গরদ, তশর ও রেশমী বাহারী কাপড়। এই বাংলার রেশমে টাকু চলতো গুজরাতের তাঁতে। বাংলার চাউল যেতো মদ্রাজ, মালাবার এবং পূর্ব এশিয়ার দ্বীপে দ্বীপে। বাংলার চিনি যেতো মধ্যপ্রাচ্য ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে। নীল যেতো ইউরোপে। জাভা ও চীন থেকেও জাহাজ আসতো বাংলার সামানা নিতে।' গোটা ভারতের নুন ও সোরার চাহিদা মেটাতো এই বাংলা। বৃটিশ ঔপনিবেশিকেরা বাংলার কৃষির পাশাপাশি সেই সম্ভাবনাময় ঐতিহ্যবাহী শিল্প উৎপাদনকে চিরতরে বিনাশ করে বৃটেনের শিল্প পণ্যের জন্য তৈরী করে বিশাল এক বাজার। এ দেশের সম্পদ মুদ্রায় বিনিময় করে তারা জাহাজে ভরে নিয়ে যায় ইংলিশ চ্যানেলের ওপারে। কর্নওয়ালিশের কৃপায় হিন্দু বেনিয়ান শ্রেণী রাজমোসাহেবির এনাম হিসেবে লাভ করলো নতুন নতুন জমিদারী; আর তাদের হাতে গচ্ছিত মুদ্রা শিল্প বিনিয়োগে না গিয়ে ব্যবহৃত হলো বণিক পুঁজি এবং সুদের কারবারে। বণিক হিসেবেও দেশীয় হিন্দু জমিদার শ্রেণী সফল হয়নি। কেননা তার entrepreneur ছিলো না; তারা ছিলো দালাল শ্রেণী বা মধ্যস্বত্ব ভোগীদের শ্রেণীভুক্ত। বহির্দেশীয় বাণিজ্যের কথা এরা ভাবতেও পারতো না। তাই এদের টাকা খাটাতে লাগলো সুদের ব্যবসায়ে এবং জমিদারী ক্রয়ের মত অনুৎপাদনশীল খাতে। শিল্পসমৃদ্ধ বাংলাকে উনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু বাঙ্গালী ভূমিপুত্ররা এক পতিত জমির অনুর্বর তালুকদারীতে পরিণত করে।

বৃটিশ রাজকর্মচারীরাও অসদুপায়ে অর্জিত কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা উৎপাদনী চক্রে ঢালেনি। তারা তাদের সমুদয় সৌভাগ্য জাহাজে চাপিয়ে দেশে নিয়ে যেতো। কোম্পানীর কর্মচারী রাজস্ব আয় বিদেশে লগ্নি দিয়ে কাটাতো। মুনাফালোভী বৃটিশ রাজকর্মচারীদেরকে তাই কার্লমার্ক্স নাম দেন 'প্রকাশ্য দস্যু'। কোম্পানী এত নিষ্ঠুরভাবে এত বেশী অর্থ রাজস্ব আয় করতো যে মূলধনের জন্য তাদেরকে বিলেতে বা অন্য কোথাও যেতে হতো না। বরং তারাই ছিলো পাশ্চাত্য দেশের তৎকালীন দুর্ভাগ্য অমানিষার সৌভাগ্যের বাতিঘর। কোম্পানীর রাজস্ব আয়ের যৎসামান্যই খরচ হতো এলাকায়। বাকী সব টাকা দিয়ে তারা রেশম মুসলিন সুতীবস্ত্র ও নলি খরিদ করে বিলেতে নিয়ে লিডেস খটরীটের পাইকারী মোকামে নিলাম ডাকতো। বৃটিশ অর্থনীতিতে বাংলার শোষিত রক্ত সৌভাগ্যের বন্যা ছুটিয়ে দেয়। ধনী ও ঐশ্বর্যময় বাংলাকে চুষে নিয়ে বিলেতে সমৃদ্ধ হতে থাকে। ব্যাংক অব ইংল্যান্ড স্থাপিত হবার ৬০ বছর পর্যন্ত ব্যাংকের কারেন্সি নোটের মধ্যে সবচেয়ে বড়টি ছিলো ২০ পাউন্ডের নোট। ১৭৫০ সালে ব্যাংকের সমগ্র ইংল্যান্ডব্যাপী ১২টির মত ব্যাংক শাখা ছিলো। ১৭৯০ সাল নাগাদ দেখা গেলো অলিগলিতেও ব্যাংকের শাখা খুলেছে, নতুন নতুন ১০ ও ১৫ পাউন্ডের নোটও ছাড়া হয়েছে। ১৭৬০ সালের আগে বস্ত্রনগরী ল্যাংকাশায়ারে তাঁত ও টাকু এদেশের মতই নিম্নমানের ছিলো। লোহা শিল্পের অবস্থা ছিলো আরও শোচনীয়। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং নব নব প্রযুক্তি উদ্ভাবনীর সাথে সোনায় সোহাগা হয়ে দেখা দেয় ভারত তথা এই বাংলাদেশ থেকে লুণ্ঠিত অর্থ সম্পদ। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী যখন এখানে আসে ইংল্যান্ড তখন বাংলার কার্পাস, নীল, রেশম বস্ত্র তশর ও ও মুসলিন কিনতো। ১৮৩৫ সালে দেখা গেলো ইংল্যান্ডের কলের কাপড় বছরে আসছে প্রায় ৪০

www.pathagar.com

লাখ গজের মত। অথচ ১৮১৪ থেকে ১৮৩৫ এই ২০ বছরে ভারতীয় কাপড়ের রপ্তানি ১২ লাখ গজ থেকে কমে হয়েছে মাত্র ৫২ হাজার গজ। এই সময়ের মধ্যে এ দেশের হস্তশিল্পের কাপড়ের দাম ১৩ গুণ কমে আর ভারতে প্রেরিত ইংলিশ কাপড়ের দাম বাড়ে ১৬ গুণ।'

যে দেশ থেকে কাপড় রপ্তানি হয়ে যেতো পৃথিবীর দেশে দেশে, ১৮৫০ সালের মধ্যে সেই দেশেই আমদানি করতে লাগলো গোটা ইংলিশ বস্ত্রকলের উৎপাদনের এক-চতুর্থাংশ। কাপড়ের পাশাপাশি লৌহ-ইস্পাত শিল্প, মৃৎশিল্প, কাঁচ ও কাগজ শিল্পে বাংলার অসামান্য অগ্রগতিতে ধুলায় লুটিয়ে দিয়ে গেলো ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব। এদেশের লুণ্ঠিত পণ্যসামগ্রী ইংল্যান্ডের বাজার একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হয়েছিলো বলেই ইংল্যান্ডে 'শিল্প বিপ্লব' সম্ভব হতে পেরেছিলো যেটা ইতালীতে হয়নি (যদিও ইতালীই ছিলো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার উদ্ভাবনীর ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় ইউরোপীয় দেশ)। কৃষি যখন বাংলাকে দুই হাত ভরে সৌভাগ্যের সওগাত উপহার দিতো তখনই বাংলায় শিল্প উৎপাদন শুরু হয়। অথচ বৃটিশ ভূমিনীতির দরুন কৃষি উৎপাদনে মন্দার পাশাপাশি শিল্পও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। জমির ব্যাপারে বৃটিশ নীতিতে উপকৃত হয় বাংলার নব্য হিন্দু জমিদার শ্রেণী আর শিল্পের প্রতি বৃটেনের হালাক-নীতির ফলে উপকৃত হয় ইংল্যান্ডের যন্ত্রচালিত, নব উদ্ভাবিত শিল্প। ১৮৭৮ সালে দুর্ভিক্ষের কারণ ও সমস্যা অনুসন্ধানের জন্য যে কমিশন গঠিত হয় সে কমিশন ১৮৮০ সালে পেশকৃত তার রিপোর্টে বলেন যে, 'এদেশের অধিকাংশ লোকই কৃষির উপর নির্ভরশীল। তাছাড়া এ দেশে অন্য কোন শিল্প নেই, যার উপর লোকসংখ্যার একটি বিশেষ অংশ নির্ভর করতে পারে' (Indian famire commission report, 1880). কৃষি ও কুটির শিল্পের অভাব, পুরোটাই ছিলো বৃটিশ সাম্রাজ্যের নিষ্ঠুরতা ঔপনিবেশিক শাসনের অবদান। বাংলাকে ধ্বংস করেই তারা ইংল্যান্ডকে গড়ে তুলেছিলো। Brooks Adam তাঁর বিখ্যাত The law of civilization & Decay গ্রন্থে দেখিয়েছেন, '১৬৬৪ সাল থেকে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত (১৭৫৭) ইংল্যান্ডে সমৃদ্ধির গতি ছিলো অতি মন্থর। কিন্তু ১৭৬০ সাল থেকে ১৮১৫ সাল পর্যন্ত সেই গতি হয়েছিলো অতিদ্রুত ও বিস্ময়কর'। বৃটিশরা ভারতকে নিষ্পেষণ করতেই এখানে এসেছিলো। তাদের দেশের দারিদ্র্য বিমোচনেই তারা বাংলার দিকে লোভী নজর ফেলেছিলো। এদেশের সুদক্ষ হাল কারিগর অন্নসংস্থান অভাবে মাথা কুটে মরেছে। সৌখিন কারু কর্মীকেও গরুও হাল-নাঙ্গল ধরতে হয়েছে। শিল্প পণ্যে রপ্তানিকারক বাংলা পরিণত হল স্রেফ কৃষিপ্রধান দেশে।

এদেশের সামন্ততন্ত্র বণিকতন্ত্র পর্যন্ত উত্তীর্ণ হতে পারে। তবে বণিকতন্ত্র ধণিকতন্ত্রে বা পুঁজিবাদে রূপান্তরিত হতে না পারার প্রধান এবং একক কারণ ইংল্যান্ড। বৃটিশ বণিকতন্ত্রের বিকাশের সাথে সাথে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দী থেকে বাইরে পৃথিবীতে ধন-সম্পদ লুণ্ঠনের জন্য বৃটিশ বণিকরা অভিযানে নামে। এই বণিকরা নীতিতে বিশ্বাসী ছিলো না। তারা ছিলো এক শ্রেণীর জোচ্চোর, যাদের পরিচয় দিতে গিয়ে টমাস মান ১৬৬৪ সালে প্রকাশিত তার England's Treasure by Fareing Trade গ্রন্থে লেখা The ordinery means to increase our wealth and treasue is by foreign trade. Whreeing we must observe this rule: to sell more to strangers yearly than we consume of theirs in value. (ধনসম্পদ সঞ্চয়

www.pathagar.com

করতে হলে বিদেশের সাথে বাণিজ্য করাটাই সাধারণ উপায়। কিন্তু এই উপায় সম্পর্কে সব সময় আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বিদেশীদের জিনিস আমরা যা ব্যবহার করবো তার চেয়ে বেশী জিনিস আমাদের বিক্রি করতে হবে বিদেশীদের কাছে)।

বাংলায় বৃটিশ কোম্পানী ও রাজকর্মচারীদের অত্যাচার-উৎপীড়ন সম্পর্কে উইলিয়াম বোলটস লিখেছেন, 'এই অত্যাচার সর্বক্ষেত্রেই। বেনিয়ান ও গোমস্তাদের সহযোগিতায় ইংরেজরা খুশীমত স্থির করতো কোন ব্যবসায়ী কত দামে কি জিনিস বিক্রি করতে বাধ্য। তাঁদের সম্পত্তির কোনো প্রয়োজন আছে বলে তারা মনে করতো না। তাঁতীরা শর্ত পালন না করলে তাদের জিনিস কেড়ে নিয়ে বিক্রি করে টাকা আদায় করা হতো। রেশম ব্যবসায়ীদের উপরও এ রকম অত্যাচার চলতো। অত্যাচারে অসহ্য হয়ে তারা নিজেদের আঙ্গুলও পর্যন্ত কেটে ফেলে। এভাবে গ্রামের তাঁতী কারিগর সব উজাড় হয়ে যায়।

বৃটিশ নীতি বাংলাকে আসলে উজাড় করারই নীতি ছিলো। তাদের অন্যায় গ্রাসের উচ্ছিষ্ট ভোগ পায় তাদের মোসাহেব উচ্চবর্ণ হিন্দু সমাজপতিরা। বৃটিশের ছত্রছায়ায় এদেশের উচ্চারিত হিন্দু মানসে তাই নবজাগরণের যে হাস্যকর আয়োজন চলে তা থেকে কোনো পক্ষই উপকার পায়নি। পাশ্চাত্য নীতি ছিলো শোষণমূলক এবং সংস্কৃতি বেগানা। সেই অচেনা ভাব সংস্কৃতির আলোড়ন তাই নবজাগ্রত একটি শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। সামগ্রিকভাবে বাংলার বৃটিশ যুগ একটি বিদেশী জলদস্যু দলের লুনেরই যুগ।

ষড়যন্ত্রটা আসলে হিন্দুদেরই ষড়যন্ত্র। পশ্চিমবঙ্গ তখন বারভূম ছাড়া আর সব বড় বড় জায়গাতেই হিন্দু জমিদার ..... প্রকাশ্য না হলেও ভিতরে ভিতরে প্রায় সব জমিদারই এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল।

- ঐতিহাসিক তপন মোহনচট্টোপাধ্যায়

www.pathagar.com

পলাশী-উত্তর বাংলার চালচিত্র

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

১৭৫৭ সালে পলাশীতে সিরাজউদ্দৌলার ভাগ্য বিপর্যয় এবং ১৭৬৪ সালে বখশারে মীর কাসিমের পতনের মধ্য দিয়ে বাংলার সাড়ে পাঁচশ' বছরের মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে। স্বাধীনতা লোপ পাবার সাথে সাথে বিপন্ন হয় রাষ্ট্রীয় সত্তা। বিপর্যস্ত হয় অর্থনীতি। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয় বিপর্যয়। ভারতের পুরাতন শাসক মুসলমানরা যাতে আর কখনো মাথা তুলতে না পারে সে জন্য সব ব্যবস্থা পাকাপাকি করা হয়।

ইংরেজ ও তার এদেশীয় দালালদের লুণ্ঠন

ইংরেজরা দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে বাংলার দেওয়ানী বা রাজস্ব আদায়ের আনুষ্ঠানিক ফরমান আদায় করে ১৭৬৫ সালের ১২ই আগস্ট তারিখে। কিন্তু ১৭৫৭ সাল থেকেই তারা শাসন কর্তৃত্ব কুক্ষিগত করেছিল। মীর জাফরকে 'পুতুল নবাব' সাজিয়ে লর্ড ক্লাইভ শুরু থেকেই 'প্রকৃত নবাব' সেজে বসেছিলেন। আর এই পুতুল-নবাবীর সূচনাকাল থেকেই ইংরেজরা এদেশে ইতিহাসের নজীরবিহীন শোষণ ও লুণ্ঠনে লিপ্ত হয়েছিল। খোদ লর্ড ক্লাইভ পলাশীর 'যুদ্ধ জয়ের' বখশিশ হিসেবে মীর জাফরের কাছ থেকে ২ লাখ ৩৪ হাজার পাউণ্ড আত্মসাত করে রাতারাতি ইংল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ ধনীতে পরিণত হন। মীর জাফর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ছয়জন কর্মচারীকে ১,৫০,০০০ পাউণ্ড উৎকোচ প্রদান করেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কলকাতা কাউন্সিলের সদস্যরা প্রত্যেকে ৫০,০০০ থেকে ৮০,০০০ পাউণ্ড ঘুষ আদায় করেন।

(পি. রবার্টস ঃ হিস্টরী অব ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া, পৃঃ ৩৮, ডঃ এম এ রহীম ঃ বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, পৃঃ ১৯)।

কোম্পানীর ও কলকাতার অধিবাসীদের 'ক্ষতিপূরণ' হিসেবে এবং সৈন্য ও নৌবহরের

www.pathagar.com

ব্যয় বাবদ কোম্পানী আদায় করে মোট ২৫,৩১,০০০ পাউণ্ড। তাছাড়া মীর জাফর ইংরেজ প্রধানদের খুশী করতে ৬,৬০,৩৭৫ পাউণ্ড উপঢৌকন দেন। বিভিন্ন ইংরেজ কর্মচারী মীর জাফরের কাছ থেকে চব্বিশ পরগনা জেলার জমি ছাড়াও ৩০ লাখ পাউণ্ড 'ইনাম' গ্রহণ করেছিল। ১৭৫৯ সালে ক্লাইভকে ৩৪,৫৬৭ পাউণ্ড বার্ষিক আয়ের দক্ষিণ কলকাতার জায়গীর প্রদান করা হয়।

(ব্রিজেন কে গুপ্ত ঃ সিরাজউদ্দৌলাহ এন্ড দি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, পৃঃ ৪১)

ইংরেজদের বিভিন্ন রূপ টাকার দাবি মিটাতে মীর জাফর রাজকোষ শূন্য করে ফেলেছিলেন। মীর কাসিম এই ঋণ পরিশোধ এবং মসনদের বিনিময়ে কোম্পানীর কর্মচারীদেরকে ২০০,০০০ পাউণ্ড দিয়েছিলেন।

(ডঃ এম এ রহীম পূর্বোক্ত পৃঃ ১৬)

মীর জাফরের পুত্র নাজমুদ্দৌলাহ ১৭৬৫ সালে পিতার মৃত্যুর পর মসনদ লাভের জন্য কোম্পানীর কর্মচারীদের যে ঘুষ দেন তার পরিমাণ ছিল ৮,৭৫,০০০ টাকা। রেজা খান ২,৭৫,০০০ টাকার উৎকোচের বিনিময়ে এই অপ্রাপ্ত বয়স্ক নবাবের নবাব-নাযিম নিযুক্ত হয়েছিলেন। (পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০)

উৎকোচ নামক দুর্নীতি এদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ব্যাপকভাবে আমদানী করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা। ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৬ সাল পর্যন্ত মাত্র দশ বছরে ষাট লাখ পাউণ্ড আত্মসাত করেছিল, একথা ব্রিটিশ সংসদীয় কমিটির প্রতিবেদন থেকে জানা যায়।

(Fourth Parliamentery Report 1773 : P-535; সুপ্রকাশ রায় ঃ ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, পৃঃ ৯)।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা প্রথম সুযোগেই বাংলাদেশ থেকে প্রচুর অর্থ বিলাতে নিয়ে যায়। ক্লাইভের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ঘুষ ও দুর্নীতির অভিযোগ আনা হলে তিনি নিজ আচরণ সমর্থন করে বলেন ঃ

"পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পর আমার যে অবস্থা হয়েছিল, তা আপনারা বিবেচনা করুন। একজন বড় রাজার ভাগ্য আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে। একটি সমৃদ্ধ নগর আমার দয়ার প্রতীক্ষায় আছে। আমার মুখের সামান্য হাসিতে কৃতার্থ হবার জন্য ধনী মহাজনরা একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করছে। আমার দুই পাশে স্বর্ণ আর মণিমুক্তায় পূর্ণ সিন্দুকের সারি এবং এগুলি কেবল আমারই জন্য খোলা হয়েছে। (পার্লামেন্ট কমিটির) সভাপতি মহোদয়, এ মুহূর্তে আমি নিজেই ভেবে অবাক হয়ে যাই যে, তখন আমি কিভাবে নিজেকে সংযত করতে পেরেছিলাম।" (পূর্বোক্ত পৃঃ ১২৬-১২৭)।

বাংলার সম্পদ লুণ্ঠনে ইংরেজরা একা ছিল না। তাদের পাশে ছিল তাদের এদেশী দালাল, গোমস্তা ও বেনিয়াগোষ্ঠী। তাদের শোষণ, লুণ্ঠন ও ধ্বংসলীলা সম্পর্কে কট্টর সাম্রাজ্যবাদী লর্ড মেকলে স্বয়ং মন্তব্য করেছেন ঃ

'কোম্পানীর কর্মচারীরা তাদের প্রভু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর জন্য নয়, নিজেদের জন্য, প্রায় সমগ্র অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ওপর একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। দেশী

www.pathagar.com

লোকদেরকে তারা অত্যন্ত কম দামে উৎপন্ন দ্রব্য বেচতে এবং অন্যদিকে খুবই চড়া দামে বিলাতী পণ্য কিনতে বাধ্য করতো। কোম্পানী তাদের অধীনে একদল দেশী কর্মচারী নিয়োগ করতো। এই দেশীয় কর্মচারীরা যে এলাকায় যেতো, সে এলাকা ছারখার করে দিতো। সেখানে সন্ত্রাসের রাজস্ব কায়েম করতো। ব্রিটিশ কোম্পানীর প্রতিটি কর্মচারী ছিল তার উচ্চপদস্থ (ইংরেজ) মনিবের শক্তিতে বলীয়ান। আর এই মনিবদের প্রত্যেকের শক্তির উৎস ছিল খোদ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী। (তাদের ব্যাপক লুণ্ঠন ও শোষণের ফলে) শীঘ্রই কলকাতায় বিপুল ধন-সম্পদ স্তূপীকৃত হলো। সেই সাথে তিন কোটি মানুষ দুর্দশার শেষ ধাপে এসে দাঁড়ালো। বাংলার মানুষ শোষণ ও উৎপীড়ন সহ্য করতে অভ্যস্ত একথা ঠিক, কিন্তু এ ধরনের (ভয়ংকর) শোষণ ও উৎপীড়ন তারাও কোনদিন দেখেনি।' (Macaulay : Essays on Lord Clive. P-63). সুপ্রকাশ রায় ঃ ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পৃঃ ১০।

ইংরেজরা শাসন ক্ষমতা লাভের আগে দীর্ঘকাল চেষ্টা করেও তাদের পণ্য-ব্যবসা সমাজের গভীর অভ্যন্তরে বিস্তৃত করতে পারেনি। এদেশের স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম-সমাজের কাঠামো অক্ষত রেখে তাদের এই ব্যবসায়িক স্বার্থ চরিতার্থ করা অসম্ভব ছিল না। আগে যা কখনো সম্ভব হয়নি, পলাশীর পরে এখন তা সম্ভব হলো। ইংরেজরা শাসন ক্ষমতা হাতে পাবার সাথে সাথে নজীরবিহীন ক্ষিপ্রতার সাথে বাংলা ও বিহারে প্রাচীন স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম-সমাজের এই ভিত্তি ও কাঠামোটাকে গুঁড়িয়ে দেয়। এই সমাজকে ইংল্যান্ডের ক্রমবর্ধমান শিল্পের জন্য কাঁচামাল সরবরাহের যন্ত্ররূপে ব্যবহারের প্রক্রিয়া চালু করে। ক. ভূমি রাজস্বের নতুন ব্যবস্থা চালু এবং খ. ভূমি রাজস্ব হিসেবে ফসল বা উৎপন্ন দ্রব্য আদায়ের প্রচলিত পদ্ধতির বদলে মুদ্রার মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। ইংরেজ প্রবর্তিত এই নতুন ভূমি-ব্যবস্থা ও কর-ব্যবস্থা সম্পর্কে সুপ্রকাশ রায় মন্তব্য করেন ঃ 'এই দুই অস্ত্রের প্রচণ্ড ধ্বংসকারী আঘাতে অল্পকালের মধ্যেই বাংলা ও বিহারের প্রাচীন গ্রাম-সমাজের ভিত্তি ধূলিসাৎ হইল; বিহার ও বাংলা শ্মশান হইয়া গেল।' (সুপ্রকাশ রায় ঃ ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, পৃঃ ১০)

ইংরেজ শাসনের আগে এ দেশের শাসকরা সমগ্র গ্রাম-সমাজের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করতো, কোন ব্যক্তির কাছ থেকে নয়। চাষী জমির ফসলের দ্বারা গ্রাম-সমাজের মাধ্যমে এই রাজস্ব আদায় করতো। ইংরেজরা গ্রাম-সমাজের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের এ ব্যবস্থা লোপ করে কৃষকদের কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে এবং ফসলের বদলে মুদ্রার মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের রেওয়াজ চালু করে এভাবে এদেশের সমাজ-ব্যবস্থার মূল ভিত্তি ধ্বংস করে সমগ্র ভূমি ব্যবস্থা নতুনভাবে গড়ে তোলার আয়োজন করে।

কৃষকদের কাছ থেকে যত খুশী খাজনা ও কর আদায় করে তার একটা নির্দিষ্ট অংশ ইংরেজদের হাতে তুলে দেয়ার জন্য এক নতুন জমিদার শ্রেণী সৃষ্টি করা হয়। এই জমিদারদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের জন্য ইংরেজরা বাংলা ও বিহারের নিষ্ঠুরতম দস্যু সরদারদের 'নাযিম' নিয়োগ করে। নাযিম নামক এই দস্যুদের অত্যাচার ও লুণ্ঠন সম্পর্কে কোম্পানীর দলিলপত্র থেকেও জানা যায়। বাংলা ও বিহারের রাজস্ব কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ১৭৭২ সালের ৩ নভেম্বর ইংল্যান্ডে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বোর্ড

www.pathagar.com

অব ডাইরেকটরসকে লেখা এক চিঠিতে উল্লেখ করেছেন ঃ "নাযিমরা জমিদার ও কৃষকদের কাছ থেকে যত বেশি পারে কর আদায় করে নিচ্ছে। জমিদাররাও নাযিমদের কাছ থেকে চাষীদের লুণ্ঠন করার অবাধ অধিকার লাভ করেছে। নাযিমরা আবার তাদের সকলের (জমিদার ও কৃষকদের) সর্বস্ব কেড়ে নেয়ার রাজকীয় বিশেষ অধিকারের বলে দেশের ধন-সম্পদ লুট করে বিপুল সম্পদের অধিকারী হয়েছে। (পূর্বোক্ত পৃঃ ১২)।

১৭৬৫-৬৬ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব গ্রহণের পর সে বছরই তারা প্রায় দ্বিগুণ অর্থাৎ ২ কোটি ২০ লাখ টাকা রাজস্ব আদায় করে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে সে আদায়ের পরিমাণ আরো কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়।

ইংরেজদের রাজস্ব-নীতি ও ভূমি-ব্যবস্থা সম্পর্কে সুপ্রকাশ রায় লিখেছেন 'এই সকল ব্যবস্থার ফলে চাষীদের পিঠের ওপর বিভিন্ন প্রকারের পরগাছা শোষকদের একটা বিরাট পিরামিড চাপিয়ে বসে। এই পিরামিডের শীর্ষদেশে রইল ইংরেজ বণিকরাজ, তার নীচে রইল বিভিন্ন প্রকার উপস্বত্বভোগীর দলসহ জমিদারগোষ্ঠী। এই বিরাট পিরামিডের চাপে বাংলা ও বিহারের অসহায় কৃষক সর্বস্বান্ত হয়ে অনিবার্য ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়াল।' (পূর্বোক্ত পৃঃ ১২)

ব্যবসায়ের নামে 'প্রকাশ্য দস্যুতা'

বাংলার জনগণের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া বিপুল ভূমি-রাজস্ব, কর্মচারীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত উৎকোচ, ব্যবসায়ের নামে ব্যক্তিগত লুণ্ঠন এবং এদেশের টাকা দিয়ে এখানে নামমাত্র মূল্যে পণ্য কিনে ইউরোপে চালান করা হতো। ফলে যে মুনাফা তারা লাভ করতো, তার পরিমাণ ছিল অবিশ্বাস্য রকম স্ফীত। এদেশের জনগণের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া রাজস্বের টাকার একাংশ দিয়ে এ দেশেরই কারিগরদের তৈরি পণ্য-সম্ভার নামমাত্র মূল্যে কেড়ে নিয়ে ইউরোপে চালান দিয়ে মুনাফা করা হতো বিপুল অংকের টাকা। সমুদয় গ্রাস করতো 'কোম্পানী-লগ্নি'। এই অদ্ভুত লগ্নির চেহারা হলো ঃ বাংলাদেশের জনগণের টাকা, বাংলার কারিগরদের তৈরি দ্রব্য, কিন্তু মুনাফা কোম্পানীর। কার্লমার্কস, রেজিনাল্ড রেণ্ডস প্রমুখ লেখক এই 'ব্যবসায়ের' নাম দিয়েছেন 'প্রকাশ্য দস্যুতা।' (পূর্বোক্ত)

ব্যবসায়ের নামে ইংরেজ বণিক কোম্পানীর এই দস্যুতার মুখে বহু শিল্প-কারিগর উৎপাদনের জন্য অপরিহার্য নিজেদের বুড়ো আঙ্গুল কেটে ফেলে অসহনীয় উৎপীড়ন থেকে বাঁচার চেষ্টা করে। অনেকে বাড়ি-ঘর ছেড়ে বন-জঙ্গলে পালিয়ে যায়। ১৭৫৮ থেকে ১৭৬৩-এই ছয় বছরে কৃষকদের সাথে কারিগরদের একটা অংশ স্থায়ী বেকারে পরিণত হয়। ইংরেজ লেখক রেজিনাল্ড রেনাল্ডস উল্লেখ করেছেন যে, ঐ সময়ের মধ্যে ঢাকার বিশ্বখ্যাত মসলিনের এক-তৃতীয়াংশ কারিগর ইংরেজ বণিকদের শোষণ-পীড়নে অস্থির হয়ে বনে-জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিল।

(রেজিনাল্ড রেনাল্ডসঃ সাহিবস ইন ইণ্ডিয়া, পৃঃ ৫৪)।

www.pathagar.com

ওরা কেন আতংকিত হয়ে পড়েন?

এলাহী নেওয়াজ খান

ইতিহাসের ঘটনাবলী নিয়ে নাড়াচাড়া করে কি লাভ, সে প্রশ্ন অনেকেই করে থাকেন। যারা ইতিহাস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেন, তাদেরকে কটাক্ষ করতেও অনেকে পিছপা হন নাই। কিন্তু এ কথা অনেকেই ভুলে যান যে, ইতিহাসই হচ্ছে 'আগামী দিনের চলার পাথেয়। যে রাজনীতিবিদ, সমরনায়ক ইতিহাস জানেন না, তার পক্ষে জাতিকে মহৎ কিছু দেওয়া সম্ভব নয়। আর যারা মুসলমান, তারা ভালোভাবেই জানেন যে, মুসলমানদের জীবনাদর্শ যে পবিত্র কোরআন দ্বারা আবর্তিত ও সীমাবদ্ধ, তা মূলত ইতিহাস আশ্রিত। আল্লাহ পাক অতীতের ঘটনাবলীর উদ্ধৃতি দিয়ে মুসলমানদের বারবার সতর্ক করে দিয়েছেন। সুতরাং ইতিহাসের ঘটনাবলী থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন হওয়ার কোন অবকাশ নেই। আর যারা ইতিহাস উপস্থাপনে বিরক্ত হন, নানা ধরনের গন্ধ খুঁজে পান, তারা মূলত পাপ-পংকিলতায় নিমজ্জিত এক দল মানুষ, যারা ইতিহাসের সত্য অনুসন্ধানে ভয় পায়। এই ভয় তাদের নৈতিক দুর্বলতার পরিচায়ক, এই ভয় তাদের বিশ্বাসঘাতকতার উন্মোচনের ভয়। আর এ কারণেই ২৩ জুন পলাশী দিবস পালন করলে এ দেশের এক শ্রেণীর তথাকথিত বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিক ও সাংবাদিক আতংকিত হয়ে পড়েন।

২৩ জুন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, ইংরেজ ও নবউত্থিত হিন্দু বণিক শ্রেণীও কতিপয় মুসলমানের মিলিত ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতায় ভারতবর্ষের মুসলমানদের ভাগ্যের বিপর্যয় ঘটে, আর আমরা হারিয়ে ফেলি বাংলার স্বাধীনতা। এ দিবসটি তখন আরো তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে, যখন আমরা দেখি, ভারতের মাড়োয়ারী পুঁজি ও এ দেশের এক শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলিম নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আবারও বিপন্ন হয়ে পড়েছে। ঘটনাবলীর এক অদ্ভুত মিল। ১৭৫৭

www.pathagar.com

সালের ২৩ জুন পলাশীতে আমরা স্বাধীনতা হারাই। ঠিক তার ২৩৯ বছর পর ঐ একই দিনে বাংলাদেশের রাজনৈতিক মঞ্চে একই দৃশ্য মঞ্চস্থ হয়। শুধু পার্থক্য, তখন ইংরেজরা ছিল ষড়যন্ত্রের নিয়ামক শক্তি। স্থানীয় পাত্র-পাত্রী ছিল হিন্দু-বণিক শ্রেণী ও বিশ্বাসঘাতক কতিপয় মুসলমান। আর এখনকার নিয়ামক শক্তি ভারতীয় শাসক গোষ্ঠী। আর স্থানীয় পাত্র-পাত্রী হচ্ছে সেই হিন্দু ও এক শ্রেণীর মুসলিম নেতৃত্ব। আর এই কারণেই ২৩ জুন পলাশী দিবস পালন রাজনৈতিক দিক দিয়ে অতি বেশী তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তবে ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন আমাদের পৌণে দু'শ' বছরের গোলামীতে পরিণত করেছিল। কিন্তু এবারের ২৩ জুন আমাদের কতদিন গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ করে রাখবে, তা আমরা জানি না। তবে এটা অনুভব করতে পারি, এই যুগে যে কোন কর্মেই হোক না কেন, কোন জাতিকে বেশী দিন গোলাম বানিয়ে রাখা সম্ভব নয়, যদি না আমাদের জনগোষ্ঠী গোলামীকেই শ্রেয়তর মনে না করে। এছাড়া মুসলমান হিসেবে এ বিশ্বাস অটল যে, পৌত্তলিকতার কাছে আত্মসমর্পণকারী কোন মুসলিম শাসকের ভাগ্য আপন কীর্তির মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

সিরাজদ্দৌলা তাঁর প্রভুর (আলীবর্দীখান) বিশ্বাসঘাতকতা করেননি এবং দেশকেও বিক্রয় করেননি। অধিকন্তু ৯ হইতে ২৩ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে সংঘটিত ঘটনাবলীর সুক্ষ্ম বিচারে কোন নিরপেক্ষ ইংরেজ অস্বীকার কতে পারেন নি যে, ক্লাইভ অপেক্ষা সিরাজের মান মর্যাদা অনেক উচ্চে। মর্মস্পর্শী নাটকে প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণকারী সকর প্রধান নায়কদের মধ্যে তিনিই একমাত্র ব্যতিক্রম।

- ম্যালেসন

www.pathagar.com

পলাশী যুগে যুগে

অধ্যাপক মুজাহিদুল ইসলাম

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়। কিছু পুনরাবৃত্তির জন্য মানুষ দীর্ঘকাল ধরে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আবার কিছু পূনরাবৃত্তি মানুষ কিছুতেই চায় না। যেমন আমরা চাই না পলাশীর পুনরাবৃত্তি হোক। আমরা চাই না গাদ্দারী আর ষড়যন্ত্রের নিকষ আধারে আমাদের প্রাণপ্রিয় স্বাধীনতা সূর্য আবার হারিয়ে যাক। সিরাজউদ্দৌলাহ আর মীর মদনের মত দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধার লাশ আমরা আর দেখতে চাই না। আমরা চাই না আর কোন মীর জাঁফর বারো কোটি মানুষকে বোকা বানিয়ে বাংলার মসনদে আরোহণ করুক; ঈর্ষা, হিংসা আর পরশ্রীকাতরতার পঙকিল আবর্তে আর কোন ঘষেটি বেগমের জন্ম হোক। উমিচাঁদ আর জগৎশেঠদেরহীন স্বার্থপরতার যুপকাষ্ঠে একটি জাতির সকল স্বপ্ন ও আকাংখার নির্মম বলির উৎসব হোক। আমরা চাই, বাংলার মসনদের যারা রক্ষাকর্তা হবেন তারা নতুন যুগের ক্লাইভ আর মীরজাফরদের মিলিত ষড়যন্ত্রকে নির্দয়ভাবে মোকাবিলা করে সাহসী রাষ্ট্রনায়কের খেতাব অর্জন করবেন। বাংলার ঘরে ঘরে জন্ম নেবে লক্ষ কোটি মীরমদন যারা জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে রক্ষা করবেন ১২ কোটি মানুষের প্রাণপ্রিয় স্বাধীনতা, আমরা চাই বখতিয়ারের উত্তরসুরির অদ্ভুত অশ্বের দূরন্ত গতি কাঁপিয়ে দেবে শত্রুর বুক; স্বাধীন বাংলার হাজার তীতুমীর আবার গড়বে বাঁশের কেল্লা-প্রতিরোধের দুর্ভেদ্য ব্যূহ।

এই স্বপ্ন নিয়েই জাতি আজ নতুন উদ্দীপনায় উদযাপন করেছে পলাশী দিবস। কারণ, আমরা উদার নবাব সিরাজউদ্দৌলার মত শত্রুকে দ্বিতীয় আক্রমণের সুযোগ দিতে চাই না। কারণ, আমরা জানি, একাবিংশ শতকের ক্লাইভ অষ্টাদশ শতকের ক্লাইভের চেয়ে অনেক বেশী ভয়ংকর ও বিধ্বংসী। একবিংশ শতকের ক্লাইভ নিশ্চয়ই সৈন্য সাজিয়ে দেশ দখল করতে আসবে না; একজন ক্লাইভের জন্য আজ বড় বেশী প্রয়োজন ট্রানজিট, করিডোর কিংবা চোরাচালানের অবাধ সুযোগ। আজকের ক্লাইভ ষড়যন্ত্র পরিচালনার

www.pathagar.com

জন্য বিরাট আয়তনের কোন কুঠিবাড়ী নির্মাণের দাবী করে না বরং 'ইনফরমেশন সেন্টার', 'সাংস্কৃতিক কেন্দ্র' ইত্যাদি চিত্তাকর্ষণ নামের প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে ষড়যন্ত্রমুলক তৎপরতা চালায়। কালো পোশাকে দেহ আবৃত করে, মুখে কাপড় বেঁধে, রাতের আঁধারে ঘোড়া ছুটিয়ে আজ কোন গুপ্তচর খবর পাচারের ঝুঁকিপূর্ণ পথে অগ্রসর হবে না বরং ইন্টারনেটের এই যুগে তার জন্যে একটি ডিসকেটই যথেষ্ট। কিছুদিন আগে কুমিল্লা শহরে আমাদের প্রতিরক্ষার গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমৃদ্ধ ডিসকেটসহ সন্দেহভাজন এজেন্ট গ্রেপ্তারের বিষয়ে পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ নিশ্চয়ই জাতীয় সচেতন অংশের জন্য দুর্ভাবনার কারণ।

একাবিংশ শতকের সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্যবাদ ও তাদের এদেশীয় দোসর মীরজাফরদের মোকাবিলা করা তাই সহজসাধ্য হয়। সেদিন ছিলো প্রাসাদ ষড়যন্ত্র আর আজকের ষড়যন্ত্র সর্বব্যাপী। আজকের ষড়যন্ত্রকারীরা শুধু শাসন আর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কব্জা করেই ক্ষান্ত হতে চায় না বরং তারা আজ এন,জি,ও নেটওয়ার্কের মত বহুবিধ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ব্যাপক জনগণকে বিভ্রান্ত করার কাজে লিপ্ত। নানা ছলাকলায় তারা ব্যাপক জনগণকে দেশপ্রেমিক স্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে পরকীয়া স্রোতে মিলাতে চায়। কারণ, তারা জানে, মূল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে আজ আর শুধু মীর মদনরাই লড়বে না বরং ১২ কোটি মানুষ এক দেহ এক প্রাণ হয়ে রুখে দাঁড়াবে। তাই জনগণকে তাদের বড় ভয়।

তাহলে প্রকৃত সমস্যা কোথায়? আশলে প্রকৃত সমস্যা হচ্ছে চিহ্নিতকরণ-এর প্রশ্নে। চোর নিজেই যখন চোর চোর বলে চীৎকার করে জনতার স্রোতে মিশে যায় তখন চোরকে চিহ্নিত করা সত্যিই দুষ্কর। বাংলাদেশসহ সাড়া বিশ্বমুসলমানের আজ সমস্যা ঐ একটাই। শত্রু বন্ধু চিহ্নিতকরণের সমস্যা। প্রিয়নবী (সঃ) এর অনুসারীরা অহরহ আবু জেহেল আবু লাহাবদের গালি দেয় কিন্তু এ যুগের আবু জেহেল আবু লাহাবদের চিহ্নিত করতে পারে না, ইমাম হোসেনের উত্তরসুরীরা বুকের সমস্ত উত্তাপ দিয়ে শাহাদাতে হুসাইনীর প্রতি তাদের মমতা প্রকাশ করে আর স্বৈরাচারী এজিদের চৌদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করে হৃদয়ের আগুন নেভায়। কিন্তু প্রায়শ: এ যুগের এজিদদের চিহ্নিত করতে তাদের ভুল হয়ে যায়। তাই ইতিহাসের এজিদ নিন্দিত হলেও এ যুগের এজিদ নন্দিত হয়। পলাশীর সিরাজউদ্দৌলাহ ও তার শহীদ সাথীদের প্রতি হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা এবং ক্লাইভ মীরজাফরদের প্রতি শত ধিককার আমরা সবাই জানাই কিন্তু যুগের সিরাজউদ্দৌলাহ ও মীরজফরদের চিহ্নিত করে তাদের ন্যায্য পাওনা বুঝে দিতে আমরা সমর্থ হই কি? সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণ ও আধিপত্যবাদ রূপী ক্লাইভ সারা বাংলা জুড়ে একের পর এক তার ষড়যন্ত্রের নেটওয়ার্ক বিস্তার করে চলেছে, মীরজাফর, উমিচাঁদ জগতশেঠের দল 'কোলে বসে কাপড় ছেড়ার' পুরনো কৌশলে বেপরোয়া গতিতে এগিয়ে চলেছে। ঘষেটি বেগমরাও বসে নেই। কিন্তু সিরাজউদ্দৌলাহকে উত্তরসুরীগণ এত কথা কেন? মীরজাফরের তো বারবার ক্ষমা ভিক্ষাকরে নতুন ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠার সুযোগ লাভের জন্য। সিরাজের উত্তরসুরীরা মীরজাফরদের আর কতবার ক্ষমা করবে? দেশ, জাতি, রাষ্ট্রকে নিয়ে যারা ষড়যন্ত্র করে তাদের ক্ষমা করলে স্বাধীনতা হারাতে হয় আর জীবন ও সম্ভ্রম হয় বিপন্ন। নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ জীবন দিয়ে সেই শিক্ষাই আমাদের জন্য রেখে গেছেন।

আমরা কি আমাদের প্রাণপ্রিয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সেই শিক্ষা কাজে লাগাবো নাকি আরেকটি পলাশীর জন্য অপেক্ষা করবো?

www.pathagar.com

নবাগত উৎপাত

কাজী নজরুল ইসলাম

মনে পড়ে আজ পলাশীর প্রান্তর-
আসুরিক লোভ কামানের গোলা বারুদ লইয়া যথা
আগুন জ্বালিল স্বাধীন এ বাংলায়।
সেই আগুনের লেলিহান শিখা শ্মশানের চিতা সম
আজো জ্বলিতেছে ভারতের বুকে নিষ্ঠুর আক্রোশে।
দুই শতাব্দী নিপীড়িত এই দেশের নর ও নারী
আঁখিজল ঢালি নিভাতে নারিল সেই আগুনের শিখা
এ কোন করালী রাক্ষুসী তার রক্ত-রসনা মেলি
মজ্জা অস্থি রক্ত শুষিয়া শক্তি হরিয়া যেন
চল্লিশ কোটি শবের উপরে নাচিছে তা থৈ থৈ!
অক্ষমা অভিশপ্তা শক্তি তামসী ভয়ঙ্করী।

চল্লিশ কোটি নরকঙ্কাল লয়ে এই অকরুণা।
যাদুকরী নিশিদিন খেলিতেছে যাদু ও ভেল্কী, হায়।
যত যন্ত্রণা পাইয়াছি তত তার ভূত-প্রেত সেনা
হাসিয়া অট্টহাসি বিদ্রুপ করেছে শক্তিহীনে।

এ কাহার অভিশাপ সর্পিণী হয়ে জড়াইয়া আছে,
সারা দেহ মন প্রাণ জরজর করি কালকূট বিষে
লয়ে যায় যমলোকে! –হায়, যথা গঙ্গা, যমুনা বহে-
যথায় অমৃত-মধু-রস-ধারা বর্ষণ হত নিতি,
যে ভারতে ছিল নিত্য শান্তি সাম্য প্রেম ও প্রীতি,
যে ভারতের এ আকাশ হইতে ঝরিত স্নিগ্ধ জ্যোতি
সে আকাশ আজ মলিন হয়েছে বোমা বারুদের ধূমে।
যে দেশে জ্বলিত হোমাগ্নি, সেথা বোমার আগুন এল,
ক্ষুধিত দৈত্য-শক্তি শকুনি হয়ে আজ ঝাঁকে ঝাঁকে
উড়িয়া বেড়ায় আমাদের পচা গলা মাংসের লোভে।

হে পরম পুরুষোত্তম! বলো, বলো, আর কতদিন
উদাসীন হয়ে রহিবে?- তোমার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি নর
নিদারুণ যাতনায় নিশিদিন করিছে আর্তনাদ!
নিরস্ত্র দেশে লয়ে তব জ্যোতি সুন্দর তরবারি
দুর্বল নিপীড়িতের বন্ধু হইয়া প্রকাশ হও।
বন্দী আত্মা কাঁদে কারাগারে, "দ্বার খোলো, খোলো দ্বার!
পরাধীনতার এই শৃঙ্খল খুলে দাও, খুলে দাও।
নিপীড়িত যেন নতুন পীড়ার যন্ত্রণা নাহি পায়,
প্রভু হয়ে নয়, বন্ধু হইয়া এসো বন্দীর দেশে।"

www.pathagar.com

'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের গান

কাজী নজরুল ইসলাম

১
আমি আলোর শিখা,
ফুটাই আঁধার ভরনে দীপ-কলিকা॥

নিশ্চল পথে আমি আনন্দ-ছন্দ,
অন্ধ আকাশে জ্বলে রবি-তারা-চন্দ;
আমি ম্লান মুখে আনি রূপ-কণিকা॥

২
[আলেয়া নাচিতেছে ও গাহিতেছে]
ম্যয় প্রেম নগরকো জাউঙ্গী।
সুন্দর দিলবর দেখন কো
ফুল চড়াউ অঙ্গ অঙ্গ মে
মন রঙ্গুঙ্গি পিয়া-রঙ্গ মে
পিয়া নাম মেরি গলে কি হার কর
পীতম্ মম বাহ লাউঙ্গী॥

৩
কেন প্রেম-যমুনা আজি হল অধীর?
দোলে টলমল রহে না স্থির।
মানে না বারণ উথলে বারি
ভাসাল কুললাজ রুধিতে নারি
সখি ডাক শুনেছে সে কার মুরলীর॥

৪
পথহারা পাখি কেঁদে ফিরে একা
আমার ভুবনে শুধু আঁধারের লেখা॥
বাহিরে অন্তরে ঝড় উঠিয়াছে
আশ্রয় যাচি হায় কাহার কাছে
বুঝি দুখ-নিশি মোর
হবে না হবে না ভোর
ফুটিবে না আশার আলোক রেখা॥

৫
এ-কুল ভাঙে ও-কূল গড়ে
এই ত নদীর খেলা।
সকাল বেলা আমির রে ভাই
ফকির, সন্ধ্যাবেলা॥

সেই নদীর ধারে কোন্ ভরসায়
ঘুমিয়ে ছিলি, ওরে বেভুল,

www.pathagar.com

ঘুমিয়ে ছিলি সুখের আশায়?
যখন ধরল ভাঙন পেলি নে তুই
পারে যাবার ভেলা॥
৬
পলাশী! হায় পলাশী!
এঁকে দিলি তুই জননীর বুকে
কলঙ্ক-কালিমা রাশি
হায় পলাশী॥

আত্মঘাতী স্বজাতির
মাখিয়া রুধির-কুমকুম।
তোরি প্রান্তরে ফুটে
ঝরে গেল পলাশ-কুসুম।
তোর গঙ্গার তীরে পলাশ সংকাশ
সূর্য ওঠে যেন দিগন্ত উদ্ভাসি'॥

www.pathagar.com

(স্থান ঃ মুর্শিদাবাদ কারাগার কাল নিশীথ রাত্রি। সিরাজউদ্দৌলা উত্তপ্ত মস্তিষ্কে পদচারণা করিতেছিলেন।)

সিরাজ ঃ ভুল-ভুল মুহূর্তের ভুলে রসাতলে গেল বঙ্গ বিহার উৎকল। পলাশীর সর্বগ্রাস ধাত্রীরূপারে রাক্ষুসী। ক্লেদরক্ততলে তোর নিশ্চিহ্ন করিয়া দিলি জ্বলন্ত দীপকে; দিগন্ত বিথারে ঘনাইয়া দিলি সন্ধ্যা অনন্ত যুগের। (সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া) এ কি স্বপ্ন! এ কি মায়া! নিয়তির নির্দেশ! অথবা এ শয়তানের রুদ্র পরিহাস কিংবা ক্রুর প্রহেলিকা ছলে অন্তরালে কাল-চক-গতি-আবর্তনে নিষ্পোষতে মোরে।

(সহসা উত্তেজিত হইয়া)

যে-হও-সে-হও তুমি-স্বপ্ন, মায়া প্রহেলিকা, নিয়তি, শয়তান-অন্তরীক্ষে অন্তরালে কিম্বা অন্ধ অতল পাতালে যেথা থাক, -সুদুর্গম রহস্যের ঘন চক্র কুহেলী মায়ার নিস্তার নাহিক তব; উৎকল-বিহার-বঙ্গ পদতলে করিয়াছে প্রণতি শুভ্র ফেনাঞ্জলি পুটে লীলায়িত নীল সিন্ধু জানাইছে নতি। সে আমারে তুমি যাবে ছলি? রে রাক্ষুসি! হৃৎপিণ্ড ছেদি, তোর।

না- না- ভুল ভুল

কোথা বঙ্গ, বিহার কোথায়, সিন্দু বেলা ভূমে কোথায় উৎকল পুরী? আর আমি কোথা? রুদ্ধ অন্ধ প্রাচীরের আবেষ্টনী চৌদিকে ঘেরিয়া মোর, কঠোর, পাষাণ গাত্রে প্রতিহত ফিরে আসে বৃথা মোর বীর্য্য আস্ফালন জিন্দান খানায় বন্দী পঞ্জরে। কেশরী; বিদ্রূপের তীব্র শেল ভীরু মেষ সেও আজি হানিছে আমারে। (কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া) মহোৎসব নগরীর বুকে হিরাঝিল মতিঝিল ঝিলিমিলি আলোচ্য মালায়। ফুল দোলা দোলে দিকে দিকে বাজে বাঁশী সাহানার সুরে নৃত্যপরা নটিনীর নূপুর শিঞ্জন ছাপায়ে উঠছে আজি চিরন্তন অশান্ত ঝঙ্কারে। দলে দল চলে নাগরিক, আলো করি রাজপথ সাথে চলে রঙ্গিনী নায়িকা চল চল যৌবনের লাবন্য শায়রে শতদলে প্রস্ফুটিতা জঙ্গামা কমল; হাস্যে লাস্যে কৌতুকে গুঞ্জনে উছলিয়া জনস্রোত চলিয়াছে রাজ সন্দর্শনে, অভিনব অভিষেক বঙ্গ সিংহাসনে আজি বৃদ্ধ জাফরের।

কার অভিশাপে

নাহি জানি দুর্ভাগা বাঙ্গালী শিরস্ত্রান খুলি রাজার

সিরাজের স্বপ্ন

শাহাদাৎ হোসেন

www.pathagar.com

সম্মানে করিবে বরণ, বিজাতির ক্রীতদাস বিশ্বাসঘাতকে। তবে নির্মম দুর্জ্ঞেয় বিধাতা, কোন পাপে বাঙালির ভালে লিখেছিলি কলঙ্কের মসীময় এ দুর্বার চরম লিখন (পুনরায় উত্তেজিত হইয়া) মুক্তি যদি পাই একবার জাহান্নামী দূরাত্মা জাফরে সহস্রে খণ্ডিত করি নিক্ষেপি কুক্কার গ্রাসে ক্ষুধিত লোলুপ। দূর করি বাঙলার জীবন জঞ্জাল। পাব না-কি পাব না-কি (মোহাম্মদী বেগের প্রবেশ) কে তুই কে তুই হেথা প্রেতচ্ছায়া চলন্ত কঙ্কাল। ক্ষীণ রশ্মি আলোকের করি অবস্তর অন্ধ মসী আবরণে ঢাকি নগ্ন কুশ্রীতায় মূর্ত্তিমান অন্ধকার সম্মুখে আমার।

মোঃ বেগ ঃ মোহাম্মদা বেগ আমি রাজ অনুচর আসিয়াছ রাজাদেশ শুনাইতে তোমা।

সিরাজ ঃ মোহাম্মদী বেগ তুমি রাজ অনুচর আসিয়াছি রাজাদেশ শুনাতে আমারে। চকৎকার। রাজভৃত্য, রাখনি তোমারে। ধন্য রাজা, ততোধিক ঘৃণ্য তুমি ভৃত্য আজি তার। কিন্তু কহ মোরে নিমকের একনিষ্ঠ হে দাস প্রবর কেবা রাজা তব, কি আদেশ মম প্রতি তাঁর? স্তব্ধ এই নিশীথের দুর্ভেদ আঁধারে মোর লাগি কি সন্দেশ কহ আনিয়াছ বহি।

মোঃ বেগ ঃ নবাব নাজিম মীর জাফর ধীমান রাজা মোর, বঙ্গের প্রতিভূ, মৃত্যুদণ্ড তব প্রতি আদেশ তাঁহার।

সিরাজ ঃ স্তব্ধ হও বিশ্বাসঘাতক, নিমক হারাম ঘৃণ্য ন্যক্কারের কীট, জাহান্নামের স্মরিয়াছে তোরে। বঙ্গের প্রতিভূ কেবা? সিরাজের রক্তধারা ধমনী প্রবাহে গতিবেগে এখনো দুর্বার বঙ্গের গৌরব গর্ব মর্যাদা সম্মান মহিমার অধিকার একমাত্র তার বিজাতীয় পদলেহী কুক্কুরের সেথা কোথা স্থান? ক্ষুদ্রজীবী দাস তুই নহে এক্ষণ-

মোঃ বেগ ঃ রাজাদেশ পালিয়ে এসেছি, বিতর্কের অবসর নাই সিরাজ প্রস্তুত হও। রাত্রি শেষ আসন্ন প্রভাত।

সিরাজ ঃ ধন্যবাদ নিমকের দাস, একটি নিমেষ পল অবসর তারো নাহি আজ। অন্নপানে পুত্র স্নেহে মাতামহ আজন্ম পালিল, সেই তুই সিরাজের বাল্য সহচর না না বৃথা তিরস্কার চিরন্তন নীতি দুনিয়ার ব্যতিক্রম কোথা কবে এর? শোন বেগ, মরিতে প্রস্তুত আমি বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নাহি তায়। শুধু আফসোস। জীবনের স্বপ্ন মোর হোলো না সফল। ছিল আশা হিন্দু, মুসলমান, ইহুদী খ্রিষ্টান, জৈন বৌদ্ধ কিম্বা অনার্য্য সন্তান সর্ব জাতি সমন্বয়ে গড়িব নবীন এক বঙ্গ। এক জাতি এক দেশ শিক্ষা জ্ঞানে ভ্রাতৃত্বের যুক্ত বেনীকুলে রচিব মিলন তীর্থ ভিন্নমুখী স্রোতস্বিনী সঙ্গম। প্রয়াগ। সেই সে আদর্শ

www.pathagar.com

বঙ্গে ভেদ দ্বন্দ্ব হারা মহাশক্তি মহাসাম্যে করিবে সিরাজ
লোকেত্তের মহাজাতি এক ভিত্তিমূল ধর্ম যার কৃষ্টি স্বাধীনতা,
জাতীয়তা কল্যাণের নিগূঢ় প্রকাশ নিখিলের নরনারী আত্মার
আত্মীয় স্বপ্ন মাঠ এই মোর আকাশ কুসুম সম আজি হায়।
আকাশে মিলায়।

(সহসা যেন তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি চিৎকার করিয়া উঠিলেন।।

হরে ঘাতক! হান
অস্ত্র জাল বোয়ে যায় রাজ রক্তে
শুচি স্নাতা শাপমুক্তা হউক মোদিনী।

(মোহাম্মদী বেগ তাহার প্রসারিত বক্ষে তীক্ষ্ণ ছোরা আমূল বসাইয়া ছিলেন।)

হে ধাত্রী বসুধা বঙ্গ জননী আমার!
এই তপ্ত রক্তধারে মোর দাসত্বের
অভিশাপ চিরতরে মুছে যাক তোর।

কলিকাতা ১৩৪৮

www.pathagar.com

মীর-জাফরের কৈফিয়ত্

ফররুখ আহমদ

মীর-জাফরের সাথে দেখা হল একদা নিশীথে
আশ্চর্য্য স্বপ্নের মত (অহিফেন ছিল যা শিশিতে
যথারীতি সন্ধ্যা রাত্রে করেছিনু নিঃশেষে সাবাড়,
মধুর আমেজ তার পৃথিবীর সীমা করে পার
নিয়েছিল একেবারে মীর-জাফরের দেহলিতে)!
কিছুটা অচেনা আর কিছু চেনা শহরতলীতে
দেখে তা'রে সারা মন পূর্ণ হল খুশীর মউজে!
জানি না ক'ঘন্টা ঠিক সে রাত্রে ছিলাম চোখ বুজে
পুরাপুরি ধ্যানমগ্ন (ছিল না হিসাব সময়ের),
শুনেছি যখন দীর্ঘ কৈফিয়ত মীর-জাফরের!
বলিল সে,

'অদ্ভুত পৃথিবী, যার হাল হকিকত
মূর্খ বা দানেশমন্দ বোঝে নাই কেউ এ যাবৎ;
বোঝে নাই মর প্রাণী; এমন কি ফেরেশ্‌তা গোরের
বোঝেনি রহস্য এই দুনিয়া
র রাত্রি ও ভোরের!
নির্বাক বিস্ময়ে তাই পরিক্রমা দেখে পৃথিবীর,
বিস্ময়ে দেখে সে চেয়ে ওঠা-নামা বিভিন্ন জাতির,
চরিত্র, চাতুর্য্য, চুক্তি, চক্রান্ত, বিচিত্র ব্যবহার!

"হায়তা দারাজ খান! এসেছো কি দিতে সমাচার
অবোধ্য সে দুনিয়ার কোন এক চক্র ব্যূহ থেকে?
অথবা দুর্বুদ্ধি নিয়ে এলে শুধু, যেমন অনেকে
অনর্থক নিয়ে আসে অপযশ বিগত সন্ধ্যার,
এবং আমার কথা কেউ ফিরে করে না প্রচার
পৃথিবীতে! নিতান্ত কদর্থে মীর জাফরের নাম
পরচর্চাকারীদের রসনার বাড়ায় আরাম,
অথচ কখনো জানি প্রতিবাদ হয় নাই এর
কোন দিন!

"সংক্ষেপে বক্তব্য আমি বলে যাই ফের,
জেনে নিয়ে জানাবে তা পরিচিত মহলে তোমার,
কারণ রচিত পুঁথি রয়েছে যা সম্মুখে সবার
অনেক প্রকৃত তথ্য কিম্বা সত্য পাবে না সেখানে
জাফরের দরবারে জেনে যাবে তুমি যা এখানে।

www.pathagar.com

"পার্থিব লোভের উর্ধ্বে বহু দূরে র'য়েছি যদিও
তবু মানুষের কাছে উল্টাভাবে আমি স্মরণীয়,
কেননা আমার ত্রুটি কারু আর নাইতো অজানা!
ঐতিহাসিকেরা মিলে এক সাথে খুঁড়েছে বিছানা,
সমাধির শান্তি ভেঙে কোলাহল করেছে সকলে;
সহজে যা চাপা যেতো বলেছে সে কথা দলে দলে।

"ঐতিহাসিকের সাথে যাবতীয় পরচর্চাবিদ
এ ক্ষেত্রে পেয়েছে জানি অন্তরের বিশেষ তাকিদ,
আমার কলংক ঢাক পেটায়ে খুশীতে নির্বিবাদে
দিয়েছে কলংক আরো, বলে গেছে দাসত্বের ফাঁদে
আমিই ফেলেছি নাকি লুপ্ত ক'রে জাতির স্বাধীন
অস্তিত্ব বা মুক্ত সত্তা; একা আমি এনেছি দুর্দিন
পূর্ণ সৌভাগ্যের পথে! আজাদী বা আজাদ রাষ্ট্রকে
বিকায়েছি আমি নাকি স্বার্থান্বেষী মতলবের ঝোঁকে!
'বে-ঈমান', 'মুনাফেক' গালাগালি দিয়ে ইত্যাকার
বলেছে আমাকে ওরা 'স্বার্থান্ধ শয়তান', 'কুলাঙগার'
কওমের শত্রু নাকি আমি!

"কিছু সত্য বলে মানি
অগত্যা আংশিকভাবে, কিন্তু এও ভালোভাবে জানি,
সর্বনাশের দোষ পুরাপুরি চাপাও এ ঘাড়ে
সে ভীষণ সর্বনাশা এসেছিল আগেই দুয়ারে,
উপলক্ষ এ গরীব। ভিত্তি ছিল আগেই দুর্বল,
সমাজের বুনিয়াদে ধরেছিল আগেই ফাটল
পতনের শেষ চিহ্ন। ভাবেনি যা কেউ কোন দিন
বোঝে নাই ঘুণ ধরা সমাজের অবস্থা সংগিণ
সুদুর্লভ ব্যতিক্রম মুষ্টিমেয় জ্ঞানী গুণী ছাড়া
মৌতাতে মগ্ন এ জাতি বোঝেনি সে মৃত্যুর ইশারা।

"বিচ্ছিন্ন জনতা হল যে শক্তিতে অচ্ছেদ্য মিল্লাত
যে শক্তিতে কেটে গেল অন্ধকার জুলমাতের রাত,
দ্বীনের সে প্রাণ-শক্তি বোঝে নাই সর্বসাধারণ।
কৌশলী আমীর বাদশা ছিল এর নিমূঢ় কারণ
ব্যক্তিস্বার্থে মগ্ন যা'রা চায় নাই ইসলামী জামাত,
ক্রমাগত টেনে শুধু নামায়েছে জাতির বরাত।
নিঃসঙ্গ প্রয়াস যত যে কারণে হয়ে গেল শেষ
প্রকৃত আদর্শবাদী অন্ধকারে হ'ল নিরুদ্দেশ।

www.pathagar.com

"হায়াত দারাজ খান! তুমি আমি যাদের ওয়ারিশ,
অন্তত যে দাবী তুলে চাই আজো কিঞ্চিৎ বখশিশ,
কি কারণে নিল তারা জিন্দেগীতে লাঞ্ছনা অশেষ?
কি কারণে এসেছিল আউলিয়া, আলেম, দরবেশ
হেজাজের মাটি থেকে বিজাতীয় হিংস্র পরিবেশে?
তৌহিদের আলো নিয়ে কেন এল অচেনা এ দেশে
সর্বত্যাগী, সেবাব্রতী চেয়ে কোন্ রোশনি দ্বীনের
বিগত অধ্যায় হল ইতিহাসে? ... হৃদয়হীনের
চক্রান্তে সে সিলসিলা শেষ হ'ল কিভাবে, কখন
বৈশাখী ঝড়ের রাতে ছায়াপথ মিলায় যেমন
জানো তো সে সব কথা।

"জানো আরো হালুয়া মালাই
চেয়ে কা'রা দুনিয়ায় আদর্শকে ভেবেছে বালাই,
ভাড়াটিয়া মোল্লা, পীর, পাঠান বা মোগল সরকার
আদর্শের পথে কেন করে নাই যা' কিছু দরকার,
বরং প্রশ্রয় দিয়ে বাড়ায়েছে নতুন জঞ্জাল!
জেনে রাখো ব্যঙ্গবিদ দিয়ে গেছে সেই তালে তাল
মীর-জাফরের যুগ। কোরানের মানেনি নির্দেশ,
মিথ্যা ও মৃত্যুর দিকে ছিল জেগে আঁখি নির্নিমেষ
ইবলিসের অনুগত।

"অতি ধূর্ত আকবর বাদশার
ভাবশিষ্য, চেলা যত ছিল নিয়ে লা-দ্বীনি ব্যাপার।
সমন্বয়-পন্থীদের চিন্তাধারা অথবা বেদাত
বিকায়ে মৌলিক সত্তা এনেছিল আত্মঘাতী রাত।
না মেনে মহান শিক্ষা মুজাদ্দিদ আলফেসানীর
ব্যতিব্যস্ত তরুণেরা ছিল নিয়ে অবৈধ ফিকির।

"বিজাতীয় রমণীর রঙ্গ রস হৃদয়ে, মগজে
বিজাতীয় ভাবধারা দিয়েছিল অত্যন্ত সহজে,
বিশেষ রিপুর চক্রে স্থান-ভ্রষ্ট পৌরুষের শিলা
চেয়েছিল রাত্রি দিন অনির্বাণ বৃন্দাবন লীলা,
এবং তা পেয়েছিল সুপ্রচুর স্বর্ণ বিনিময়ে।
মিশ্রণ কাহিনী সেই ভাবি আমি নির্বাক বিস্ময়ে।

"মুক্তপক্ষ শাহবাজ সে নেশায় চড়ুই যেমন
তৌহিদী কালাম ভুলে গেয়েছিল কীর্তন, ভজন।

www.pathagar.com

'কৃষ্টি সমন্বয়ে' ফের জন্মেছিল যে রুগ্ন সন্তান
স্বভাবত ছিল তার কাশী কিম্বা কিষ্কিন্ধার টান,
মক্কা মদীনার কথা যে কারণে হ'ল তার ভুল;
বিজাতীয় পরিবেশে পেয়েছিল প্রাধান্য মাতুল।

"বহু পৌত্তলিক প্রথা, দুর্নীতি, শোষণ, অবিচার
পালটিয়ে ভোল শুধু ঢুকেছিল ঘরে নির্বিকার
অথবা ধরায়েছিল ঈমানে বা বিশ্বাসে ফাটল,
দিয়েছিল শুধু এনে সংশয়ের আঁধার অতল
ভোলায়ে তৌহিদ জ্ঞান দিয়েছিল দেবতা নূতন
দিলেন প্রকৃত তথ্য বোঝে নাই সমাজ তখন।

"সে দিন ভাবের ঘরে করেছিল যারা লেনদেন
তাদের অনেকে জানি এনছিল মৃত্যু অহিফেন,
বেদান্তের সাথে কেউ খুঁজেছিল পূর্ণ সমন্বয়,
সূফীর খোলসে কেউ এনছিল মিথ্যা ও সংশয়।
বানপ্রস্থ মেনে নিয়ে জিন্দেগানি কাটায়ে হুজরায়
অনেকে পীরের গদী চেয়েছিল অন্যের মুজরায়,
বংশগত সূত্রে কেউ চেয়েছিল 'নজর নিয়াজ';
মালিকানা সূত্রে কেউ খুঁজেছিল শিষ্য, লাখেরাজ।
রাজনীতিকের মতে সর্বক্ষেত্রে দিয়ে মাথা ঝাঁকি
পুরা তেজারতি চালে করেছিল মোল্লারা মোল্লাকি।

"ঐশ্বর্য্য-বিলাস লুব্ধ মেদপুষ্ট অসংখ্য আলেম
শাসকের ইশারায় সেজেছিল তখন জালেম!
তাদের ক্ষমার দ্বার মুক্ত ছিল রইসের তরে,
ক্ষমাহীন ছিল তারা মিসকিন বা দুঃস্থের উপরে,
বৃহৎ ব্যাপার ছেড়ে অতি ক্ষুদ্র ভগ্ন অংশ নিয়ে
ব্যতিব্যস্ত ছিল তারা মূল সত্যে কদলী দেখিয়ে।

"সে দিন কা'বার পথ ছিল জুড়ে অসংখ্য মাজার,
নৃত্য গীত করেছিল কোরানের স্থান অধিকার,
উজ্জ্বল সূর্য্যের মত ইসলামের মুক্ত মানবতা
বর্ণশ্রম মেঘে শুধু দেখেছিল বিষম ব্যর্থতা।
উচ্চ নীচ ভেদাভেদ, বহু ক্ষেত্রে বৈষম্য রক্তের
দিয়েছিল ব্যথা প্রাণে মুষ্টিমেয় ইসলাম ভক্তের।
নামত ইসলামী সাম্য মেনে নিয়ে দেখেছি তখন
কার্যক্ষেত্রে ছিল চালু 'মুসলমান শূদ্র বা ব্রাহ্মণ'।

www.pathagar.com

"জীবনের পূর্ণাদর্শ-মূল নীতি ছেড়ে কোরানের
সুবিধাবাদীর পন্থা নেমেছিল অতলে পাপের,
এত্তেবায়ে সুন্নাতের পরিবর্তে শয়তান সেবা
প্রচলিত হয়েছিল বহু কাল ধ'রে। এ দেশে বা
অন্য কোন দূর দেশে রাষ্ট্রাদর্শ ছিল না সে দিন,

খিলাফতে রাশেদার শেষ চিহ্ন তখন বিলীন
দুনিয়া কারবালা মাঠে শত এজিদের অত্যাচারে।
মজ্‌লুমের লোহু ধারা অগণন ফোরাত কিনারে
জমে উঠেছিল, আর সংখ্যাহীন ভুলের পাহাড়
মুস্‌লিম রাষ্ট্রের নামে ছিল জেগে ক্রূর নির্বিকার।

"যদিচ আনন্দ ছিল শাহ্‌জাদা, নবাবজাদার
যেমন এখনো আছে, সর্বদাই কিছু অংশ যার
সুনির্দিষ্ট ভাবে থাকে মোসাহেব ভাগ্যে চিরকাল
সহস্র সুন্দরী মাঝে বে-সামাল সন্ধ্যা ও সকাল।
যৌন আবেদনে ঘেরা নৃত্যলীলা, শিল্প, অভিনয়
আদর্শ শিক্ষার চেয়ে গ্রহণীয় ছিল সে সময়।
উৎকট লালসা লোভে, ব্যভিচারে উদ্দাম উল্লাসে
সে দিনের অভিজাত মত্ত ছিল সর্পিল উচ্ছ্বাসে।
বল্‌গা-হারা সেই পুর্তি, নীতিহীন সেই অনাচার
দুনিয়ার বুকে শুধু ক'রেছিল দোজখ গুলজার।

"ঐশ্বর্য্য অপরিমাণ, বিলাসের সাজ-সরঞ্জাম
যুগিয়েছে সেই যুগে অফুরন্ত খুশীর আঞ্জাম।
অকল্পিত মিহি বস্ত্রে তন্বী দল প্রিয় নগ্ন তনু
দেখিয়েছে অপরূপ সজ্জার বিচিত্র বর্ণধনু
অনুরূপ লেবাসেই নর-রূপী বিলাসী বানর
সদরে, অন্দরে, ঘরে দিয়ে গেছে খুশীর খবর।
অকথ্য, অবর্ণনীয় বিলাসে বা সে রূপ- সজ্জায়
আদ্যোপান্ত এই জাতি মেতেছিল পুর্তির হাওয়ায়
ভাবেনি তখন কেউ দেখা দেবে চরম সংঘাত।
আনন্দের মধ্যে পথে অকস্মাৎ হবে কিশ্‌তী মাত।

"আজাদীর যে ভূমিকা-কার্য্যধারা গঠনমূলক
সে ভূমিকা ছেড়ে কর্মী নিয়েছিল পন্থা রসাত্মক।
হালুয়ার ভাণ্ড পেয়ে যেমন উদভ্রান্ত কানামাছি
সমগ্র পৃথিবী ভুলে সারাক্ষণ ঘোরে কাছাকাছি,

www.pathagar.com

তেমনি মৌতাতে মগ্ন সে দিনের সব ভাগ্যবান
সকল কর্তব্য ভুলে খুঁজেছিল আনন্দ বিতান।
ছিল যে অবৈধ পাপ গুলিস্তাঁয় সাপের মতন
মারাত্মক বিষ তার কেউ আর বোঝেনি তখন।

"পিতৃ পরিচয়হীন সন্তানের বর্ধমান গতি
তখন মহল-প্রান্তে জাগায়েছে দীপ্ত 'শরাফতি'।
অসংখ্য তরুণী বাঁদী মিটায়েছে ধনীর লালসা
জারজ বেড়েছে যাতে 'অভিজাত' গোত্র হতে খসা।
কদর্য্য সে পঙ্কিলতা গেছে মিশে সমাজ সত্তায়,
পাপের জীবাণু যত গেছে ঘুরে রাত্রির ছায়ায়
বল্‌গা-হারা; উচ্ছৃঙ্খল। ভাবে নাই কেউ পরিণাম
প্রতি বালাখানা ঘিরে জেগেছে যখন জাহান্নাম।

"উত্তরাধিকার সূত্রে পরিবেশ ছিল যা আমার
ছিল না সেখানে রোজা, ছিল শুধু অঢেল ইফ্‌তার,
ছিল না মৌলিক নীতি ইসলামের -সালাত, জাকাত;
ছিল না জেহাদী শক্তি, উখুয়াত, সুদৃঢ় জামাত;
সামাজিক ঐক্য সূত্র শৃঙ্খলার সাথে ছিল দূরে
প্রবৃত্তির পাশবতা ছিল জেগে উচ্ছৃঙ্খল সুরে।
উপরন্তু সমাজের উর্ধস্তরে ছিল মুনাফেকী
কৃত্রিম মুখোশে ঢাকা ছিল শুধু অকৃত্রিম মেকী।

"অপদার্থ অযোগ্যের ছড়াছড়ি খান্দানী সুবাদে
কওমের অগ্রগতি রুখেছিল অতি নির্বিবাদে,
চাপা পড়েছিল যাতে পূর্ববর্তী শ্রম ও সাধনা;
নিরুদ্ধ গতির মুখে জমেছিল বহু আবর্জনা।
চরিত্র-বর্জিত জাতি লক্ষ্যভ্রষ্ট কিম্বা লক্ষ্যহীন
খোঁজেনি তখন আর কর্মময় আজাদীর দিন।
সময়ের অপচয়ে কারু প্রাণ হয়নি উদ্বেল,
ঘরে ঘরে ছিল চালু কবুতর, তিতিরের খেল।

"জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা, গবেষণা অথবা সন্ধান
দীর্ঘ যুগ যুগান্তর পায় নাই কুত্রাপি সম্মান,
মৌলিক মনন শক্তি বাদ দিয়ে বাঁধা বুলি শিখে
কাটায়েছে কাল শুধু পণ্ডিতেরা পদটীকা লিখে,
যে কারণে দীর্ঘ দিন আবিষ্কার হয়নি নূতন
আলস্য দিয়েছে শুধু আজদাহার কঠিন বাঁধন।

www.pathagar.com

তখন কায়িক শ্রম অভিজাত, শরীফ মহলে
পায়নি প্রশ্রয় কোন, ঘৃণাশুধু পেয়েছে বদলে।

"সে দিন সমাজে শুধু বহুবিধ দুর্নীতির ফাঁদ
মালুম বা বেমালুম ছড়িয়েছে আনন্দ আস্বাদ,
পারেনি যা মুছে দিতে জিন্দা পীর বাদশা আলমগীর,
যে ফাঁদের গ্রন্থি চিনে দেখিয়েছে ফিরিঙ্গী ফিকির,
নৈলে তার সাধ্য কোথা অর্ধ নগ্ন ধূর্ত সে বেনিয়া
কিভাবে সে নিয়ে গেল খাঁচা সুদ্ধ আজাদীর টিয়া?

"মোগলের যে ঐশ্বর্য্য আড়ম্বর দু'চোখ ধাঁধানো
দু'দিন পরেই সেটা কেন হল মানুষ কাঁদানো
প্রতিচ্ছায়া ব্যর্থতার? পাকিস্তানী হায়াত দারাজ
পারো যদি ভেবে দেখো ব্যঙ্গোক্তির ছেড়ে কারুকাজ।
ভেবে দেখো অপমৃত্যু কি ফাটলে, কোন্ পথ দিয়ে
অত্যন্ত সহজে আসে সভ্যতার আলোক নিভিয়ে
অতিশয় দ্রুত গতি।

"অকারণে হয় না পতন,
রহস্য-বিলাসী ছাড়ো অযৌক্তিক কথোপকথন
জেনে নিতে পরিস্থিতি সর্বশেষ অথবা সঠিক;
অন্ধ আবেগের চক্রে বুদ্ধিহীন সেজো না বেল্লিক।
উত্থানের মত জেনো পতনেরও রয়েছে কারণ
পাণ্ডিত্যের কথা নয়, বস্তুতঃ এ জ্ঞান সাধারণ।

"আদর্শের পথ-যাত্রী ও জাতির উত্থান যেমন
আদর্শ হারানো পথে পতনের কাহিনী তেমন
সমান বিস্ময়কর। প্রাণহীন প্রাণীর মতই
আদর্শ হারায়ে জাতি দেখে গেছে শূন্যতা অথৈ!
অথবা নিষ্প্রাণ সেই জড় পিণ্ড মুর্দার শামিল
বিকায়ে নিজের সত্তা হয়ে গেছে তাল থেকে তিল।

"নিছক 'মুসলিম' নাম শুনে যদি হও বে-চঈন
অনেকের মত হবে অবস্থাটা তোমারো সঙ্গিন
কেননা কঠিন ঠাঁই দুনিয়ার পথে মুনাফেকী
নামের আড়াল টেনে যত্রতত্র চালু রাখে মেকী।
ইসলামবর্জিত সেই ভূমিকাটা দেখ মুসলিমের
বাড়ায়েছে সংখ্যা আর সংজ্ঞা শুধু তথাকথিতের।

www.pathagar.com

যদিচ অনেক মিঞা তৃপ্তি পান মোগ্‌লাই বিলাসে
জানেন না এইটুকু মৃত্যু এল সে বিষাক্ত শ্বাসে।

"আড়ম্বর-প্রিয় জাতি অন্তঃসারশূন্য সে বেভুল
হারায়ে বিবেক বুদ্ধি বোঝে নাই এ কথা বিলকুল।
জীবনের পূর্ণাদর্শ বন্ধ রেখে কিতাবে, মসজিদে
বহু আত্মপ্রবঞ্চিত ছিল তৃপ্ত সম্মোহিত নিদে।
জড়তা ও ক্লীবত্বের পরিণতি দেখেছি তখন
জাতির মগজে মনে জগদ্দল পাথর যেমন।

"এ কথা স্বীকৃত সত্য, যে শক্তিতে হ'ল অভ্যুত্থান
সেই শক্তি ছেড়ে ফের মারা গেল 'মুসলিম-সন্তান'।
যে দিন সে ভুলে গেল তৌহিদের প্রদীপ্ত প্রেরণা,
যে দিন প্রবৃত্তি পূজা দিল এনে মিথ্যা আবর্জনা,
যে দিন সে ভুলে গেলে ন্যায়, নীতি, সাম্য, সুবিচার।
শ্রমের মর্যাদা, শিক্ষা, অফুরন্ত মূল্য সততার,
সে দিন অলক্ষ্যে তার খুলে গেল মৃত্যুর দুয়ার;
ধ্বংসের জিন্দান-খানা দেখা দিল সম্মুখে সবার।

"সে দিন চলার পথে ক্রমে তার থেমে গেল গতি,
ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কেউ আর বোঝেনি সে ক্ষতি,
দেখেছে নিজের স্বার্থ সকলেই, নিজের কিস্‌মত
চেয়েছে বাড়াতে শুধু কার্যকালে ছাড়েনি বিঘত
তরক্কীর মূলে শুধু হীন স্বার্থ করেছে সন্ধান;
কার্য্যত সে মুনাফেক পিতা যার ছিল মুসলমান।
যে যার কর্তব্য কাজে ফাঁকি দিয়ে সম্মিলিতভাবে
এনেছিল তারা শুধু অপমৃত্যু ইবলিসি প্রভাবে।

"যে দিন অন্তিম শ্বাস দেখা দিল মোগল শক্তির
সে দিন প্রকাশ পেলো নখদন্ত স্বার্থান্ধ চক্রীর
কাড়াকাড়ি, হানাহানি তাজ তখত নিয়ে প্রতি দিন
করে গেলো দুশমনের কব্‌জা দৃঢ়, বাসনা রঙ্গিন।
ফিত্‌না ফসাদের রাজ্য পুরাপুরি দুর্নীতির বাসা
মেটাতে পারেনি আর সংখ্যাহীন লোভীর পিপাসা
স্বার্থ শিকারীর চক্র গুপ্ত পাপ অথবা অশেষ
ষড়যন্ত্র রক্তপাত করেছিল কলঙ্কিত দেশ।

"গদী দখলের দ্বন্দ্ব আত্মঘাতী কলহ, সংঘাত

www.pathagar.com

টেনে এনেছিল শুধু দুর্ভাগ্যের কাল সিয়া রাত।
তৈলহীন শামাদানে ক্ষীয়মাণ সৌভাগ্যের আলো
হারায়ে জীবনী শক্তি যে কারণে আঁধারে মিলালো,
হায়াত দারাজ খান! শতাব্দীর আড়াল এখন
হয়তো অস্পষ্ট বলে মনে হবে সুষ্ঠু সে কারণ
কিন্তু তা অস্পষ্ট নয়।

"স্বার্থের বিষম কদর্য্যতা
যুগে যুগে এ এভাবেই টেনে শুধু এনেছে ব্যর্থতা
খান্নাসের কূট চক্র, ভোজবাজী কিম্বা তেলেসমাত
বারেবারে এভাবেই পেড়িয়েছে জাতির বরাত,
সমৃদ্ধির মর্মমূলে অনায়াসে হেনেছে ছোবল
ভ্রাতৃত্ব, আদর্শহীন শেষ হল যে পথে মোগল।

"সে দিন মাতুল বংশ কিম্বা যত বিদেশী বণিক
সুযোগ-সন্ধানে যারা ছিল জেগে দৃষ্টি নির্নিমিখ,
সর্বত্র সুবিধা পেয়ে লুব্ধ আরো শিকার সন্ধানে
প্রতি ঝোপে ঝাড়ে তা'রা ছিল জেগে স্বার্থান্বেষী প্রাণে
লুব্ধ শকুনির মত কিম্বা ধূর্ত শৃগালের মত
পতনের শেষ ক্ষণে করেচিল চক্রান্ত সতত।

"আত্মকলহের মাঝে পেয়ে তারা সুবর্ণ সুযোগ
করেনি কসুর কোন দিতে এনে চূড়ান্ত দুর্ভোগ।
ভ্রাতৃ-সমাজের বুকে ক্রমাগত ধরিয়ে ভাঙন
অথবা কলহ কালে দিয়ে কিছু 'বুদ্ধির' ফোড়ন
বহু ক্ষেত্রে জানি তারা হয়েছিল সম্পূর্ণ সফল
পেয়েছিল এই জাতি সরীসৃপ পোষণের ফল।

"সে দিন লোভীর চক্রে ছায়াবাজী রাজ্যে ও মসনদে
সুযোগ-শিকারী যত ক'রেছিল লক্ষ্য প্রতি পদে।
উদ্ধত শাসকগোষ্ঠী সর্বদাই অভ্যস্ত শোষণে
আজাদীর সার্থকতা খুঁজেছিল রক্তপায়ী মনে,
সুবর্ণ সুযোগ তাই এসেছিল অসংখ্য আমলার
হয়েছিল জনগণ সম্মুখীন কদর্য্য হামলার।
আমীর, শরীফ যত অকর্মণ্য হেনে বাঁকা ছুরি
শোষণ- পন্থায় শুধু তুলেছিল সে দিন দস্তুরি।
অভ্যস্ত বিলাসে যারা শ্রমকুণ্ঠ, তাদের সন্তান
তৃপ্তিহীন রাত্রি দিন ক'রে গেছে শিকার সন্ধান।

www.pathagar.com

"গরীবের হাড়ে তৈরি হয়েছে তখন ইমারত,
শাহী বালাখানা আর বেশুমার হেরেমের পথ।
কওমের অগ্রগতি হয়েছে তখন চক্র গতি,
অভিনব অর্থ নিয়ে জেগেছে বিকৃত শরাফতি!
ধর্ম ব্যবসায়ী, পাপী কিম্বা ধর্মবহির্ভূত মন
জামাতের পুরোভাগে ইমামতি করেছে তখন
অথবা বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে ঢের ধূর্ত সুচতুর
প্রচুর মুনাফা লুটে ধর্মকেই করেছে ফতুর!
কৌশলী শিকারী যত খেলোয়াড়ী চালে অপরূপ
সিঁদকাঠি না নিয়েও করে গেছে তহ্‌বিল তসরূপ।
নিতান্ত বেহুঁশ বলে জাতি আর পায়নি সম্বিৎ!
এভাবে কোথায় থাকে চিরস্থায়ী আজাদীর ভিত?

"সর্ব শেষ হুঁশিয়ারি মুহাদ্দেস অলীউল্লা শা'র
শোনেনি তখন কেউ বে-খেয়াল কিম্বা বে-কারার!
উদ্দাম উল্লাসে মগ্ন, সংজ্ঞাহারা নেশার মউজে
কেউ ছিল মদমত্ত, কেউ ফের ছিল চোখ বুজে!
আদর্শ ভ্রাতৃত্ববাদ, সুমহান মর্যাদা শ্রমের
রাজতন্ত্রে যথারীতি পেয়েছিল ইশারা যমের!
ভুয়া কৌলিন্যের প্রথা হারামের যত আবর্জনা
সমাজ সত্তাকে শুধু হেনেছিল চরম লাঞ্ছনা
যে কারণে এই জাতি হয়েছিল নির্বীর্য্য দুর্বল;
দুর্ভাগ্যের সাথে তার ক'রেছিল পসরা বদল।

"সমাজ শতধাছিন্ন, দৈনিন্দিন কদর্য্যতা নিয়ে
তখন বিব্রত ছিল সর্ববিধ দায়িত্ব এড়িয়ে,
আজাদি রক্ষার তরে প্রয়োজন হয় যে প্রহরা
তন্দ্রহীন রাত্রি দিন; করেনি সে পথে কেউ ত্বরা।
বরং আচ্ছন্ন কেউ স্বপ্নঘোরে কেউ বা আয়েশে
চেয়েছে কাটাতে দিন, মুগ্ধ রাত্রি অলস আবেশে।
জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা, গবেষণা ধামাচাপা দিয়ে
অগ্রগতিহীন জাতি সহজেই গিয়েছে তলিয়ে।
শতাব্দীর অন্তরালে সে কাহিনী জানো বা না জানো
ব্যর্থতার ইতিকথা এভাবেই রয়েছে সাজানো।

"অযাচিতে খাজনা এসে জমা হত খাজাঞ্চীখানায়
আজাদীর বাজনা শুনে বুদ্ধিজীবী ছিল দো-টানায়

www.pathagar.com

বিবি, বাঁদী বিরিয়ানি কিম্বা নিয়ে কিংখাব মসলিন
আমীর ওমরা যত বোঝে নাই অবস্থা সংগিন।
কাফিয়া, রাদীফ খুঁজে স্বপ্নমুগ্ধ শিল্পী ও শায়ের
শারাবী গজলে মগ্ন পরিস্থিতি পায় নাই টের।
কিঞ্চিৎ প্রাপ্তির লোভে সে দিনের বহু কৃষ্টিসেবী
প্রবৃত্তির তৃপ্তি দিয়ে করেছে প্রচুর মোসাহেবী।
বাঈজীর বাজুহবন্দে বন্দী সেই যুগের তরুণ
নেয়নি দায়িত্ব কোন অতিরিক্ত ঈশ্‌কের দরুন।
নর্তকীর লাস্য-লীলা তৃপ্তি তাকে দিয়েছিল, আর
বংশ গৌরবের তৃপ্তি ছিল প্রাণে শরীফজাদার।

"কৃত্রিম সৌজন্যে ঢাকা সে দিনের সব প্রবঞ্চক
স্বার্থ সুবাদেই শুধু হয়েছিল বিশ্বাসঘাতক।
উন্নত আদর্শ মুখে কিন্তু ছুরি বগল তলায়
এ ছবি সুলভ ছিল সে যুগের উঁচু মহলায়।
নেকড়ে, চিতা ছিল যত খুঁজেছিল সে দিন সুযোগ
ত্বরান্বিত হয়েছিল খান্নাসের কুমন্ত্রে দুর্ভোগ।

"সুযোগ-সন্ধানকারী ছিলাম যে, নাই তাতে ভুল,
এ কথা বেলো না শুধু কূল আমি করেছি নির্মূল।
এ জাতি পোড়ায়েছিল নিজ হাতে নিজের তকদির,
নীতি ও সততা ছেড়ে ধরেছিল রাহা দুর্নীতির,
সাম্য ভ্রাতৃত্বের পথে যেতে কেউ চায়নি সহজে;
ইবলিসের কারখানা ছিল চালু অসংখ্য মগজে।

"মরণের মুখোমুখি অথবা চরম দুর্বিপাকে
যে শক্তি বাঁচাতে পারে ঘূর্ণমান মুসলিম সত্তাকে
পরিপূর্ণ সে আদর্শ, ছেড়ে সেই শাশ্বত ইসলাম
সে দিন বিভ্রান্ত প্রাণ ছিল নিয়ে স্বার্থ বা আরাম।
নিশ্চিত সাফল্য ছেড়ে, আদর্শের প্রাণশক্তি ভুলে
এসেছিল পথভ্রষ্ট দুর্নীতির মৃত্যু উপকূলে।

"রুগ্ন ঈমানের সাথে জেগেছিল তিক্ত অবিশ্বাস,
হীন স্বার্থে আজাদীর উঠেছিল ক্লান্ত নাভিশ্বাস
অনিবার্য পতনের শেষ চিহ্ন ফুটেছে যখন
কিভাবে সে রোগী নিয়ে পাড়ি দেবে জাফর তখন?
প্রাণহীন সভ্যতার বহিরঙ্গ কবে কোন দিন
কাটাতে পেরেছে তার সর্বনাশা ধ্বংসের সংগিন?

www.pathagar.com

"আদতে যে যক্ষ্মা রোগী, বহু মূল্য তার বহির্বাস
দিতে পারে কতটুকু প্রাণ-দীপ্ত বলিষ্ঠ অশ্বাস?
প্রাচীন স্থাপত্য, শিল্প কতটুকু লাগে তার কাজে?
হয় না কি হাস্যকর প্রতি মনে পরিত্যক্ত সাজে
সেই ব্যাধিগ্রস্ত সত্তা? পায় না কি সে মৃত্যু লিপিকা?
এ ক্ষেত্রে ধ্বংসের দূত জাগে না কি ভ্রান্ত অহমিকা?
কিসসা কাহিনীতে লেখা স্ফীত সেই ব্যাঙের মতন
হয়না কি অহংকার শুধু অপমৃত্যুর কারণ?
তবুও বিভ্রান্ত সত্তা বাঁচাতে সে প্রাণহীন ঠাট
পঙ্কিল পাপের পথে করে যায় তবিল লোপাট।

"ধ্বংসের সম্মুখে এসে সে যুগের শাসক প্রধান
চেয়েছিল এ পন্থায় ফিরে পেতে ঐশ্বর্য সম্মান!
দুঃস্থ রায়তের পরে চাপিয়ে রাজস্ব গুরুভার
গদীনশীনেরা যত চেয়েছিল আনন্দ অপার,
প্রজার সর্বস্ব কেড়ে চেয়েছিল বাড়াতে সম্বল;
প্রতিদানে পেয়েছিল রায়তের অনাস্থা কেবল
ইসলামের মূল নীতি যথারীতি ছিল বহু দূরে
পায়নি সান্ত্বনা কেউ দুর্নীতির আত্মঘাতী সুরে।

"আদর্শের প্রাণ শক্তি নিয়ে জাতি হয় অগ্রসর
অথবা আদর্শ ছেড়ে পৌঁছে যায় যেখানে কবর,
মীর-জাফরের দিনে এসেছিল শেষের অধ্যায়,
সত্য বা ন্যায়ের পথে জেগেছিল অসত্য, অন্যায়,
দুর্নীতি ও মুনাফেকী মুক্ত গতি পেল যে কারণে
জবানে ঘোষিত নীতি কার্যক্ষেত্রে এলনা জীবনে
আদর্শের কথা ছিল সেই যুগে নিছক কেতাবী,
জাতির পতন তাই হল জানি কিঞ্চিৎ সেতাবী।

"প্রখ্যাত গাল্পিক রূপে পরিচিত যারা চতুর্দিকে
মূল সত্য বাদ দিয়ে কাহিনীটা করে দেয় ফিকে
কার্যটাই খোঁজে তারা বাদদিয়ে নিগূঢ় কারণ
অতঃপর সে মতেই সায় দেয় সর্বসাধারণ
নিরীহ সে মেষপাল চালকের ইঙ্গিতে নির্বোধ
পরিতৃপ্ত অজ্ঞতায় পায় খুঁজে চিন্তার রসদ।
অথবা সরলমতি মক্তবের পড়ুয়া যেমন
বুদ্ধিহীন, গ্রাস করে শিক্ষকের কথোপকথন

www.pathagar.com

তেমনি নির্বোধ ওরা; শক্তি নাই মৌলিক চিন্তার!
মিথ্যা প্রচারণা শুধু খুলে দেয় ভ্রান্তির দুয়ার।
অথচ সঠিক তথ্য চিরদিন থাকে ধামাচাপা,
সুযোগে চোরের মাল চুরি করে মাপে আলিবাবা,
কল্পিত কাহিনী বাড়ে এ ভাবেই আলিফ লায়লার
প্রকৃত ব্যাপার যেটা কার্যকালে পায় না সে পার।

"বাঘ বা সিংহের বাচ্চা বাঘ সিংহ হয় সর্বকালে
অসংখ্য নমুনা পাবে খোলা চোখে দু পাশে তাকালে,
আকৃতি, প্রকৃতি গুণে হয় না কখনো বিপরীত,
কিন্তু মানুষের ঘরে এ ঘটনা ঘটে কদাচিত;
সামঞ্জস্য থাকে বটে পুরাপুরি বাহ্যিক আকারে
বৈপরীত্য ধরা পড়ে চরিত্র বা গুণের বিচারে।
মর্দে মুজাহিদ পিতা কিন্তু পুত্র খাঁটি মুনাফেক
অত্যন্ত সহজে পাবে এবম্বিধ নমুনা অনেক।

"ঝাণ্ডা খাড়া রেখেছিল দীর্ঘকাল যারা আজাদীর
যাদের চরিত্র, নীতি এখনো বিস্ময় ধরণীর
সভ্যতার মূলে দান সবচেয়ে উন্নত যাদের,
আজাদী বিকালো জেনো অপাদর্থ সন্ততি তাদের।
কেননা ওয়ারিশী সূত্রে পরিত্যক্ত তৈজসের মত
শিক্ষা বা চরিত্রগুণ করায়ত্ত হয় না অন্তত।
নিষ্ফল প্রবাদ বাক্য প্রতারণা করে আগাগোড়া
পূরো না পেলেও নাকি পায় কিছু সিপাহীর ঘোড়া,
কিন্তু আমাদের ভাগ্যে ঘটে নাই কোন প্রাপ্তিযোগ
দুর্নীতির খেলা শুধু দিল এনে চূড়ান্ত দুর্ভোগ।

"জেহাদী তরিকা ছেড়ে দীক্ষা নিয়ে 'সহজিয়া' পথে
প্রাপ্য যা পেল এ জাতি এক দিন নিজের কিসমতে।
নৈতিক স্বপন আর চারিত্রিক দীনতা অশেষ
ফিরিঙ্গী ডাকুর হাতে তুলে দিল স্বাধীন স্বদেশ
তারপর ডুবে গেল নৈরাশ্যের পাথারে অকূলে।
সে পাপ অথবা দোষ নয় এক জাফরের ভুলে।
বহু গুণে যোগ্যতর কিম্বা যদি আরো শক্তিমান
সেদিন নেতৃত্ব নিত হত না সে মুশকিল আসান।

"মীর-জাফরের যারা সহযোগী সহকর্মী আর
আজাদীর ফলভোগী নারী বা পুরুষ নির্বিকার,

www.pathagar.com

রাষ্ট্রের বাসিন্দা যত জ্ঞানপ্রাপ্ত কিন্তু উদাসীন
আজাদী রক্ষার পথে ; এনেছিল একত্রে দুর্দিন।
নৈলে এক জাফরের এই শক্তি ছিল না অন্তত
সকলের স্বাধীনতা মুছে শয়তানের মত।
হারায়ে চরিত্রশক্তি ডোবে জাতি উদভ্রান্ত যখন
বাঁচানো অসাধ্য জেনো সেই মৃগী রোগীরে তখন।

"কি থাকে চরিত্র গেলে? চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হারালে
কি থাকে এ পৃথিবীতে? সর্বক্ষেত্রে তাল দিয়ে তালে
স্বকীয় স্বভাব তুলে প্রতিক্ষণে বিবর্তিত রূপে
অপমান, অপমৃত্যু আনে না কি ডেকে চুপে চুপে
মেরুদণ্ডহীন সেই রুগ্ন জাতি অথর্ব, দুর্বল?
সর্বহারা হয় না কি যে হারায় চরিত্রের বল?
মীর-জাফরের দোষ হতে পারে এ ক্ষেত্রে ততটা
ব্যক্তিগত অপরাধে অপরাধী ছিল সে যতটা।

"সর্বাংশে আমাকে টেনে দোষী করা, ভুল বাস্তবিক,
ঐহিহাসিকেরা শুধু করে কাজ অনৈতিহাসিক,
হামেশা দশের বোঝা চাপা দিয়ে একের গর্দানে
দীর্ঘ শতাব্দীর শেষে কর্ণমূল ধরে ফের টানে!
অন্যের সুলভ কানে পেয়ে পূর্ণ আনন্দ নিষ্কাম।
কর্ণমর্দনের খেলা পণ্ডিতেরা খেলে অবিশ্রাম!
এবং অসহ্য যেটা সে কথাই বলি আমি আজ
বহু পরিচর্চাবিদ অকারণে করে উক্ত কাজ,
প্রদীপ্ত উৎসাহে ধরে বে-ঈমানী মীরজাফরের
এ যুগের কীর্তিমান কড়ুয়ন মেটায় মনের।

"তাজ্জব ব্যাপার বটে!... বক্র গতি এই পৃথিবীর
চক্রান্তে জাহির হয় গুপ্ত পাপ অথবা ফিকির!
যেখানে ঘটনা শেষ কিসসা শুরু হয় সেখানেই
আতিশয্য ছাড়া আর যে গাথায় নূতনত্ব নেই,
তবু তার জের টেনে অকারণে ছড়িয়ে জঞ্জাল
মূর্খ বা দানেশমন্দ কুৎসা গায় সকাল বিকাল।"

www.pathagar.com

পলাশীর স্মৃতি '৯৭

আল মাহমুদ

এসেছে যে অন্ধকার পুনর্বার বাংলার ললাটে
সে লজ্জা স্মরণ করে হাত তুলে দাঁড়ায় সে জাতি
দুই শতাব্দীর গ্লানি জমা আছে হাটে মাঠে বাটে
সিরাজের লাশ নিয়ে হেঁটে যায় মীরণের হাতি।

হেলেদুলে হেঁটে গেছে খন্ডিত সে রাজার শরীর
কত দুঃখ, কত ক্ষোভ কিষানের জুরতপ্ত মুখে
অকস্মাৎ অভিভূত বিস্মৃতির গভীর তিমির
অপসৃত হয়ে যেন বিজয়ের সিংগা দিল ফুঁকে।

আর তো পলাশী নয় । সে মিছিল এখন ঢাকায়
এখনও হাতির পিঠে নিয়ে ফেরে শোকের কেতন;
বলে, ভুলিনি আমরা । অর্ঘ্য দিতে মুক্তির চাকায়
ভুলের মাসুল গুণে শোধ করি পাপের বেতন।

হাতির পায়ের শব্দে দ্যাখো চেয়ে কারা হেঁটে যায়
এতো মুর্শিদাবাদ নয়। এই গজ এখন ঢাকায়।

২২- ৬ -৯৭

www.pathagar.com

ফুলের উদ্দেশ্যে যাই, ফুল তুমি কিছুক্ষণ থাকো
সোনালী হরিণ তুমি, ফুটে থাকো সবুজের শেলফে
দেরাজে
একটি সুদূর তারা, যেন বিপুল সুদূরে রয়েছে
ফুল তুমি কিছুক্ষণ থাকো।
হুমায়ুন কবীর

বুনো ঝাউ গাছে তা তা থৈ থৈ ভূত
ভূতের নৃত্য তা তা থৈ থৈ ভূত
হাজার দুয়ারী চাঁদ দেখে শেষ রাতে
ঝাউ গাছ ওড়ে চাঁদ নেমে আসে চরে
চাঁদে ভূতে থৈ থৈ

লোরকার মতো ওখানে কে পড়ে আছে

লোকটার বুকে একলা সূর্য বহুবিধ নীরবতা
স্বপ্নের সব মশকপূর্ণ চন্দ্রিমা ঝলোমলো
ডালিমের দানা গলে গলে তার লেবাসের কারুকাজ
পঙ্খীরাজের পাখার আওয়াজ শুনবার ছিলোস তারই
চোখ দুটি ছিল বন্ধ
- অন্তর ছিলো হাজার দুয়ারে খোলা

মাথার উপরে ডানা ঝাপ্টায় শকুনের মতো মেঘ।
মেঘের আড়ালে চাঁদ নয় উর্মিচাঁদ
চাঁদ নেমে আসে বনে বাস করে ভূত
ভূতের দু'পাটি জগৎশেঠের দাঁত
ড্রাকুলার মতো হিসহিসে দাঁত প্রান্তরে তোলপাড়

ভগবানগোলা খুব চাছাছোলা
স্বপ্নের মানে বোঝে না হরিণ ফড়িং
ভণ্ড ফকির উকড়ি মিকড়ি
মিরণের ভাই মেঘে চমকায় ভূত
মাঝরাতে মাটি ভিজে হয়ে উঠে লাল
লোকটার বুকে আপেলের মতো আশা

ঝরাপাতা ওগো মহিশূরে যদি যাও

সিরাজদ্দৌলা

আবদুল হাই শিকদার

www.pathagar.com

বলো পলাশীর জমাট নীলের নীচে
পথ চেয়ে লড়েছিলো প্রেমিকেরা

খঞ্জর তার পাঁজরে কি বিঁধেছিলো
কলিজার খুন ঝরেছিলো কতোটুকু
কতোবার ছিলো তৃষ্ণার কাতরানি
গভীরতাগ্রাহী চোখ দুটো তার কাকে চেয়েছিলো কাছে

কারো করেছিলো স্বপ্নকে ছিনতাই
অর্থবিহীন কোটি সবুজের পাশে
একটি সবুজ কার বুকে ছিলো লাল
হেকুবার মতো আমিনার শোক লুৎফার বুকে নদী

আমরা সবুজ মাঠের মধ্যে যাই
সবুজ ফড়িং লাফ দিয়ে ক্ষেপে ওঠে
আমরা আকাশে সূর্য সূর্য চাঁদ
ডালিমকুমার ডালিমকুমার মৌন পঙ্খীরাজ
চৌকাঠ খুলে কাশে উদাসীন ঝিঁ ঝিঁ ঃ
আমি চান মিয়া সূর্য আমার ভাই
তার খুব জ্বর তারে কেন ডাকাডাকি
আমারেই কন মজুর লাগবে ক্ষেতে,
কাস্তে কোদাল কি নেব সঙ্গে কন

গরম কবজি নরম রমণী মেখে
গন্ধের ঘোরে ঝিম মেরে চিতাবাঘ
বাঘছাল খোলে তা তা থৈ থৈ ঝাউ
কুয়াশা মলিন নিঃশ্বাস জমে শাদা
শীতে শীতে শেষরাত শ্রীরঙ্গপত্তম

অশ্বারোহীর চোখ জুড়ে কাল ঘুম
ঘুমের মধ্যে আশা আশা চিৎকার
আশা বললেই আশালতা দেবী
মুর্শিদাবাদ বকুল খোয়ানো গাছ
কফিনের পাশে অদ্ভুত সব ভূত
মাথা নত করে নখ দিয়ে মাটি খোঁড়া
তারার আগুন খুব বড় করে এই কথা লেখা ছিল

www.pathagar.com

খঞ্জর তার পাঁজরে বিদ্ধ ছিল

কফিনের পাশে অস্থির রাত দিন
কফিন কফিন গোরখোদকের লালা
মাথার উপরে লাল নীল দাঁড়ি কমা
বাজে পোড়া গাছ মার্বেল হাতে নেয়া
সেই মার্বেল গড়িয়ে গড়িয়ে পানি
পানি খেতে চাই-
আকাশ ফাটিয়ে মুখ ভ্যাংচায় রোদ ঃ
আমি আনোয়ার হোসেন সিরাজ করি
মঞ্চে মঞ্চে দিন রাত খোঁড়াখুঁড়ি

লোরকার মতো একা পড়েছিলো লাল
লালের হৃদয় সবুজ মেশানো ছিলো
মেশানো সবুজ মাটি ফুঁড়ে ফুঁড়ে গাছ
গাছের হৃদয়ে সবুজ কোথাও নাই

লোকটাকে ঘিরে হাজার দুয়ারী ধাঁধা
লোকটার দেহ একা পড়েছিলো মাটিতে

www.pathagar.com

মীরজাফর

মতিউর রহমান মল্লিক

মীরজাফরের সম্বিৎ ফেরে নাকো
স্বদেশ প্রেমের আকাশ খিলানে
যতই না তারে ডাকো
যতই না তারে কাছে টেনে করো নিয়মিত গলাগলি
যতই না তারে নীতিকথা করো, কানে কানে বলাবলি
জাতির স্বার্থ দেবে সে জলাঞ্জলি

মীরজাফরের আত্মীয় নয় সিরাজেরা কোনোদিন
উমিচাঁদরাই তার কাছে সব
লুৎফা অচেনা, তুচ্ছ এবং হীন
জগৎশেঠেরা পরাণবন্ধু তার
মীরজাফরের কাছে কেলাইভ একান্ত অবতার
ওয়াট্‌স-বল্লভ পরাণ বন্ধু তার

মীরজাফরের রক্তে থাকে যে ষড়যন্ত্রের বীজ
সকল বিবেক তাই দিতে পারে অন্যের কাছে লিজ
জামাই আদরে বাড়ি ডেকে আনে কুমীরের জাত—
বজ্জাত ইংরেজ
বন্ধক দেয় তাদের নিকটে নিজের সূর্য, নিজের আলোর
তেজ

দুধকলা দিয়ে পোষে জাতসাপ—বজ্জাত ইংরেজ

মীরজাফরের ঘষেটি বেগম থাকে
গোপনে গোপনে সিরাজের পথে কাঁটাই বিছিয়ে রাখে
মীরনের মত খুনীরে গড়েছে নিজেরই হস্তে সে
মীরজাফরের ছেলেই প্রথম সন্ত্রাসী জানি বাংলার
ইতিহাসে
হত্যা ও লুট এই বাংলায় প্রথম এনেছে সে

মীরজাফরের নীতির বালাই তিল
পরিমাণ নেই এ কথা সবাই জানে
তাই সে পুতুল পলাশীর ময়দানে
স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করে চড়া দামে কেনা আজাদীর মঞ্জিল
মীরজাফরের নীতির বালাই নেই নেই এক তিল
মীরজাফরের মননের ঠিক নেই

www.pathagar.com

শত্রুর হাতে তুলে দেয় দেশ সকলের সামনেই
তারতো কেবলই তখ্ত-ই-তাউস চাই
গদি ও ক্ষমতা কেবলই তার আশনাই
বিত্ত-বেসাতি শুধু তার আশনাই
মীরজাফরের স্বভাবের ঠিক নেই

মীরজাফর সে স্বীকার করেনি সিরাজের কোনো কাজ
রাখতে চায়নি সিরাজের কোনো স্মৃতি
মীরজাফরের চরিত্রে ছিলো ইতিহাস বিকৃতি
দুশমনদের পদলেহনের নিয়মে সে ছিলো সতত সরফরাজ
মীরজাফর সে স্বীকার করেনি অতীতের ভালো কাজ
মীরজাফর সে বিভীষণ চিরকাল
এজিদ ছাড়া সে অন্য কিছুই নয়
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিষমিশ্রিত ভয়াবহ জঞ্জাল
মীরজাফর সে বিভীষণ চিরকাল

www.pathagar.com

হারজিত

আসাদ বিন হাফিজ

পলাশীতে হেরে গেছে নবাব সিরাজ
হেরে গিয়ে জিতে গেছে
মরে গিয়ে বেঁচে আছে
পেয়েছে প্রীতির ডালি, হৃদয়ের তাজ
অম্লান টিকে আছে হেরেও সিরাজ।

জিতেছে কুটিল দ্রোহী-কালের ভীলেন
জিতে গিয়ে হেরে গেছে
ঘৃণা শুধু পেয়েছে সে
হেনেছে আঘাত যত পারে নাই সেন
অভিশাপে তাই ঢাকে কালের ভীলেন।

অমল খেয়েছে তারে ক্ষমতার সাপ
গোলামী সে যত শেখে
দাসখত যত লেখে
ততই বরাদ্দে তার জমে অভিশাপ
ক্ষমাহীন ইতিহাস ভুলে না তো পাপ।

সব জেতা জেতা নয়-হারা নয় হারা
প্রভুর দাপট যায়
গোলামেরা কে কোথায়
সময় যে বলে দেয় বিজয়ী সে কারা
জেতা শুধু জেতা নয়, হারা নয় হারা।

আজো তাই ভালোবাসা রয় অম্লান
হৃদয় হৃদয় টানে
ভালোবাসা প্রাণে প্রাণে
সিরাজের ভালোবাসা, হৃদয়ের টান
পারে না মুছতে আহা কোন বেঈমান।

www.pathagar.com

দুটি সনেট

হাসান আলীম

সিরাজের প্রিয়মুখ

এই সেই খোশবাগ নীলমণি রক্তাক্ত ভূভাগ
এই খানে কথা বলে বেদনার রক্ত ইতিহাস
এইখানে শুয়ে আছে সিরাজের খুনঝরা লাশ
শেষ সূর্য স্বাধীনতা বাঙলার, করুণ বেহাগ।

আমি শুধু পাইটের বিরহের বসন্ত পাখীরা
কুহুকুহু কলস্বরে বেদনার্থ লুৎফুন্নেসার
শায় গীত, লক্ষ লক্ষ বিধবার কৃষ্ণ কণ্ঠস্বর
কেঁপে ওঠে আরশের ছায়াতল, কাঁপে না পাপীরা।

নির্জন কান্তার জুড়ে কাঁদিতেছে আরও কতজন
প্রিয়জন হারানোর বিরহ বিচ্ছেদ বেদনায়
নিঃশব্দ সমাধিতলে ভালোবাসা শামাদান জ্বেলে,
এই সব বেদনার কথামালা না বলে না বলে
মৃগনাভী হরিণেরা ছুটিতেছে নীল জোছনায়
খুঁজিতেছে সিরাজের প্রিয়মুখ, আপনভুবন।

বেদনার জলে

এই সেই ভাগীরথী ভগবানগোলা-এইখানে
ভেসেছিল বেদনার জলে হাল ভেঙে যে নায়ের
মাঝি, ভেসে ওঠে সেই সব প্রিয় নীল নক্ষত্রের
অসহিস ঘোড়াদের হ্রেষাধ্বনি নীল আসমানে,
দিগন্তের গাঙচিল ওড়ে আনমনে, কত সব
বেদনার জোনাকিরা খুন ঢেলে যেন আলো জ্বেলে
খুঁজে ফেরে প্রিয়জন-হৃদয়ের রক্তমধু ঢেলে
পাবে কি সন্ধান তার থেমে গেছে সব কলরব।

ধীর লয়ে বহে নদী বহে বায়ু হায় গাঙচিল
বার বার প্রিয়জন খুঁজে খুঁজে না জানি কোথায়
নীলঘাসে মুখগুজে পড়ে আছে অসহ্য ব্যথায়
চারদিকে ধুসরতী জীবনের নেই অন্তঃ মিল।
এখানে থাকে না সত্য সনাতন কোন মহাত্মন,
মায়ের আঁচল থেকে বার বার হারায় সুজন।

www.pathagar.com

ন্যায়বাদী বীর সিরাজ জাগো

শামসুল করীম খোকন

মীর জাফরের কূটচালেতে ভাঙছে সুখের ঘর
বইছে কত স্বাধীন দেশে নির্যাতনের ঝড়।
অট্টহাসি হাসে ওরা শয়তানী সাজ ধরে
বিদেশ প্রভুর ইংগিতে যে সর্বদা যায় লড়ে।
হিংস্রনখর, দম্ভ আচার, বাচাল কথার মাঠে
বাইরে মেকী আভরণ আর ভিতরে সিঁদ কাটে।
দেশের স্বার্থ বিকিয়ে ছড়ায় দেশপ্রেমের বাণী
পাপিষ্ঠ নরাধম ওদের কর্মে বাড়ে গ্লানি।
ঘাপটি মেরে থেকেই ওরা হিংস্র ছোবল মারে
স্বাধীনতা হরণ করে নিষ্ঠুরতার ধারে।
বর্ণচোরা মীরজাফরও আছে মোদের দেশে
পরের সুতার টানে নাচে মধুর হাসি হেসে।
গর্জে উঠে হুংকারে আজ গুঁড়াও ওদের হাত
ন্যায়বাদী বীর সিরাজ জাগো কাটুক দুঃখের রাত।

দু'টি লিমেরিক

নাসির হেলাল

১
এখনো কি পলাশ ফোটে গায় পাখি গান
জন্মে কি পলাশী মাঠে ধান কাউন পান
ঘষেটি কি এখনো ছোটে
মস্তিকা কি মধু লোটে
রায়দুর্লভ জগৎশেঠ আবার তান ধরেছে তান।

২
উমিচাঁদের নাতিপুতি জগৎশেঠের পুলা
রাঁধা বাড়া চলছে ভালই চুয়াত্তরের চুলা
ফের পলাশী করছে নাচ
ভয়াল মৃত্যুর পাই যে আচ
আশার আলো নেই কোথাও ঝুলিয়ে দিছে মূলা

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অংক ঃ প্রথম দৃশ্য

সময়ঃ ১৭৫৭ সাল, ১০ ই মার্চ। স্থানঃ নবাবের দরবার।

[চরিত্রবৃন্দঃ মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে-নকীব, সিরাজ, রাজবল্লভ, মীরজাফর, জগৎশেঠ, রায়দুলর্ভ, উৎপীড়িত ব্যক্তি, প্রহরী, ওয়াট্‌স, মোহনলাল।]

(দরবারে উপস্থিত-মীরজাফর, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, উমিচাঁদ এবং ইংরেজ কোম্পানীর প্রতিনিধি ওয়াট্‌স। মোহনলাল, মীরমদন, সাঁফ্রে অস্ত্রসজ্জিত বেশে দন্ডায়মান। নকীবের কণ্ঠে দরবারে নবাবের আগমন ঘোষিত হল।)

নকীব। নবাব মনসুর-উল-মুল্‌ক সিরাজ-উ-দ্দৌলা শাহকুলী খাঁ মীর্জা মুহম্মদ হায়বতজঙ্গ বাহাদুর। বা-আদাব আগাহ বাশেদ।

(সবাই আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াল। দৃঢ় পদক্ষেপে নবাব ঢুকলো। সবাই নতশিরে শ্রদ্ধা জানালো।)

সিরাজ। (সিংহাসনে আসীন হয়ে) আজকের এই দরবারে আপনাদের বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করা হয়েছে কয়েকটি জরুরী বিষয়ের মীমাংসার জন্যে।

রাজবল্লভ। বে-আদবী মাফ করবেন জাঁহাপনা। দরবারে এ পর্যন্ত তেমন কোনো জরুরী বিষয়ের মীমাংসা হয়নি। তাই আমরা তেমন-

সিরাজ। গুরুতর কোনো বিষয়ের মীমাংসা হয়নি এবং এই জন্যে যে, গুরুতর কোনো সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে এমন আশঙ্কা আমার ছিল না। আমার বিশ্বাস ছিল যে, সিপাহসালার মীরজাফর, রাজা রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, তাঁদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ থাকবেন। আমার পথ বিঘ্ন সঙ্কুল হয়ে উঠবে না। অন্তত নবাব আলিবর্দীর অনুরাগভাজনদের কাছ থেকে আমি তাই আশা করেছিলাম।

মীরজাফর। জাঁহাপনা কি আমাদের আচরণে সন্দেহ প্রকাশ করছেন?

www.pathagar.com

সিরাজ। আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাবার কোনো বাসনা আমার নেই। আমার নালিশ আজ আমার নিজের বিরুদ্ধে। বিচারক আপনারা। বাংলার প্রজাসাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করতে পারিনি বলে আমি তাদের কাছে অপরাধী। আজ সেই অপরাধের জন্যে আপনাদের কাছে আমি বিচারপ্রার্থী।

জগৎশেঠ। আপনার অপরাধ!

সিরাজ। পরিহাস বলে মনে হচ্ছে শেঠজী? চেয়ে দেখুন এই লোকটার দিকে (ইঙ্গিত করার সঙ্গে সঙ্গে প্রহরী একজন হতশ্রী ব্যক্তিকে দরবারে হাজির করল। সে ডুকরে কেঁদে উঠল।

রায়দুর্লভ। একি এর এই অবস্থা কে করলে? (তরবারি নিষ্কাশন)

সিরাজ। তরবারি কোষবদ্ধ করুন রায়দুর্লভ! এর এই অবস্থার জন্যে দায়ী সিরাজের দুর্বল শাসন।

উৎপীড়িত। আমাকে শেষ করে দিয়েছে হজুর।

মীরজাফর। আমরা যে কিছুই বুঝতে পারছিনে জাঁহাপনা।

উৎপীড়িত। লবণ বিক্রি করিনি বলে কুঠির সাহেবদের লোকজন আমার বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। (ক্রন্দন)

সিরাজ। (সিংহাসনের হাতলে ঘুষি মেরে) কেঁদনা। শুকনো খটখটে গলার বলো আর-কি হয়েছে। আমি দেখতে চাই, আমার রাজত্বে হৃদয়হীন জালিমের বিরুদ্ধে অসহায় মজলুম কঠিনতর জালিম হয়ে উঠছে।

উৎপীড়িত। লবণ বিক্রি করিনি বলে কুঠির সাহেবদের লোকজন আমার বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। ষন্ডা ষন্ডা পাঁচজনে মিলে আমার পোয়াতি বউটাকে-ওহ হো হো (কান্না)-আমি দেখতে চাইনি। কিন্তু চোখ বুজলেই-ওদের আর একজন আমার নখের ভেতরে খেজুর কাঁটা ফুটিয়েছে। আমার বউকে ওরা খুন করে ফেলেছে হজুর। (কান্নার ভেঙ্গে পড়ল)

সিরাজ। (হঠাৎ আসন ত্যাগ করে ওয়াট্‌সের কাছে গিয়ে প্রবল কণ্ঠে) ওয়াট্‌স!

ওয়াট্‌স। (ভয়ে বিবর্ণ) Your Excellency.

সিরাজ। আমার নিরীহ প্রজাতির এই দুরবস্থার জন্যে কে দায়ী?

ওয়াট্‌স। How can I Know that your Excellency? আমি কি করে জানব?

সিরাজ। তুমি কি করে জানবে? তোমাদের অপকীর্তির কোনো খবর আমার কাছে পৌঁছায় না ভেবেছো? কুঠিয়াল ইংরেজরা এমনি করে দৈনিক কতকগুলো নিরীহ প্রজার ওপর অত্যাচার করে তার হিসেব দাও।

ওয়াট্‌। আপনি আমায় অপমান করছেন Your Excellency. দেশের কোথায় কি হচ্ছে সে কৈফিয়ত আমি দেবো কি করে? আমি ত আপনার দরবারে কোম্পানীর প্রতিনিধি।

সিরাজ। তুমি প্রতিনিধি? ড্রেক এবং তোমার পরিচয় আমি জানিনে ভেবেছো? দুশ্চরিত্রতা এবং উচ্ছৃংখলতার জন্যে দেশ থেকে নির্বাসিত না করে ভারতে বাণিজ্যের

www.pathagar.com

জন্য তোমাদের পাঠানো হয়েছে। তাই এ দেশে বাণিজ্য করতে এসে দুর্নীতি এবং অনাচারের পথ তোমারা ত্যাগ করতে পার নি। কৈফিয়ৎ দাও, আমার নিরীহ প্রজাদের ওপর এই জুলুম কেন?

ওয়াট্‌স। আপনার প্রজাদের সাথে আমাদের কি সম্পর্ক। আমরা ট্যাক্স দিয়ে শান্তিতে বাণিজ্য করি।

সিরাজ। ট্যাক্স দিয়ে বাণিজ্য করো বলে আমার নিরীহ প্রজার ওপরে অত্যাচার করবার অধিকারও তোমরা পাওনি।

(সমবেত সকলকে উদ্দেশ্য করে)

এই লোকটি লবণ প্রস্তুতকারক। লবণের ইজারাদার কুঠিয়াল ইংরেজ। স্থানীয় লোকদের তৈরি যাবতীয় লবণ তারা নিত চার আনা মণ দরে পাইকারী হিসেবে কিনে নেয়। তারপর এখানে বসেই এখানকার লোকের কাছে সেই লবণ বিক্রি করে দু'টাকা আড়াই টাকা মণ দরে।

মীরজাফর এতো ডাকাত।

সিরাজ। আপনাদের পরামর্শেই আমি কোম্পানীকে লবণের ইজারাদারী দিয়েছি। আপনারা আমাকে বুঝিয়েছিলেন রাজস্বের পরিমাণ বাড়ালে দেশের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড মজবুত হয়ে উঠবে। কিন্তু এই কি তার প্রমাণ? এই লোকটি কুঠিয়াল ইংরেজদের কাছে পাইকারী দরে লবণ বিক্রি করতে চায়নি বলে তার এই অবস্থা। বলুন শেঠজী, বলুন রাজবল্লভ, ব্যক্তিগত অর্থলালসায় বিচারবুদ্ধি হারিয়ে আমি এই কুঠিয়ালদের প্রশ্রয় দিয়েছি কি-না? বলুন সিপাহসালার, বলুন রায়দুর্লভ, আমি এই অনাচারীদের বিরুদ্ধে শাসন-শক্তি প্রয়োগ করবার সদিচ্ছা দেখিয়েছি কিনা? বিচার করুন। আপনাদের কাছে আজ আমি আমার অপরাধের বিচারপ্রার্থী। (প্রহরী উৎপীড়িত লোকটিকে বাইরে নিয়ে গেল।

রাজবল্লভ। জাঁহাপনার বুদ্ধির তারিফ না করে পারা যায় না। কিন্তু প্রকাশ্য দরবারে এমন সুচিন্তিত পরিকল্পনায় আমাদের অপমান না করলেও চলত।

জগৎশেঠ। নবাবের কাছে আমাদের পদমর্যাদার কোনো মূল্যই নেই। তাই-

সিরাজ। আপনারাও সবাই মিলে নবাবের মর্যাদা যে কোনো মূল্যে বিক্রি করে দিতে চান এই তো?

মীরজাফর। এ-কথা বলে নবাব আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনতে চাইছেন। এই অযথা দুর্ব্যবহার আমরা হৃষ্ট মনে গ্রহণ করতে পারব কি না সন্দেহ।

সিরাজ। বাংলার নবাবকে ভয় দেখাচ্ছেন সিপাহসালার? দরবারে বসে নবাবের সঙ্গে কি রকম আচরণ করা বিধেয় তা-ও আপনার স্মরণ নেই? এই মুহূর্তে আপনাকে বরখাস্ত করে সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব আমি নিজে গ্রহণ করতে পারি। জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, উমিচাঁদ সবাইকে কয়েদখানায় আটক রাখতে পারি। হ্যাঁ, কোনো দুর্বলতা নয়। শত্রুর কবল থেকে দেশকে বাঁচাতে হ'লে আমাকে তাই করতে হবে। মোহনলাল।

(মোহনলাল তরবারি নিষ্কাশন করল)

www.pathagar.com

সিরাজ। (হাতের ইঙ্গিতে মোহনলালকে নিরস্ত করে শান্তভাবে) না, আমি তা করব না। ধৈর্য ধরে থাকব। অসংখ্য ভুল বোঝাবুঝি, অসংখ্য ছলনা এবং শাঠ্যের ওপর আমাদের মৌখিক সম্প্রীতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আজ সন্দেহেরও কোনো অবকাশ রাখব না।

মীরজাফর। আমাদের প্রতি নবাবের সন্দিগ্ধ মনোভাবের পরিবর্তন না হলে দেশের কল্যাণের কথা ভেবে আমরা উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠব।

সিরাজ। ওই একটি পথ সিপাহসালার-দেশের কল্যাণ, দেশবাসীর কল্যাণ। শুধু এই একটি পথেই আবার আমরা উভয়ে উভয়ের কাছাকাছি আসতে পারি। আমি জানতে চাই, সেই পথে আপনারা আমার সহযাত্রী হবেন কিনা?

রাজবল্লভ। জাঁহাপনার উদ্দেশ্য স্পষ্ট জানা দরকার।

সিরাজ। আমি অন্তহীন সন্দেহ বিদ্বেষের উর্ধ্বে ভরসা নিয়েই আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছি। তবু বলছি- আপনারা ইচ্ছে করলে আমাকে ত্যাগ করতে পারেন। বোঝা যতই দুর্বহ হোক না আমি একাই তা বইবার চেষ্টা করব। শুধু আপনাদের কাছে আমার একমাত্র অনুরোধ যে, মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে আপনারা আমাকে বিভ্রান্ত করবেন না।

মীরজাফর। দেশের স্বার্থের জন্যে নিজেদের স্বার্থ তুচ্ছ করে আমরা নবাবের আজ্ঞাবহ হয়েই থাকব।

সিরাজ। আমি জানতাম দেশের প্রয়োজনকে আপনারা কখনও তুচ্ছ করবেন না।

(সিরাজের ইঙ্গিতে প্রহরী তাঁর হাতে কোরান শরীফ দিল। সিরাজ দু'হাতে সেটা নিয়ে চুমু খেয়ে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর মীরজাফরের দিকে এগিয়ে দিলেন। মীরজাফর নতজানু হয়ে দু'হাতে পবিত্র কোরান ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন)।

মীরজাফর। আমি আল্লাহর পাক কালাম ছুঁয়ে ওয়াদা করছি, আজীবন নবাবের আজ্ঞাবহ হয়েই থাকব।

(সিরাজ প্রহরীর হাতে কোরান-শরীফ সমর্পণ করলেন এবং অপর প্রহরীর হাত থেকে তামা-তুলসী, গঙ্গাজল-এর পাত্র গ্রহণ করলেন। তাঁর ইঙ্গিত পেয়ে একে একে রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, রায়দুর্লভ নিজের নিজের প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করে গেলেন।)

রাজবল্লভ। আমি রাজবল্লভ, তামা-তুলসী গঙ্গাজল ছুঁয়ে ইশ্বরের নামে শপথ করছি, আমার জীবন নবাবের কল্যাণে উৎসর্গীকৃত।

রায়দুর্লভ। ঈশ্বরের নামে প্রতিজ্ঞা করছি, সর্বশক্তি নিয়ে চিরকালের জন্যে আমি নবাবের অনুগামী।

উমিচাঁদ। রামজী কি কসম, ম্যায় কোরবান হুঁ নওয়াবকে লিয়ে।

(প্রহরী গঙ্গাজলের পাত্র নিয়ে চলে গেল)।

সিরাজ। (ওয়াট্সকে) ওয়াট্স।

সিরাজ। আলীনগরের সন্ধির শর্ত অনুসারে কোম্পানীর প্রতিনিধি হিসেবে দরবারে তোমাকে আশ্রয় দিয়েছিলাম। সেই সম্মানের অপব্যবহার করে এখানে বসে তুমি

www.pathagar.com

গুপ্তচরের কাজ করছো। তোমাকে সাজা না দিয়েই ছেড়ে দিচ্ছি। বেরিয়ে যাও দরবার থেকে। ক্লাইভ আর ওয়াট্‌সকে গিয়ে সংবাদ দাও যে, তাদের আমি উপযুক্ত শিক্ষা দেব। আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বেঈমান নন্দকুমারকে ঘুষ খাইয়ে তারা চন্দননগর ধ্বংস করেছে। এই ঔদ্ধত্যের শাস্তি তাদের যথাযোগ্যভাবেই দেওয়া হবে।

ওয়াট্‌স। Your Excellency.

(কুর্নিশ করে বেরিয়ে গেল)।

দ্বিতীয় অংক ॥ দ্বিতীয় দৃশ্য

সময় ঃ ১৭৫৭ সাল, ১৯শে মে। স্থান ঃ মীরজাফরের আবাস।

[চরিত্রবৃন্দ ঃ মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে-জগৎশেঠ, মীরজাফর, রাজবল্লভ, রাইসুল জুহালা, প্রহরী।]

(মন্ত্রণাসসভায় উপস্থিত-মীরজাফর, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ)

জগৎশেঠ। সিপাহসালার বড় বেশি হতাশ হয়েছেন।

মীরজাফর। না শেঠজী, হতাশ হবার প্রশ্ন নয়। আমি নিস্তব্ধ হয়েছি। অগ্নিগিরির মত প্রচণ্ড গর্জনে ফেটে পড়বার জন্যে তৈরি হচ্ছি। বুকের ভেতরে আকাঙ্ক্ষা আর অধিকার লাভা টগবগ করে ফুটে উঠছে ঘৃণা আর বিদ্বেষের অসহ্য উত্তাপে। এবার আমি আঘাত হানবোই।

রাজবল্লভ। প্রকাশ্য দরবারে এতবড় অপমানের কথা আমি কল্পনাও করিনি।

মীরজাফর। শুধু অপমান। প্রাণের আশঙ্কায় সে আমাদের আতঙ্কিত করে তোলেনি। পদস্থ কেউ হলে মানীর মর্যাদা বুঝত। কিন্তু মোহনলালের মত সামান্য একটা সিপাই যখন তলোয়ার খুলে সামনে দাঁড়াল তখন আমার চোখে কেয়ামতের ছবি ভেসে উঠেছিল।

রায়দুর্লভ। সিপাহসালারের অপমানটাই আমার বেশি বেজেছে।

মীরজাফর। এখন আপনারা সবাই আশা করি বুঝতে পারছেন যে, সিরাজ আমাদের স্বস্তি দেবে না।

জগৎশেঠ। তা দেবে না। চতুর্দিকে বিপদ, তা সত্ত্বেও সে আমাদের বন্দী করতে চায়। এরপর সিংহাসনে স্থির হতে পারলে ত' কথাই নেই।

রাজবল্লভ। আমাদের অস্তিত্বই সে লোপ করে দেবে। আমাদের সম্বন্ধে যতটুকু সন্দেহ নবাবের বাইরের আচরণে প্রকাশ পেয়েছে, প্রকাশ পায়নি তার চেয়ে বহু গুণ বেশি। শওকতজঙ্গের ব্যাপারে নবাব আমাদের কিছুই জিজ্ঞাসা করেনি। শুধু মোহনলালের অধীনে সৈন্য পাঠিয়ে তাকে বিনাশ করেছে। এতে আমাদের নিশ্চিন্ত হবার কিছুই নেই।

জগৎশেঠ। তার প্রমাণও ত' রয়েছে হাতের কাছে। আমাদের গ্রেফতার করতে গিয়েও করেনি। কিন্তু রাজা মানিকচাঁদকে ত' ছাড়ল না। তাকে ত' কয়েদখানায় যেতে হল। শেষ পর্যন্ত দশ লক্ষ টাকা খেসারত দিয়ে তবে তার মুক্তি। আমি দেখতে পাচ্ছি নন্দকুমারের অদৃষ্টেও বিপদ ঘনিয়ে এসেছে।

www.pathagar.com

মীরজাফর। আমাদের কারও অদৃষ্ট মেঘমুক্ত থাকবে না শেঠজী।

রাজবল্লভ। আমি ভাবছি তেমন দুঃসময় যদি আসে, আর মূল্য দিয়ে মুক্তি কিনবার পথটাও যদি খোলা থাকে, তা'হলে সে মূল্যের পরিমাণ এত বিপুল হবে যে আমরা তা বইতে পারব কিনা সন্দেহ। মানিকচাঁদের মুক্তিমূল্য যদি দশ লক্ষ টাকা হয়ে থাকে তা হলে জগৎশেঠের মুক্তিমূল্য পঞ্চাশ কোটি টাকার কম হবে না।

জগৎশেঠ। ওরে বাবা। তার চেয়ে গলায় পা দিয়ে বুকের ভেতর থেজটাই টেনে বার করে আনুক। পঞ্চাশ কোটি? আমার যাবতীয় সম্পত্তি বিক্রি করলেও এক কোটি টাকা হবে না। ধরতে গেলে মাসের খরচটাই ত' ওঠে না। নবাবের হাত থেকে ধন সম্পদ রক্ষার জন্যে মাসে অজস্র টাকা খরচ করে সেনাপতি ইয়ার লুৎফ খাঁয়ের অধীনে দু'হাজার অশ্বারোহী পুষতে হচ্ছে।

মীরজাফর। কাজেই আর কালক্ষেপ নয়।

রাজবল্লভ। আমরা প্রস্তুত। কর্মপন্থা আপনিই নির্দেশ করুন। আমরা এক বাক্যে আপনাকেই নেতৃত্ব দিলাম।

মীরজাফর। আমার ওপরে আপনাদের আন্তরিক ভরসা আছে তা আমি জানি। তবু আজ একটা বিষয় খোলাসা করে নেওয়া উচিত। আজ আমরা সবাই সন্দেহ দোলায় দুলছি। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছি নে। তাই আমাদের সিদ্ধান্ত কাগজে-কলমে পাকাপাকি করে নেওয়াই আমার প্রস্তাব।

জগৎশেঠ। আমার তা'তে কোনো আপত্তি নেই।

রায়দুর্লভ। এতে আপত্তির কি থাকতে পারে?

(নেপথ্যে কণ্ঠস্বর)

নেপথ্যে। ওরে বাবা কতবার করে দেখাতে হবে? দেউড়ী থেকে আরম্ভ করে এ পর্যন্ত মোট একুশ বার দেখিয়েছি। এই দেখো বাবা, আর একটিবার দেখো। হলো ত?

(রাইসুল জুহালা কামরায় ঢুকলো)

কি গেরো রে বাবা।

মীরজাফর। কি হয়েছে?

রাইস। সালাম হুজুর। ওই পাহারাওয়ালা হুজুর। সবাই হাত বাড়িয়ে আঙ্গুল নাচিয়ে বলে, দেখলাও। দেরী করলে তলোয়ারে হাত দেয়। আমি বলি আছে বাবা, আছে। খোদ নবাবের পাঞ্জা-

মীরজাফর। (সন্ত্রস্ত) নবাবের পাঞ্জা?

রাইস। আলবৎ হুজুর। কেন নয়? (আবার কুর্ণিশ করে) হুজুরের নবাব হতে আর বাকি কি?

মীরজাফর। (প্রসন্ন হাসি হেসে) সে যাক। খবর কি তাই বলো।

রাইস। প্রায় শেষ খবর নিয়ে এসেছিলাম হুজুর। তলোয়ারের খাড়া এক কোপ। একেবারে গর্দান সমেত-

www.pathagar.com

রাজবল্লভ। (বিরক্ত) আবোল তাবোল বকে বড় বেশি সময় নষ্ট করছো রাইস মিয়া।

রাইস। (ক্ষুব্ধ) আবোল তাবোল কি হুজুর, বলছি ত তলোয়ারের খাড়া এক কোপ। লাফিয়ে সরে দাঁড়িয়ে তাই রক্ষে। তবু এই দেখুন (পকেট থেকে দ্বিখন্ডিত) মূলার নিম্নাংশ বার করল।) একটু নুন জোগাড় হলেই কাঁচা খাবো বলে মূলোটা হাতে নিয়েই ঘুরছিলাম। ক্লাইভ সাহেবের তলোয়ারের কোপে সেটাই দু'খণ্ড।

জগৎশেঠ। এ যে দেখি ব্যাপারটা ক্রমশঃ ঘোরালো করে তুলছে। ক্লাইভ সাহেব তোমাকে তলোয়ারের কোপ মারতে গেল কেন?

রাইস। গেরো হুজুর। কপালের গেরো। উমিচাঁদজীর চিঠি নিয়ে তাঁর কাছে গেলাম। তিনি চিঠি না পড়ে কটমট করে আমার দিকে চাইতে লাগলেন। তারপর ওঁর কামানের মত গলা দিয়ে একতাল কথার গোলা ছুটে বার হলো ঃ আর ইউ এ স্পাই? এবং সঙ্গে সঙ্গে ওই প্রশ্নই বাংলায়-তুমি গুপ্তচর? এমন এক অদ্ভুত উচ্চারণ করলেন, আমি শুনলাম, 'তুমি ঘুফুৎ চোর'? চোর কথাটা শুনেই মাথা গরম হয়ে উঠল। 'তুমি ঘুফুৎ চোর? ছিঁচকে চোর থেকে আরম্ভ করে হাঁড়ি চোর, শাড়ি চোর, গামছা চোর,ব দনা চোর, জুতো চোর, গরু চোর, সিঁদেল চোর, কাফন চোর- আমাদের আপনাদের ভেতরে হুজুর কত রকমারি চোরের নাম যে শুনেছি আর তাদের চেহারা চিনেছি তার আর হিসেব নেই। কিন্তু ঘুফুৎচোর? আর আমি স্বয়ং। হিতাহিত বিচার না করে হুজুর মুখের ওপরেই বলে ফেললাম,- (মৃদু হাসি) একটি ইংরেজিও ত জানি, ইংরেজিতে বললাম, ইউ শাট আপ। সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ারের এককোপ। (হেসে উঠে) অহঙ্কার করব না হুজুর, লাফটা যা দিয়েছিলাম একেবারে মাপা। তাই আমার গর্দানের বদলে ক্লাইভ সাহেবের ভাগ্যে জুটেছে মূলোর মাথাটা।

মীরজাফর। কথা থামাবে রাইস মিয়া।

রাইস। হুজুর।

মীরজাফর। এখন তুমি কার কাছ থেকে আসছ?

রাইস। উমিচাঁদজীর কাছ থেকে। এই যে চিঠি (পত্র দিল)

মীরজাফর। (পত্র পড়ে রাজবল্লভের দিকে এগিয়ে দিলেন) ক্লাইভ সাহেবের ওখানে কাকে দেখলে?

রাইস। অনেকগুলো সাহেব মেমসাহেব হুজুর। ভূত ভূত চেহারা সব।

মীরজাফর। কারো নাম জানো না?

রাইস। সব ত বিদেশী নাম। এদেশী হল পুরুষগুলোকে বলা যেত। বেশ্মোদত্যি, জটাধারী, মামদো, পেঁচো, চোয়ালে পেঁচো, গলায় দড়ে, এক ঠেংগে, কন্দকাটা ইত্যাদি। মেয়েগুলোকে বলতে পারতাম ঃ শাঁকচুন্নী, উলকামুকী, আঁষটেপেতী, কানি পিশাচী এইসব আর কি।

জগৎশেঠ। রাইস মিয়ার মুখে কথার খই ফুটেছে।

রাইস। রাত-বেরাতে চলাফেরা করি, ভূত-পেত্নীর সঙ্গেও যোগ রাখতে হয় হুজুর।

www.pathagar.com

(চিঠিখানা রাজবল্লভ, জগৎশেঠ এবং রায়দুর্লভের হাত ঘুরে আবার মীরজাফরের হাতে এলো)

মীরজাফর। একে তা হলে বিদায় দেওয়া যাক?

রাজবল্লভ। চিঠির জবাব দেবেন না?

মীরজাফর। চিঠিপত্র যত কম দেওয়া যায় ততই ভাল। কে জানে কোথায় সিরাজের গুপ্তচর ওঁৎ পেতে বসে আছে।

জগৎশেঠ। তা ছাড়া আমাদের গুপ্তচরদেরই বা বিশ্বাস কি? তারা মূল চিঠি হয়ত আসল জায়গা পৌঁছছে; কিন্তু একখানা করে তার নকল যথাসময়ে নবাবের লোকের হাতে পাচার করে দিচ্ছে।

রাইস। সন্দেহ করাটা অবশ্য বুদ্ধিমানের কাজ; কিন্তু বেশি সন্দেহে বুদ্ধি ঘুলিয়ে যেতে পারে। একটা কথা মনে রাখবেন হুজুর, গুপ্তচররাও যথেষ্ট দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে। তাদের বিপদের ঝুঁকিও কম নয়।

জগৎশেঠ। কিছু মনে করো না। তোমার সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করিনি।

মীরজাফর। তুমি তাহলে এখন এসো। উমিচাঁদজীকে আমার এই সাঙ্কেতিক মোহরটা দিও। তা'হলেও তিনি তোমার কথা বিশ্বাস করবেন। তাঁকে বল, দু'নম্বর জায়গায় আগামী মাসের ৮ তারিখে সব কিছু লেখাপড়া হবে।

রাইস। হুজুর। (সাঙ্কেতিক মোহরটা নিয়ে বেরিয়ে গেল)

মীরজাফর। রাইসুল জুহালা খুবই চালাক। সে উমিচাঁদের বিশ্বাসী লোক। ওদের সামনে শেঠজীর ওকথা বলা ঠিক হয়নি।

জগৎশেঠ। আমি শুধু বলেছি কি হ'তে পারে।

মীরজাফর। কত কিছুই হ'তে পারে শেঠজী। আমরাই কি দিনকে রাত করে তুলছিনে? নবাবের মীর মুন্সী আসল চিঠি গায়েব করে নকল চিঠি পাঠাচ্ছে কোম্পানীর কাছে তাতেই ত' ওদের এত সহজে ক্ষেপিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। বুদ্ধিটা অবশ্য রাজবল্লভের; কিন্তু ভাবুন ত' কতখানি দায়িত্ব এবং বিপদের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছে নবাবের বিশ্বাসী মীর মুন্সী।

জগৎশেঠ। তা ত' বটেই। গুপ্তচরের সহায়তা ছাড়া আমরা এক পা-ও এগোতে পারতাম না।

মীরজাফর। প্রস্তুতি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এখন আমি ভাবছি ইংরেজদের ওপরে পুরোপুরি নির্ভর করা যাবে কিনা?

রাজবল্লভ। তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ওরা বেনিয়ার জাত। পয়সা ছাড়া কিছু বোঝে না। ওরা জানে সিরাজ-উ-দ্দৌলার কাছ থেকে কোনো রকম সুবিধার আশা নেই। কাজেই সিপাহসালারকে সিংহাসনে বসাবার জন্যে ওরা সব রকমের সাহায্য দেবে।

জগৎশেঠ। অবশ্য টাকা ছাড়া। কারণ সিরাজকে গদিচ্যুত করা ওদের প্রয়োজন হলেও সিপাহসালারকে ওরা সাহায্য দেবে নগদ মূল্যের বিনিময়ে।

রাজবল্লভ। সেটাও একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে কিনা তা'ত বুঝতে পারছি নে।

www.pathagar.com

আমি যতদূর শুনেছি ওদের দাবি দু' কোটি টাকার ওপরে যাবে।

কিন্তু এত টাকা সিরাজ-উ-দ্দৌলা তহবিল থেকে কোনক্রমেই পাওয়া যাবে না।

মীরজাফর। আমরা অনেকদূর এগিয়ে এসেছি রাজা রাজবল্লভ। ওকথা আর এখন ভাবলে চলবে না। সকলের স্বার্থের খাতিরে ক্লাইভের দাবি মেটাবার যা হোক একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। (বিভোর কণ্ঠে) সফল করতে হবে আমার স্বপ্ন। বাংলার মসনদ-নবাব আলীবর্দীর আমলে, উদ্ধরত সিরাজের আমলে মসনদের পাশে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে আমি এই কথাই শুধু ভেবেছি, একটা দিন মাত্র একটা দিনও যদি ওই মসনদে মাথা উঁচু করে আমি বসতে পারতাম।

দ্বিতীয় অংক ॥ তৃতীয় দৃশ্য

সময় ঃ ১৭৫৭ সাল, ৯ই জুন। স্থান ঃ মীরনের আবাস।

[চরিত্রবৃন্দ ঃ মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে-নর্তকীগণ, বাদকগণ, মীরন, পরিচারিকা, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, মীরজাফর, ওয়াট্‌স, ক্লাইভ, রক্ষী, মোহনলাল।]

(ফরাসে তাকিয়া ঠেস দিয়ে অর্ধশায়িত মীরন। পার্শ্বে উপবিষ্টা নর্তকীর হাতে ডান হাত সমর্পিত। অপর নর্তকী নৃত্যরতা। নৃত্যের মাঝে মাঝে সুরামত্ত মীরনের উল্লাসধ্বনি।)

মীরন। সাবাস। বহোত খুব। তোমরা আছ বলেই বেঁচে থাকতে ভালো লাগে।

(নর্তকী নাচের ফাঁকে এক টুকরো হাসি ছুঁড়ে দিল মীরনের দিকে। পরিচারিকা কামরায় এসে চিঠি দিলো মীরনের হাতে। সেটা পড়ে বিরক্ত হল মীরন। তবু পরিচারিকাকে সম্মতিসূচক ইঙ্গিত করতেই সে বেরিয়ে গেল। পার্শ্বে উপবিষ্টা নর্তকী মীরনের ইঙ্গিতে কামরার অন্যদিকে চলে গেল। অল্প পরেই ছদ্মবেশধারী এক ব্যক্তিকে কামরায় পৌঁছিয়ে দিয়ে পরিচারিকা চলে গেলো।)

মীরন। সেনাপতি রায়দুর্লভ এ সময়ে এখানে আসবেন তা ভাবিনি।

(নর্তকীদের চলে যেতে ইঙ্গিত করল)

রায়দুর্লভ। আমাকে আপনি নৃত্যগীতের সুধারসে একেবারে নিরাসক্ত বলেই ধরে নিয়েছেন।

মীরন। তা নয়, তবে আপনি যখন ছদ্মবেশে হঠাৎ এখানে উপস্থিত হয়েছেন তখুনি বুঝেছি প্রয়োজন জরুরী। তাই সময় নষ্ট করতে চাইলুম না।

রায়দুর্লভ। দু'দণ্ড সময় নষ্ট ক'রে একটু আমোদ-প্রমোদই না হয় হ'ত। অহরহ অশান্তি আর অব্যবস্থার মধ্যে থেকে জীবন বিস্বাদ হয়ে উঠেছে। কিন্তু (একজনকে দেখিয়ে) এ নর্তকীকে আপনি পেলেন কোথায়? একে যেন এর দেখেছি বলে মনে হচ্ছে। সে যাক। হঠাৎ আপনার এখানে বৈঠকের আয়োজন? তা-ও খবর পেলাম কিছুক্ষণ আগে।

মীরন। আমার এখানে না করে উপায় কি? মোহনলালের গুপ্তচর জীবন অসম্ভব

www.pathagar.com

করে তুলেছে। আমার বাসগৃহ অনেকটা নিরাপদ। কারণ মোহনলাল জানে যে, আমি নাচ-গানে মশগুল থাকতেই ভালবাসি।

রায়দুর্লভ। কে কে আসছেন এখানে।

মীরন। প্রয়োজনীয় সবাই। তাছাড়া বাইরে থেকে বিশেষ অতিথি হিসাবে আসবেন কোম্পানীর প্রতিনিধি কেউ একজন।

রায়দুর্লভ। কোম্পানীর প্রতিনিধি কলকাতা থেকে এখানে আসছেন?

মীরন। তিনি আসবেন কাশিমবাজার থেকে।

রায়দুর্লভ। সে যা হো'ক। আলোচনায় আমি থাকতে পারব না। কারণ আমার পক্ষে বেশীক্ষণ বাইরে থাকা নিরাপদ নয়। কখন কি কাজে তলব করে বসবেন তার ঠিক নেই। তলবের সঙ্গে সঙ্গে হাজির না পেলে তখুনি সন্দেহ জমে উঠবে। আপনার কাছে তাই আগে ভাগে এলাম শুধু আমার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হল জানবার জন্যে।

মীরন। আপনার ব্যবস্থা ত পাকা। সিরাজের পতন হলে আব্বা হবেন মসনদের মালিক। কাজেই সিপাহসালার-এর পদ আপনার জন্যে একেবারে নির্দিষ্ট।

রায়দুর্লভ। আমার দাবিও তাই। তবে আর একটা কথা। চারিদিককার অবস্থা দেখে যদি বুঝি যে, আপনাদের সাফল্যের কোনো আশা নেই, তা হলে কিন্তু আমার সহায়তা আপনারা আশা করবেন না?

মীরন। (ঈষৎ বিস্মিত) কি ব্যাপার? আপনাকে যেন কিছুটা আতঙ্কিত মনে হচ্ছে।

রায়দুর্লভ। আতঙ্কিত নই। কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। চারিদিকে শুধু অবিশ্বাস আর ষড়যন্ত্র। এর ভেতরে কর্তব্য স্থির করাই দায় হয়ে উঠেছে।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরিচারিকা। মেহমান।

রায়দুর্লভ। আমি সরে পড়ি।

মীরন। বসেই যান না। মেহমানরা এসে পড়েছেন। কিছুক্ষণের ভেতরেই বৈঠক শুরু হয়ে যাবে।

রায়দুর্লভ। না। আমার কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে। আমি পালাই। কিন্তু আমার সঙ্গে যে ওয়াদা তার যেন খেলাপ না হয়।

(প্রস্থান)

(পরিচালিকাকে ইঙ্গিত করে মীরন কিছুটা প্রস্তুত হয়ে বসল। কামরায় ঢুকলেন রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, মীরজাফর। মীরন সমাদর করে তাদের বসালো।)

মীরন। একটু আগে রায়দুর্লভ এসেছিলেন। ব্যক্তিগত কারণে তিনি আলোচনায় থাকতে পারবেন না বললেন। কিন্তু তাঁর দাবীর কথাটা আমার কাছে তিনি খোলাখুলিই জানিয়ে গেছেন।

জগৎশেঠ। তাঁকে প্রধান সেনাপতি পদ দিতে হবে। এই ত?

রাজবল্লভ। সবাই উচ্চাভিলাসী। সবাই সুযোগ খুঁজছে। তা না হলে রায়দুর্লভ মাসে মাসে আমার কাছ থেকে যে বেতন পাচ্ছে তাতেই তার স্বর্গ হাতে পাবার কথা।

মীরজাফর। ওসব কথা থাক রাজা। সবাই একজোটে কাজ করতে হবে। সকলের

www.pathagar.com

দাবিই মানতে হবে। রায়দুর্লভ ক্ষুদ্র শক্তিধর। তার সাহায্যেই আমরা জিতব এমন কথা নয়। কিন্তু প্রয়োজনীয় মুহূর্তে নবাবের সঙ্গে তার বিশ্বাসঘাতকতার গুরুত্ব আছে বৈকি!

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরিচারিকা। জানানা সওয়ারী।

(সবাই একটু বিব্রত হয়ে পড়ল। মীরজাফর হঠাৎ পকেট থেকে কয়েক টুকরো কাগজ বের করে তাতে মন দিলেন। মীরন লজ্জিত। হঠাৎ আত্মসংবরণ করে ধমকে উঠল)।

মীরন। ভাগো হিঁয়াসে, কমবখৎ।

(পরিচারিকার দ্রুত প্রস্থান)

রাজবল্লভ। (ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হেসে) [illegible] করে দেখে এসো। আত্মীয়রাই কেউ হবেন হয়ত।

(সুযোগটুকু পেয়ে মীরন তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেল।

অভাবিত পরিবেশ এড়াবার জন্যে জগৎশেঠ নতুন প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন)।

জগৎশেঠ। আজকের আলোচনায় উমিচাঁদ অনুপস্থিত। কিন্তু তাকে বাদ দিয়ে ত' আর কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর সম্ভব নয়।

মীরজাফর। (হঠাৎ যেন পরিবেশের খেই ধরতে পেরেছেন) আরে বাপরে, একেবারে কাল কেউটে। তার দাবীই ত' সকলের আগে। তা না হলে দন্ড না পেরোতেই সমস্ত খবর পৌঁছে যাবে নবাবের দরবারে। মনে হয় কলকাতায় বসেই সে চুক্তিতে স্বাক্ষর দেবে।

(দু'জন মহিলাসহ উল্লসিত মীরন কামরায় ঢুকলো)

মীরন। এঁরাই জানানা সওয়ারী।

(রমনীর ছদ্মবেশ ত্যাগ করলেন ওয়াট্‌স এবং ক্লাইভ মীরন বেরিয়ে গেল)

ওয়াট্‌স। Sorry to disappoint you gentlement.

ইনি রবার্ট ক্লাইভ।

মীরজাফর। (সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে) কর্ণেল ক্লাইভ?

ক্লাইভ। Are you surprised অবাক হলেন।

মীরজাফর। অবাক হবারই কথা। এ সময়ে এভাবে এখানে আসা খুবই বিপজ্জনক।

ক্লাইভ। বিপদ? কার বিপদ জাফর আলী খান? আপনার না আমার?

মীরজাফর। দু'জনেরই। তবে আপনার কিছুটা বেশি।

ক্লাইভ। আমার কোনো বিপদ নেই। তা ছাড়া বিপদ ঘটাবে কে?

জগৎশেঠ। নবাবের গুপ্তচরের হাতে ত' পড়োনি?

ক্লাইভ। নবাবকে আমার কোনো ভয় নেই। কারণ সে আমাদের কিছুই করতে পারবেনা।

রাজবল্লভ। কেন পারবেনা? গাল ফুলিয়ে বড় বড় কথা বললেই সব হয়ে গেল নাকি। তুমি এখানে একা এসেছো। তোমাকে বস্তাবন্দী হুলো বেড়ালের মতো

www.pathagar.com

পানাপুকুরে দু' চারটে চুবুনি দিতে বাদশাহের ফরমান জোগাড় করতে হবে নাকি?

ক্লাইভ। I do not understant your Hulo business. But I am sure Nabab can cause no harm to us.

জগৎশেঠ। ভগবানের দিব্যি কর্নেল সাহেব, তোমরা বড় বেহায়া। এই সেদিন কলকাতায় যা মার খেয়েছো এখনো তার ব্যাথা ভোলার কথা নয়। এরি ভেতরে-

ক্লাইভ। দেখো শেঠজী এক আধবার অমন হয়েই থাকে। তা'ছাড়া রবার্ট ক্লাইভের সঙ্গে এখনও যুদ্ধ হয়নি। যখন হবে তখন তোমরাই তার ফলাফল দেখবে।

রাজবল্লভ। সেটা দেখবার আগেই গলাবাজি করছ কেন?

ক্লাইভ। এই জন্যে যে নবাবের কোনো ক্ষমতা নেই। যার প্রধান সেনাপতি বিশ্বাসঘাতক, যার খাজাঞ্চি, দেওয়ান, আমির, ওমরাহ সবাই প্রতারক তার কোনো ক্ষমতা থাকতে পারে না। তবে হ্যাঁ আপনারা ইচ্ছে করলে আমাদের ক্ষতি করতে পারেন।

রাজবল্লভ। আমরা?

ক্লাইভ। Why not? আপনারা সব পারেন। আজ নবাবকে ডোবাচ্ছেন, কাল আমাদের পথে বসাবেন না তা কি বিশ্বাস করা যায়? আমি বরং নবাবকে বিশ্বাস করতে পারি, কিন্তু-

মীরজাফর। এই সব কথার জন্যেই আমরা এখানে হাজির হয়েছি নাকি?

ক্লাইভ। Sorry Mr. Jafar Ali Khan. হ্যাঁ একটা জরুরী কথা আগেই সেরে নেওয়া যাক। উমিচাঁদ এ যুগের সেরা বিশ্বাসঘাতক। আমাদের প্লানের কথা সে নবাবকে জানিয়ে দিয়েছে। কলকাতা ----- এর সময়েতার যা ক্ষতি হয়েছিল নবাব তা - - - - - করতে চেয়েছেন। - - - - - টা আবার এক নতুন - - - - নিয়ে আমাদের কাছে এসেছে।

মীরজাফর। আমি শুনেছি সে আরও ত্রিশ লক্ষ টাকা চায়।

ক্লাইভ। এবং তাকে অত টাকা দেবার মত পজিশন আমাদের নয়। থাকলেও আমরা তা দেব না। কেন দেব? Why? Thirty lacs of rupees is no joke.

রাজবল্লভ। কিন্তু উমিচাঁদ যে রকম ধড়িবাজ তাতে সে হয়ত অন্যরকম কিছু ষড়যন্ত্র করতে পারে। আমাদের যাবতীয় গুপ্ত খবর তার জানা।

ক্লাইভ। Don't worry Raja। উমিচাঁদ অনেক বুদ্ধি রাখে। But Clive is no less। আমি উমিচাঁদকে ঠকাবার ব্যবস্থা করেছি।

মীরজাফর। কি রকম?

ক্লাইভ। দুটো দলিল হবে। আসল দলিলে উমিচাঁদের কোনো - - - - থাকবে না। নকল দলিলে লেখা থাকবে যে, নবাব হেরে গেলে কোম্পানী উমিচাঁদকে ত্রিশ লক্ষ টাকা দেবে।

রাজবল্লভ। কিন্তু সে যদি কোনো রকমে এ কথা জানতে পারে?

ক্লাইভ। আপনারা না জানালে জানবে না। আর জানলে কারও বুঝতে বাকী থাকবে না যে, আপনারাই তা জানিয়েছেন।

জগৎশেঠ। আমাদের সম্বন্ধে আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন।

www.pathagar.com

মীরজাফর। দলিল সই করবে কে?

ক্লাইভ। কমিটির সকলেই করেছেন। এখানে আপনি সই করবেন এবং রাজা রাজবল্লভ ও জগৎশেঠ থাকবেন উইট্‌নেস। নকল দলিলটায় এ্যাডমিরাল ওয়াটসন সই করতে রাজী হননি।

মীরজাফর। উমিচাঁদ মানবে কেন তা হলে?

ক্লাইভ। সে ব্যবস্থা হয়েছে। ওয়াট্‌সনের সই জাল করে দিয়েছে লুসিংটন।

জগৎশেঠ। তা হলে আর দেরী কেন? আমাদের আবার একজায়গায় বেশীক্ষণ থাকা নিরাপদ নয়।

ক্লাইভ। - - - -। দলিল দুটোই তৈরী আছে। শুধু সই হয়ে গেলেই কাজ মিটে যায়।

(দলিলের কপি মীরজাফরের দিকে এগিয়ে দিল)

মীরজাফর। একটু পড়ে দেখব না?

ক্লাইভ। ড্রাফটত' আগেই পড়েছেন।

রাজবল্লভ। তা হলেও একবার পড়ে দেখা দরকার।

ক্লাইভ। If your want go ahead পড়ে দেখুন উমিচাঁদের মত আপনাদেরও ঠকানো হয়েছে কিনা।

মীরজাফর। (দলিলটা রাজবল্লভের দিকে এগিয়ে দিয়ে) নিন রাজা আপনিই পড়ন।

রাজবল্লভ। (পড়তে পড়তে) যুদ্ধে সিরাজ-উ-দ্দৌলার পতন হলে কোম্পানী পাবেন এক কোটি টাকা, কলকাতার বাসিন্দারা ক্ষতিপূরণ বাবদ পাবেন সত্তর লক্ষ টাকা, ক্লাইভ সাহেব পাবেন দশ লক্ষ টাকা, এ্যাডমিরাল ওয়াট্‌সন পাবেন--

মীরজাফর। এগুলো দেখে আর লাভ কি?

রাজবল্লভ। ওগুলো দেখে আর লাভ কি?

রাজবল্লভ। এখন আর কিছু লাভ নেই, কিন্তু ভাবছি নবাবের তহবিল দু'বার করে লুট করলেও তিন কোটি টাকা পাওয়া যাবে কিনা।

মীরজাফর। বড় দেরি হয়ে যাচ্ছে। আসুন দস্তখত দিয়ে কাজ শেষ করে ফেলি।

রাজবল্লভ। এই সন্ধি অনুসারে সিপাহসালার শুধু মসনদে বসবেন। কিন্তু রাজ্য চালাবেন কোম্পানী।

ক্লাইভ। (বিরক্ত) You are thinking like a fool.

আমরা কেন রাজ্য চালাবো। আমরা শুধু ব্যবসা বাণিজ্য করবার - - - করে নিচ্ছি। তা আমাদের করতেই হবে।

জগৎশেঠ। আপনাদের স্বার্থ রক্ষা করুন। কিন্তু দেশের শাসন ক্ষমতায় আপনারা হাত দেবেন এত' ভালো কথা নয়।

ক্লাইভ। (রীতিমত ক্রুদ্ধ) Then What you are going to do about it? দলিল দুটো তা হলে ফিরিয়ে নিয়ে যাই। আপনাদের শর্তাদি জানিয়ে দেবেন। সেইভাবে আবার একটা খসড়া তৈরী করা যাবে।

www.pathagar.com

মীরজাফর। না না সেকি কথা? এমনিতেই বাজারে নানা রকম গুজব ছড়িয়ে পড়েছে। কোন্‌দিন সিরাজ-উ-দ্দৌলা সবাইকে গারদে পুরে দেবে তার ঠিক নেই। দিন আমি দলিল সই করে দিই। শুভকাজে অযথা বিলম্ব করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

(রাজবল্লভের হাত থেকে দলিল নিয়ে সই করতে বসল। কিন্তু একটু ইতস্ততঃ করে–)

মীরজাফর। বুকের ভেতরে হঠাৎ যেন কেঁপে উঠল। বাইরে কোথাও মরাকান্না শুনতে পাচ্ছেন শেঠজী?

জগৎশেঠ। না না, মরাকান্না আবার কোথায়?

মীরজাফর। আমি যেন শুনলাম।

ক্লাইভ। (উচ্চহাসি) বিদ্রোহী সেনাপতি অথচ - - - - থেকেও - - - - ।

রাজবল্লভ। নানা প্রকারের দুশ্চিন্তায় আপনার শরীর মন দুর্বল হয়ে পড়েছে। ও কিছু নয়।

মীরজাফর। তাই হয়ত।

(কলম নিয়ে স্বাক্ষর দিতে গিয়ে আবার ইতস্ততঃ করল)।

মীরজাফর। কিন্তু রাজবল্লভ যেমন বল্লেন, সবাই মিলে সত্যিই আমরা বাংলাকে বিক্রি করে দিচ্ছি না ত?

ক্লাইভ। - - - - - আমি জানতাম - - -দের ওপর কোনো কাজের জন্যেই ভরসা করা যায় না। তাই বিপদের ঝুঁকি নিয়ে দলিল সই করাতে নিজেই এসেছি। একা ওয়াট্‌সকে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারিনি। এখন দেখছি আমার অনুমান অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। (মীরজাফরকে) আরে বাংলা আপনাদেরই থাকবে। রাজা হয়ে আমরা কি করব? আমরা চাই টাকা। আপনাদের কোনো ভয় নেই। You are sacrificaing the Nabab and not the country. দেশের জন্যে দেশের নবাবকে আপনারা সরিয়ে দিচ্ছেন। কারণ, সে অত্যাচারী। সে থাকলে দেশের কল্যাণ হবে না।

মীরজাফর। আপনি ঠিক বলেছেন। আমরা নবাবকে সরিয়ে দিচ্ছি। সে আমাদের সম্মান দেয় না।

(দলিলে সই করল। নেপথ্যে করুন সঙ্গীত চলতে থাকবে। জগৎশেঠ এবং রাজবল্লবও সই করল)

ক্লাইভ। - - - - - - (দলিল ভাঁজ করতে করতে) আমরা এমন কিছু করলাম যা ইতিহাস হবে। We have done a great thing a great thing. (ক্লাইভ এবং ওয়াট্‌স আবার রমণীর ছদ্মবেশ নিল, তারপর সবাই বেরিয়ে গেলো। অন্যদিক দিয়ে মীরনের প্রবেশ)

মীরন। হা হা হা। আর দেরী নেই।

(হাততালি দিতেই পরিচারিকার প্রবেশ)

আগামীকাল যুদ্ধ। জানিস আগামী পরশু কি হবে। আগামী পরশু আমি শাহ্‌জাহা মীরন। শাহজাদা হা হা হা। তার পর একদিন বাংলার নবাব।

(দ্রুত জনৈক রক্ষীর প্রবেশ)

রক্ষী। হুজুর, সেনাপতি মোহনলাল।

www.pathagar.com

মীরন। (আতঙ্কিত) মোহনলাল।

(ফরাসে বসে পড়ল। মোহনলালের প্রবেশ)

মোহনলাল। শুনলাম আজ এখানে ভারী জলসা হচ্ছে। বহু গণ্যমান্য লোক উপস্থিত আছেন। তাই খোঁজ নিতে এলাম।

মীরন। সেনাপতি মোহনলাল, আপনার দুঃসাহসের সীমা নেই। আমার প্রাসাদে কার অনুমতিতে আপনি প্রবেশ করেছেন?

মোহনলাল। প্রয়োজন মত যে কোনো জায়গায় যাবার অনুমতি আমার আছে। সত্য বলুন এখানে গুপ্ত ষড়যন্ত্র হচ্ছিল কিনা?

মীরন। মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছেন সেনাপতি। জানেন এর ফল কি ভয়ানক হতে পারে? নবাবের সঙ্গে আব্বার সমস্ত গোলমাল সেদিন প্রকাশ্যে মিটমাট হয়ে গেল। নবাব তাঁকে বিশ্বাস করে সৈন্য পরিচালনার ভার দিয়েছেন। আর আপনি এসেছেন আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অপবাদ নিয়ে। আমি এখুনি আব্বাকে নিয়ে নবাবের প্রাসাদে যাবো।

(উঠে দাঁড়ালো)

এই অপমানের বিচার হওয়া দরকার।

মোহনলাল। প্রতারণার চেষ্টা করবেন না। (তরবারি কোষমুক্ত করল) আমার গুপ্তচর ভুল সংবাদ দেয় না। সত্য বলুন, কি হচ্ছিল এখানে? কে কে ছিল মন্ত্রণা সভায়?

মীরন। মন্ত্রণা সভা হচ্ছিল কিনা, এবং হ'লে কোথায় হচ্ছিল আমি তার কিছুই জানিনে। এসব বাজে জিনিসে সময় কাটানো আমার স্বভাব নয়।

(পরিচারককে ডেকে মীরন কিছু ইঙ্গিত করল)

যখন না-ছোড় হয়েছে তখন বে-আদবী না ক'রে আর উপায় কি?

(নর্তকীর প্রবেশ)

এখানে কি হচ্ছিল আশা করি সেনাপতি বুঝতে পেরেছেন?

(একটি মালা নিয়ে নাচের ভঙ্গীতে দুলতে দুলতে নর্তকী মোহনলালের দিকে এগিয়ে গেলো। মোহনলাল তরবারির অগ্রভাগ দিয়ে মালাটি গ্রহণ করে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে তরবারির দ্বিতীয় আঘাতে শূন্যেই তা দ্বিখন্ডিত করে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল।

মীরন। মূর্তিমান। বেরসিক হা হা হা--

বাংলা ভাষায় পলাশী কেন্দ্রিক অনেক নাটক রয়েছে, আমরা প্রতীকী হিসেবে এখানে চার অংকের-অনেকগুলো দৃশ্য সম্বলিত সিকান্দার আবু জাফর-এর বিখ্যাত নাটক 'সিরাজদ্দৌলার দ্বিতীয় অংকের তিনটি দৃশ্য প্রকাশ করলাম।

www.pathagar.com

জাতির মহানায়ক সিরাজ

সালাহউদ্দিন বাবর

পৃথিবীর এই ভূভাগে বসবাসরত মুসলমানদের জাতীয় জীবনে নায়ক বা হিরো কে? অনেক সময় এই প্রশ্নটি জাগে। এর কি সহজ উত্তর আছে? অন্তত আমার কাছে নেই।

যৌবনের প্রারম্ভে যখন পাকিস্তানী ছিলাম, তখন জানতাম পাকিস্তানের স্থপতি কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ। তিনি পাকিস্তান জাতির নায়ক বা হিরো। কিন্তু লক্ষ্য করেছি তাঁকে ঘিরে পাকিস্তানের এই অংশে তখন বিরূপ প্রচারণাও চলেছে ব্যাপকভাবে। সেই প্রচার-প্রোপাগান্ডার পাল্টা কোন জবাব ছিল না বলে জিন্নাহকে ঘিরে সংশয়-সন্দেহ ছিল যথেষ্ট। তাই এই অঞ্চলের মানুষের হৃদয়ে জিন্নাহ নায়ক হয়ে উঠতে পারেননি যদিও এই ভারত উপমহাদেশ বিভক্ত করে মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য পৃথক আবাসভূমি গড়ে তোলার পিছনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

আজ হঠাৎ করে মরহুম শেখ মুজিবকে জাতির পিতা চালানোর যে উন্মাদনা, তা এর আগেও একবার লক্ষ্য করা গিয়েছিল। সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ ৯ মাস শেখ মুজিব ছিলেন পাকিস্তানে অন্তরীণ। স্বাধীনতার পর তিনি দেশে ফিরে এলে তাকে বাংলাদেশের স্থপতি হিসেবে অভিহিত না করে জাতির পিতা করার জন্য জোর প্রচেষ্টা ছিল। একে প্রচেষ্টা না বলে চাপ বলাই শ্রেয়। কিন্তু কাউকে মনের গভীর স্থান করে নিতে হলে চাপ প্রয়োগে কোন কাজ হয় না। ভালবাসা ক্ষমতা দিয়েই মন জয় করতে হয়।

শেখ মুজিব বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অগ্রনায়ক। এতে কোন ভুল নেই। বাংলাদেশের এই স্থপতি পরবর্তীকালে যদি সকল বিতর্কের উর্ধ্বে থাকতে পারতেন, সেটাই হতো তার জীবনের সবচেয়ে বড় সাফল্য। কিন্তু

www.pathagar.com

রাষ্ট্রক্ষমতা যখন হাতেই নিয়েছিলেন তখন যদি তাতে তিনি সফল হতেন। তাহলেও তিনি-সবার মন জয় করতে পারতেন। শেখ মুজিব স্বাধীনতার পর ভাল কাজ করেননি একথা বলা যাবে না। ১৯৭১ সালে ৯ মাস ব্যাপী স্বাধীনতার যে সশস্ত্র যুদ্ধ চলে, তাতে দেশে আপামর মানুষ জড়িয়ে ছিল। সেই সাথে পাকিস্তানের সার্বভৌমত্বকে এই অঞ্চলে টিকিয়ে রাখার জন্যও বহু লোক সক্রিয় ছিল। সে এক অদ্ভুত রাজনৈতিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল এখানে। যেমন '৪৭ সালে এখানে সবাই মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পাকিস্তান চেয়েছিল অপর দিকে এখানকার কংগ্রেস নেতারা ভারত বিভক্তি ঠেকাতে চেয়েছে। সে যাই হোক '৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের অবসান হলে শেখ মুজিব জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে কলাবরেটর এ্যাক্ট বাতিল করেছিলেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীকে খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে এখান থেকে স্বদেশে পাঠাতেও সক্ষম হয়েছিলেন। পাকিস্তান তার স্বাধীনতা অর্জনের দীর্ঘ নয় বছরের মাথায় একটি সংবিধান পেয়েছিল। পক্ষান্তরে শেখ মুজিব সরকার মাত্র এক বছরের মধ্যে জাতিকে সংবিধান উপহার দিয়েছিল। ১৪ মাসের মধ্যে সেই সংবিধানের অধীনে নির্বাচনও দিয়েছিল।

শেখ মুজিব সম্পর্কে এর বাইরে যদি কিছু লিখতে না হতো তবে তাকে নিয়ে কোন বিতর্ক সৃষ্টির অবকাশ ছিল না।

কিন্তু ক্ষমতায় গিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকার পদে পদে ভুল করতে থাকে। সেই ভুলের জন্য দেশের জনগণকে '৭৪ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি হতে হয়েছিল।

মুজিব সরকারের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ হচ্ছে যে, গণতন্ত্রের জন্য পাকিস্তান আমলে তারা বছরের পর বছর লড়াই করেছে ক্ষমতায় গিয়ে মাত্র ৩ বছরের মাথায় সেই গণতন্ত্রকে টুটি টিপে হত্যা করা হয়েছিল একদলীয় বাকশালের যূপকাষ্ঠে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নির্যাতন-নাজেহাল করা হয়েছিল ব্যাপকভাবে। এ জন্য কালো আইন, '৭৪ সালের ক্ষমতা আইন প্রণীত হয়েছিল।

কলাবরেটর এ্যাক্ট বাতিল করে মুজিব সরকার মহত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন বটে কিন্তু ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছিল। ধর্ম-নিরপেক্ষতা নামে ইসলামের উপর চরম আঘাত হানা হয়েছিল।

মরহুম মুজিবের উপরোক্ত কার্যক্রম তিলে তিলে গড়ে উঠা তার বিশাল জনপ্রিয়তাকে '৭৫ সালে শূন্যের কোঠায় নিয়ে যায়। তার মত বড় মাপের একজন মানুষের এমন দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি হতে পারে ভাবাই যায় না। কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যর্থতা তাকে করুণার পাত্রে পরিণত করেছিল। একজন বর্ণাঢ্য মানুষ কিভাবে জরাগ্রস্ত হয়ে পড়ে নিজের ভুলের মাশুল দিতে গিয়ে মরহুম মুজিবের জীবন তার একটি বড় উদাহরণ। এই দেশের অনাগত মানুষ মুজিবকে মনে রাখবে তার সাফল্যের জন্য। সেই সাথে তার নিন্দাও করবে ব্যর্থতার জন্য। তবে সাফল্য তার ব্যর্থতাকে ছাপিয়ে যেতে

www.pathagar.com

পারেনি। বরং ব্যর্থতাই বড় হয়ে ওঠে। তাই দেশের সকল মানুষের হৃদয়ে তিনি একচ্ছত্র মহানায়ক হয়ে উঠতে পারেননি, পারেননি বিতর্কের উপরে উঠতে।

মুজিবের শাসনামলে মানুষ হতবিহ্বল হয়ে যায় কেননা তারা তার কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করেছিল। সেই আশাভংগ জাতিকে গভীর হতাশার মধ্যে নিমজ্জিত করেছিল। মুজিব যুগের অবসান হলে শহীদ জিয়াউর রহমান চারণের মত বাংলাদেশের শহর-বন্দর-গ্রাম-গঞ্জে ঘুরে ঘুরে দেশবাসীর হৃদয়ে আশাবাদ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। একটি সুন্দর সমৃদ্ধশালী দেশ গঠনের জন্য তার সেই পথে পথে ঘোরা বিফলে যায়নি। মুক্তিযুদ্ধের একজন বীর সেনানী হিসেবেও জিয়ার নাম জাতির সোনালি ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে থাকবে। তবে ইতিহাসের যে সময়টিতে তাঁর আবির্ভাব সেখানে তাঁর পক্ষে খুব বেশি কিছু করে যাওয়া সম্ভব ছিল না। কেননা দেশের মানুষকে তিনি যেভাবে জাগিয়ে তুলতে যাচ্ছিলেন তাঁর সে কর্মপ্রবাহ দেশের ভিতরের ও বাইবের শত্রুদের সহ্য হয়নি। জিয়াকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। তরুণ জিয়া সে সময় শাহাদাত বরণ না করলে তিনি তার কালকে জয় করতে পারতেন সম্ভবত।

জাতির আরো যে সব সন্তান রয়েছে, শেরেবাংলা একে ফজলুল হককে, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। তাদেরকেও জাতি স্মরণ করবে। তবে কালের ঘড়িকে তারা ডিঙ্গিয়ে যেতে পারেননি। তাহলে জাতির অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কোন্ মহানায়ককে আমরা ইতিহাসে আতি পাতি করে খুঁজবো! আরো দুর্ভাগ্য হচ্ছে আমাদের এই ভূ-ভাগের অতীত ইতিহাস যারা রচনা করেছেন তাদের প্রায় সবাই ছিলেন সাম্প্রদায়িক। নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস, সম্প্রদায় ও গোত্রের উর্ধ্বে তারা উঠতে পারেননি। তারপরও একজন তরুণ নবাবের যতটুকু পরিচয় সেই ইতিহাস থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসে, তার নাম সিরাজউদ্দৌলা। সেই তরুণ নবাব সিরাজদ্দৌলাকে নিয়ে আমরা এ ভূভাগের মানুষ উদ্দীপ্ত হতে পারে। ইংরেজ বেনিয়া ও তাদের এদেশীয় চর ও স্বজাতির বিশ্বাসঘাতকের বিরুদ্ধ মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য সিরাজ যেভাবে লড়েছেন সে কাহিনী ইতিহাসে বিরল। তাই সিরাজকে নিয়ে আমরা জাগতে পারি, উদ্দীপ্ত হতে পারি। জাতির যে ক্রান্তিকাল আজ আমরা অতিক্রম করছি, তাতে সিরাজের সংগ্রাম আমাদের ধমনীতে নতুন প্রেরণা জোগাতে পারে। ইতিহাসে সিরাজের যে পরিচয়টুকু রয়েছে তাও আবার সেই সাম্প্রদায়িক ঐতিহাসিকদের কলমের ডগায় তৈরি। আজ সময় এসেছে সত্যিকার সিরাজকে অনুসন্ধানের, সত্যিকার সিরাজের পরিচয়টুকু যদি আমরা তুলে ধরতে পারি তবে অবশ্যই সিরাজ এই ভূ-ভাগের মানুষের মহানায়ক হিসেবে হৃদয়ে সৃষ্টি করে নিতে পারবে কাল থেকে কালান্তরে।

www.pathagar.com

আজকের রাজনীতি ও পলাশীর প্রেক্ষাপট

সাজ্জাদ পারভেজ

পলাশীর ইতিহাস ব্যর্থতার ইতিহাস। নিছক নবাব সিরাজউদ্দৌলার নবাবী হারানোর ব্যর্থতা সেটা নয়। সেটা স্বাধীনতা রক্ষার ব্যর্থতা। বাঙালী জাতির জাতিগত ঐতিহাসিক ব্যর্থতা। ১৭৫৭ সাল, ২৩ জুনের কালো রাতে বাংলার ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতীয় বীর, দেশপ্রেমিক নবাব, মনসুর-উল-মুল্‌ক সিরাজউদ্দৌলা মীর্জা মুহম্মদ শাহ্ কুলি হায়বত জঙ্গ বাহাদুর পলাশীর আম্রকাননে বৃটিশ বেনিয়া ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর লর্ড ক্লাইভের বাহিনীর কাছে পীড়াদায়কভাবে পরাজয় বরণ করেন। পরাজয়ের সেই বেদনাদায়ক ইতিহাসে লজ্জা এবং শিক্ষা যুগপৎ লুকিয়ে আছে।

জাতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতা রক্ষার পবিত্র দায়বোধ সম্পর্কে অসচেতনতা আমাদের ঐতিহ্য ও বিকাশকে কিভাবে কালিমালিপ্ত করেছে সেটা যথার্থভাবে উপলব্ধিই হচ্ছে পলাশীর শিক্ষা। সেলুলয়েডের পর্দায় দর্শক যখন দেখে, লর্ড ক্লাইভ মীরজাফরকে হাত ধরে সিংহাসনে বসাচ্ছেন তখন স্বাধীন প্রজন্মের একজন যুবক ও কিশোর লজ্জায় ও ঘৃণায় বালিশে মাথা গোঁজে। গোঁজারই কথা। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে যে, সেদিনের ইতিহাসকে যথার্থ অবয়বে আজকের বাঙালীর কাছে তুলে ধরার ক্ষেত্রে আমরা একাধারে কপট এবং কৃপণ। আর তাই এ বছর পলাশী দিবস উদ্‌যাপনের সামান্য আয়োজন দেখেই কেউ কেউ বলছেন হঠাৎ করে পলাশী নিয়ে মাতামাতি কেন? সে কথার জবাব খুঁজতেই আজকের এ লেখার প্রয়াস।

পলাশীতে যদি স্বাধীনতা হারাতে না হত তাহলে সুবা বাংলার পরিবর্তে আজ খণ্ডিত বাংলা নিয়ে থাকতে হত না।

পলাশীতে পরাস্ত না হলে দু'শো বছরের ঔপনিবেশিক শোষণ, নির্যাতনে নিঃশেষ হয়ে আজ দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য পরনির্ভর সংগ্রামের কষাঘাতে জর্জরিত থাকতে হত না।

www.pathagar.com

পলাশীতে বিশ্বাসঘাতকতার কাছে সমর্পিত না হলে আজ নতুন করে জাতিসত্তার সন্ধান করতে হত না। জাতির আদর্শিক চেতনাও জাতিসত্তার পরিচয় নিয়ে আজকের হীনমন্য বিতর্কের জন্ম হত না।

কি কারণে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়েও মাত্র তিন হাজার সৈন্যের কাছে সেদিন বাঙালী পরাজিত হয়েছিল সেটার মূল্যায়ন আজ একান্তই প্রয়োজন। কেননা তা না হলে আজকে স্বাধীনতা ও স্বার্বভৌমত্বের চ্যালেঞ্জকে আমরা স্বচ্ছভাবে অনুধাবন করতে পারব না। সেদিন সাধীনতার শত্রু স্পষ্টভাবে চিহ্নিত হয়নি। আর তাই জাতির অলক্ষ্যে জাতির স্বাধীনতা হারিয়ে গিয়েছিল। স্বাধীনতা সম্পর্কে তদানীন্তন সমাজ ও এলিটকুল এতই বেখবর ছিলেন যে, তারা দেশপ্রেমিক নবাবের মৃত্যুকে নিছক ক্ষমতার হাত বদল বলেই ভেবেছিল। নবাবের লাশকে মুর্শিদাবাদের রাস্তায় ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ানো হয়েছিল আর জনমনে তার প্রতি ঘৃণা এবং অশ্রদ্ধা সঞ্চারের চেষ্টা চলেছিল অথচ প্রকৃত সত্যকে জনতার কাছে এবং ইতিহাসের পাতায় তুলে ধরবার জন্যে কোন দায়িত্বশীল কণ্ঠ বা কলম বা নেতৃত্ব তখন পাল্টা পথ করে নিতে ব্যর্থ হয়।

আজকের প্রেক্ষাপটে সেদিনের এই ব্যর্থতা মিলিয়ে দেখবার বিপুল যৌক্তিক বাস্তবতা বিদ্যমান।

বীর, বিচক্ষণ ও দেশপ্রেমিক দেশনেতা, নবাবের চরিত্র হননের জোরদার হঠকারিতা চলেছিল সেদিন। অথচ যে নবাব চরম বিপদের মুহূর্তে কারো সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেননি এবং কারোর প্রতি চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি সে নবাবের মহানুভবতা ও উদারতাকে বড় করে সম্মান করবার মূল্যায়ন খুব একটা চোখে পড়ে না। নবাবের মৃত্যুর পর স্ত্রী লুৎফুন্নেছার ব্যতিক্রমধর্মপতি প্রেম ও নিষ্ঠা নবাব চরিত্রের ও নবাব ব্যক্তিত্বের সবচাইতে বড় ঐশ্বর্য। সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দী হওয়া সত্ত্বেও শওকত জং-এর বিরুদ্ধে চরম ব্যবস্থা নিতে চাননি নবাব। ষড়যন্ত্রকারিণী বলে প্রমাণ পাবার পরও ঘষেটি বেগমকে সাজা দেননি। চারদিকে শত্রু আর বিশ্বাসঘাতকের ভিড়ের মধ্যেও অসামান্য বিচক্ষণতা ও ধৈর্যের সাথে সেদিন নবাব স্বীয় হাতকে কলংকিত না করে সবাইকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছেন, স্বাধীনতার জন্যে লড়াইতে শপথ করিয়েছেন। মহান নবাবের এই বিশাল হৃদয় পরিচয়কে সেদিনের বাঙালী জাতি যদি সত্যিকারভাবে সম্মান দেখাতে পারতো তাহলে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে জয়ী হতে বাঙালীকে সম্ভবতঃ দু'শ, আড়াইশ বছর অপেক্ষা করতে হত না। তরুণ নবাব ঘরে-বাইরে বিপুল শত্রু পরিবেষ্টনীর মধ্যেও চমৎকার বিচক্ষণতার সাথে কাশিমবাজার কুঠির প্রথম ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রজ্ঞা ও সাহসিকতার যে নজীর সেদিন তিনি দেখিয়েছেন সে কারণেই বাঙালী আজও তাকেই শ্রদ্ধা করে আর সেদিনের বিজয়ী মীরজাফরকে বিশ্বাসঘাতক বলে গাল দিয়ে থাকে। ক্ষমতারোহণের পর থেকে তার চরিত্রে কলংক ছিটানোর মত কোন কাজের দৃষ্টান্ত ঐতিহাসিকেরা উল্লেখ করেননি। এমন নবাবের জন্যে জাতির গর্ব করার মত অনেক কিছুই রয়েছে। কেননা নবাব সিরাজ কোন ষড়যন্ত্রের পথ ধরে ক্ষমতায় আসেননি। ষড়যন্ত্র আর হঠকারিতার মাধ্যমে ক্ষমতা ধরে থাকার কসরৎ করেননি। বরং স্বাধীনতার জন্যে শাহাদাত বরণ করে ইতিহাসের স্বর্ণশিখরে নিজের জায়গা করে নিয়েছেন।

www.pathagar.com

ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, আজও চরিত্র হননের জন্য মিথ্যাচার, ক্ষমতার জন্যে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র এবং ব্যক্তি ও দল স্বার্থের জন্যে জাতীয় স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেবার মত ঘৃণ্য কাজের ব্যাপক চর্চায় আমরা সিদ্ধহস্ত।

সেদিন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ব্যবসার নামে এসে দুর্গ বানিয়েছিল। অস্ত্র জমা করেছিল। যুদ্ধ করেছিল। কৃষকের ওপর অত্যাচারের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল। গ্রাম বাঙলার ওপর লুণ্ঠনের তাণ্ডব চালিয়েছিল। গ্রাম বাংলার কুলবধূ ও কন্যাদেরকে পণ্যের মত ব্যবহার করেছিল। ক্ষমতাসীনদেরকে ঘুম, উপঢৌকন আর অধিক ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে তারা সেদিন জাতীয় ঐক্যে ফাটল ধরিয়েছিল। হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার বিষ দিয়ে সমাজে ধরিয়েছিল অস্থিরতা ও অসাম্যের মহামারী।

আজও ঠিক একইভাবে দারিদ্র্য বিমোচন, সেবা ও উন্নয়নের অংশীদার সেজে এনজিও নামের দানব এসেছে আমাদের স্বকীয়তা ও স্বাধীন অস্তিত্বের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের নতুন সূক্ষ্ম জাল নিয়ে। প্রথম প্রথম বাণিজ্যের কথা বলে বৃটিশ, ফ্রান্স আর পর্তুগীজরা এসে নবাবের কাছ থেকে নানারূপ আনুকূল্যের আবদার করতো। বাণিজ্যের বরকতের আশায় সেদিন তাঁবেদারদের মতলবী পরামর্শে বিদেশী বেনিয়াদের ঠাঁই দিয়ে দিতেন শাসককুল। একটু দাঁড়াবার জায়গা পাবার পরই বেনিয়ারা বেনিয়াগিরির পাশাপাশি মনোযোগ দিত সিংহাসনে আর সম্পদ লুণ্ঠনের প্রতি।

আজও এনজিওরা একই চরিত্র আর মৌল বৈশিষ্ট্য নিয়ে হাজির। প্রথমে এসেছে সেবার নামে। তারপর হয়েছে উন্নয়ন সহযোগী। এরপর সরকারি কর্মকাণ্ডের অংশীদার হয়েছে। নিজেরা ফোরাম বানিয়েছে। এসোসিয়েশন গড়েছে। এখন তারা একটি শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করতে প্রস্তুত হয়েছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে এরা ধর্মীয় মূল্যবোধ, বিশ্বাস, দেশজ, সংস্কৃতি এবং পরিবার, পরিবার শৃংখলা ইত্যাদির বিরুদ্ধে কথা বলছে। সমাজে ক্ষমতা কাঠামোর পরিবর্তন আনার তত্ত্ব দিচ্ছে। গণমাধ্যমে পাশ্চাত্যের বন্দনা শিখাচ্ছে। ব্যবসা, বাণিজ্য হাতিয়ে নিচ্ছে। সরকারি বাজেটের বিপুল বরাদ্দ ভোগ করছে। অথচ একদল মানুষ বলছে, এনজিওরা এখন অবধি এমন কোন শক্তি নয় যে, ওদের ভয় করতে হবে। লক্ষণীয় যে, সেদিন এদেশের শাসকরা বৃটিশ বেনিয়াদেরকে নিজেদের শক্তির তুলনায় তুচ্ছ জ্ঞান করতো। অথচ ইতিহাস চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে, ক্ষুদ্র শক্তি নিয়েও ষড়যন্ত্র আর হঠকারিতার মাধ্যমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কেবল বাঙলার নবাবী দখলই করেনি, এক সময় তারা পুরো ভারতকে গ্রাস করেছে। তেমিন আজ এনজিওদেরকে আপাততঃবিচারে ইতিবাচক শক্তি মনে হলেও নির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণে দেখা যাবে যে, এদের অপতৎপরতা আমাদের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, অর্থনৈতিক উন্নতি, ধর্ম ও সংস্কৃতির বুনিয়াদ, পরিবার ও সমাজ ঐতিহ্যের গৌরব ইত্যাদি ধ্বংসের জন্য একটি অগ্রসরমান শক্তি। ওরা এখানে তাদেড় শক্ত করার জন্যে আমলা-সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ প্রমুখদেরকে চাকরি, প্রকল্প, নেতৃত্ব, ব্যবসা, সুখ্যাতির প্রচার ইত্যাদির মাধ্যমে কিনতে শুরু করেছে। ওরা এখানে নারীকে পুরুষের বিরুদ্ধে, ধর্মকে স্বাধীনতার বিরুদ্ধে আর জনগণকে শাসকের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়ার তথাকথিত পবিত্র (!) কাছে লিপ্ত। সমাজে বিত্ত-বৈষম্য এবং ক্ষমতা বৈষম্যকে আড়াল করে ওরা কেবলই নারীমুক্তির সস্তা স্লোগান নিয়ে ব্যস্ত। সরকারের মধ্যেও ওদের ভাড়াটে এজেন্টরা আজ ওদের জন্য দালালী করে অথচ ওরা এখন সারাদেশে

www.pathagar.com

কত ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ বানিয়েছে অথবা কতগুলি কাশিমবাজার কুঠি বসিয়েছে সেটার হিসাব কি আজকের ক্ষমতাসীনরা রাখেন? ওরা এখন কৃষ্ণদাস, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ প্রমুখদের চরিত্রে অভিনয় করে সিভিল সোসাইটির দাবি উচ্চকিত করছে। তৃণমূল সংগঠনের নামে ধীরে ধীরে ক্ষমতার অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার ভিত্ বানাচ্ছে।

সেদিন জগৎশেঠ, রায়দুর্লভরা উপঢৌকন পাঠিয়ে নবাবীর সনদ আনিয়ে দিত দিল্লী থেকে। আজও দিল্লীর তুষ্টি আর অতুষ্টির খবর হিসাবে করে নবাবী চালানোর চিন্তা বিদ্যমান। সে কারণে ফারাক্কার পানি, বোম্বাই এর ধ্বংস বা কাশ্মীরে মুজাহিদ হত্যা কোনটার ব্যাপারেই বলিষ্ঠ চিত্তে কথা বলি না আমরা ।

বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ বা প্যারিস কনসর্টিয়াম বৈঠকের প্রেসক্রিপশন নিয়েই দেশের অর্থনৈতিক ও এতদসংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড চালাতে হচ্ছে। আজও জগৎশেঠ, রায়দুর্লভদেরকে তোয়াজ করেই ক্ষমতার চাকা ঘুরছে। সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তির মর্জি ও পছন্দকে সামনে রেখে শাসন নীতি বিন্যস্ত হচ্ছে। গণস্বার্থ তাতে কোথায় যাচ্ছে সেটার তোয়াক্কা থাকছে না। অধিকন্তু পরাশক্তির এজেন্টরাই দাপটের সাথে ভাল মন্দের খবরদারী করছে।

আজকের জগৎশেঠ গং মুক্তবাজারী অর্থনীতির জয়গান গেয়ে গরিব দেশকে বিপুল অসম প্রতিযোগিতার মুখে অসহায় অবস্থায় নিপতিত করছে এবং নিজেরা সম্পদের পাহাড় গড়ছে। পক্ষান্তরে দরিদ্র ও নিঃস্ব জনগণ দান-খয়রাতের উপর নির্ভর করে পানির দামে শ্রম বিক্রি করছে অথবা বেকারত্বের ঘাটি টানছে।

সেদিন শাসককুলের সবাই দেশ ও জনতার স্বার্থকে ভুলে স্ব-স্ব গ্রুপ বা ব্যক্তি ভাগ্যের স্বপ্ন নিয়ে বিভোর ছিল। আজও দেশে সংসদ, সংবিধান, ভোটাধিকার, নির্বাচন, রাজনীতি প্রভৃতি নিয়ে বিপুল সংকট বিরাজমান। অথচ নেতা-নেত্রীরা কেবলই ক্ষমতার জন্য লড়াইকে নিন্দনীয় কৌশলে রূপান্তরিত করে চলেছেন। প্রকৃত বিচারে দেশের উন্নতি ও জনগণের দুঃখ-কষ্টের কথা উপেক্ষিত। দেশের মর্যাদা ও জাতীয় ঐক্য কারো কাছেই যেন মুখ্য নয়। মুখ্য কেবল ক্ষমতার মসনদ। ঐ মসনদের জন্য রাতারাতি শত্রু হচ্ছে মিত্র। দল হচ্ছে গ্রুপ। ব্যক্তি হচ্ছে দলছুট। হরতাল, অবরোধ, ঘেরাও, ধর্মঘট, ভাঙচুর ইত্যাদি হচ্ছে উৎসাহিত। জনপ্রিয়তা ও যোগ্যতার পরিবর্তে বিত্ত-বিভব হচ্ছে নমিনেশনের স্ট্যান্ডার্ড। কর্মনিষ্ঠার পরিবর্তে মোসাহেবি হচ্ছে ওপরে ওঠার সিঁড়ি। সেদিন মুর্শিদাবাদে যেমন প্রকৃত দেশপ্রেমিককে চিহ্নিত করা ছিল দুষ্কর তেমনি আজও প্রকৃত দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক তৎপরতা খুঁজে পাওয়া একটি বিরল সৌভাগ্যের ব্যাপার।

সেদিন যেমন নেতৃস্থানীয়রা স্বীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য বিস্মৃত হয়ে নিজেদেরকে ষড়যন্ত্রের সাথে সম্পৃক্ত করেছিলেন আজও সর্বস্তরের নেতৃত্বে দ্বৈততা এবং ড্রইংরুমের ষড়যন্ত্র-ব্যস্ততা সর্বত্র অনাস্থা ও সন্দেহের বিষ ছড়িয়ে দিয়েছে। বিশ্বস্ততা ও সত্যনিষ্ঠ চরিত্রের অভাব আজ প্রকট। ওপরতলায় কেনাবেচার বেসাতি আজ বড়ই খোলামেলা।

সেদিন আত্মীয়-পরমাত্মীয়রাও ন্যায়নিষ্ঠ নবাবকে সহ্য করতে পারেননি। আজও ন্যায়নিষ্ঠা আশ্রয় অস্তিত্বের হুমকির সম্মুখীন।

নবাবের মর্মন্তুদ পতনের সেই অন্ধকার দিনগুলোর ইতিহাস সম্পর্কে তদানীন্তন প্রকৃত এদেশীয় ঐতিহাসিকদের কলম বড় নীরব ভূমিকা পালন করেছিল। আর ইতিহাস

www.pathagar.com

লিখে রেখে গিয়েছিল সেই বেনিয়ারা যারা আমাদের স্বাধীনতা হরণ করেছিল। স্বভাবতঃই সেগুলো ছিল তাদের পছন্দের মত করে গ্রন্থিত। দুঃখজনক হলেও সত্য, আজ এ সময়ের কলমও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাহসী ও বস্তুনিষ্ঠার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছে। কেবলই শাসকগোষ্ঠীর ফরমায়েশী লেখায় ইতিহাসের পাতা আবর্জনার স্তূপ হয়ে পড়েছে। সেই আবর্জনার স্তূপ আর বিভ্রান্তি সরিয়ে প্রকৃত সত্যকে তুলে আনার এবং লিখবার সৎ ও সাহসী কলম আজ বড়ই বিরল। সবাই কেবল পদক, উঁচুপদ, বিদেশ সফর এবং উপঢৌকনের খেয়ালে মত্ত।

সেদিন নবীন বয়সের নবাব পরিপকতার সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে নিজে হাতে অস্ত্র তুলে নিতে যেমনি দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন তেমনি সীমাবদ্ধতায় আক্রান্ত আজকের নেতৃত্ব। সিদ্ধান্তহীনতা, কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা এবং অপক্ক উচ্ছ্বাস দিয়ে আর যাই হোক দেশ ও জাতির নেতৃত্ব দেয়া চলে না।

সেদিন দানাশাহ্ ফকির পুরস্কারের লোভে সম্পদের মোহে অসহায় নবাবকে খুনীদের হাতে ধরিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হননি। আজও ভাত ছিঁটালে কাকের অভাব হয় না। অর্থাৎ স্বাধীনতা পেলেও আত্মমর্যাদাবান জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াবার সংগ্রামে আজও আমরা যুগের চাহিদা পূরণে আগুয়ান হতে পারিনি। ১৭৫৭-র পর ১৮৫৭ তে এসে হারানো স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে নিয়োজিত হয়ে শাহাদত বরণ করে হাজারো মানুষ। স্বাধীনতার জন্য সেই সংগ্রামে আত্মাহুতির স্মৃতি নিয়ে বাহাদুর শাহ্ পার্ক আজও দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু আমরা ১৯৫২-র পূর্বেকার ইতিহাসকে সযত্নে পরিহার করেছি। আজাদী আন্দোলনের প্রথম মিনারকে আজ অনেকে ভিক্টোরিয়া পার্ক বলে চেনে। আর বাস্তবে বর্তমানে সেটা স্মরণহীন যত্নহীন অনেক অবৈধ বিচরণের ক্ষেত্র মাত্র।

ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি আমরা চরম উদাসীন এক জাতি। আর তাই লুটেরাদের প্রতি ঘৃণার চেতনা আজ বিস্তৃত। উল্টো নব্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাছে আমরা গণ অধিকারের দীক্ষা (!) নিচ্ছি। নবাব সিরাজউদ্দৌলার মৃত্যুর পর নির্বোধ মীরজাফরকে সামনে রেখে সেদিন নেপথ্যের বিশ্বাসঘাতকরা যেমন নিজেদেরকে আড়াল করতে সক্ষম হয়েছিল তেমনি আজও সমাজ ও জাতির প্রকৃত শত্রুদের বিচরণ মুখোশ পড়া। ওদেরকে চিহ্নিত করার প্রয়াস বড়ই সীমিত। পক্ষান্তরে, আত্মকেন্দ্রিক স্বপ্ন-বিলাস আজকের জনপ্রিয় অনুশীলন এবং চর্চা।

সেদিন নবাবের মৃত্যুতে মুর্শিদাবাদের রাজমহলেই যে কেবল ক্ষমতার হাত বদলে ছিল তা নয়, সমাজের সর্বস্তরে এসেছিল এক অবিশ্বাস্য উত্থান পতন। নেতৃত্ব কাঠামো থেকে মুসলিম সমাজ মর্মান্তিকভাবে উৎখাত হয়ে যায়। সেখানে প্রতিস্থাপিত হয় উচ্চবর্ণের হিন্দু জমিদার। রাজধানী স্থানান্তরিত হয় কলকাতায়। শোষিত পূর্ববঙ্গের পুঁজি সরবরাহ কেন্দ্রে পরিণত হয় কোলকাতা। ইতিহাসের এসব সর্বব্যাপী পট ও প্রেক্ষিত পরিবর্তনকে সুকৌশলে আড়াল করেছে আমাদের পরজীবী বুদ্ধিজীবী সমাজ। প্রকৃত ইতিহাসের লালন ও পরিচর্যা আজ তাই সময়ের দাবী।

www.pathagar.com

নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার সাড়ে চারশ' দিন ঘটনাপ্রবাহ

৯ এপ্রিল, ১৭৫৬ সালঃ

- নবাব আলীবর্দী খানের মৃত্যু। বাংলার মসনদে নবাব সিরাজদ্দৌলার আরোহণ। সিরাজউদ্দৌলার বয়স তখন মাত্র তেইশ বছর।

১৭৫৬ সালের এপ্রিলের শেষ সপ্তাহঃ

- ইউরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের অজুহাতে বাংলায় ইংরেজ ও ফরাসীদের দুর্গ নির্মাণ। নবাবের আদেশে ফরাসী দুর্গ নির্মাণ বন্ধ হলেও ইংরেজদের দুর্গ নির্মাণ অব্যাহত।

১৬ মে, ১৭৫৬ সাল ঃ

- বিদ্রোহী শওকত জঙ্গকে দমনের উদ্দেশ্যে পূর্ণিয়ায় নবাব সিরাজউদ্দৌলার সামরিক অভিযান।

২০ মে, ১৭৫৬ সাল ঃ

- নবাব সিরাজউদ্দৌলা রাজমহল পৌঁছেছেন। গভর্নর ড্রেকের চিঠি হস্তগত। চিঠিতে দুর্গ নির্মাণ বন্ধের কোন কথা নেই।

১৬ জুন, ১৭৫৬ সাল ঃ

- ক্রুদ্ধ নবাব সিরাজউদ্দৌলা পূর্ণিয়া না গিয়ে মুর্শিদাবাদে ফিরে এলেন। কোলকাতায় ইংরেজদের দমনের উদ্দেশ্যে সসৈন্যে যাত্রা। পথে কাশিমবাজার কুঠি দখল।

২০ জুন, ১৭৫৬ সাল ঃ

- কোলকাতার দুর্গ নবাব সিরাজউদ্দৌলার দখলে। গভর্নর ড্রেক ও অন্যান্য ইংরেজদের পলায়ন। গভর্নর হলওয়েলের আত্মসমর্পণ।
- কোলকাতার পতনের পর ড্রেক ও অন্যান্য ইংরেজদের টিকে থাকতে

www.pathagar.com

সহায়তা দেন প্রভাবশালী হিন্দু উমিচাঁদ, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, মানিকচাঁদ, নবকিষেন প্রমুখরা।

১৬ অক্টোবর, ১৭৫৬ সাল ঃ

■ পূর্ণিয়ার নবাবগঞ্জে বিদ্রোহী শওকত জঙ্গের সঙ্গে নবাব সিরাজউদ্দৌলার যুদ্ধ। যুদ্ধে শওকত জঙ্গ পরাজিত ও নিহত।

১৫ ডিসেম্বর, ১৭৫৬ সাল ঃ

■ মাদ্রাজ থেকে রবার্ট ক্লাইভ ও এডমিরাল ওয়াটসনের অধীনে একদল সৈন্যের ফালতা আগমন ও ড্রেক এর সাথে যোগদান।

২৭ ডিসেম্বর, ১৭৫৬ সাল ঃ

■ ইংরেজ সৈন্য ও নৌবহরের কোলকাতা অভিমুখে যাত্রা।

২ জানুয়ারী, ১৭৫৭ সাল ঃ

■ মানিকচাঁদের বেঈমানী। ইংরেজদের কোলকাতা পুনর্দখল।

৩ জানুয়ারী, ১৭৫৭ সাল ঃ

■ দখলদার ইংরেজ বাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়ে নবাব সিরাজউদ্দৌলার কোলকাতা অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা।

১০ জানুয়ারী, ১৭৫৭ সাল ঃ

■ রবার্ট ক্লাইভ হুগলি শহর দখল করে লুটতরাজ শুরু করে। পার্শ্ববর্তী গ্রাম জনপদ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়।

১৯ জানুয়ারী, ১৭৫৭ সাল ঃ

■ নবাব সিরাজউদ্দৌলার হুগলি আগমন। ইংরেজদের কোলকাতা প্রস্থান।

৩ ফেব্রুয়ারী, ১৭৫৭ সালঃ

■ নবাব সিরাজউদ্দৌলা কোলকাতার শহরতলী আমির চাঁদের বাগানে শিবির স্থাপন করেন।

৫ ফেব্রুয়ারী, ১৭৫৭ সাল ঃ

■ নবাব সিরাজউদ্দৌলার শিবির আক্রমণ করে ক্লাইভ ও ওয়াটসন শেষ রাতে। সিরাজবাহিনী পাল্টা আক্রমণ চালালে ক্লাইভ পিছু হটেন।

৯ ফেব্রুয়ারী, ১৭৫৭ সালঃ

■ নবাব সিরাজউদ্দৌলার সাথে ইংরেজদের আলীনগরের সন্ধি

২৩ মার্চ ১৭৫৭ সাল ঃ

■ ক্লাইভ কর্তৃক ফরাসী ঘাঁটি ও বাণিজ্য কেন্দ্র চন্দন নগর দখল।

পলাশীর যুদ্ধ

www.pathagar.com

২৩ জুন, ১৭৫৭

ভাগীরথী নদীর তীরে পলাশীর প্রান্তরে নবাব সিরাজউদ্দৌলার বাহিনীর সাথে রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে ইংরেজ বাহিনীর যুদ্ধ।

রণাঙ্গনের চিত্র

নবাব সিরাজ উদ্দৌলার পক্ষ	রবার্ট ক্লাইভের পক্ষ
১। সৈন্যসংখ্যা ৫০ হাজার।	১। সৈন্যসংখ্যা ৩ হাজার
এর মধ্যে পদাতিক ৩৫ হাজার,	সিপাহী- ২২০০
অশ্বারোহী ১৫ হাজার	ইউরোপীয়ান- ৮০০
২। মোট কামান ৫৩টি	
৩। ফরাসী সৈনিক সিনফ্রেঁর অধীনে কিছু কামান ও সৈন্য।	

- যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি মীরজাফর ও রায়দুর্লভের চক্রান্তে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে। মীরমদন ও মোহন লাল তাদের অধীনস্থ স্বল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে প্রাণপণ যুদ্ধ করেন। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি।

২৬ জুন, ১৭৫৭ সালঃ

- নবাব হিসাবে মীরজাফর আলী খানের অভিষেক।

২৯ জুন, ১৭৫৭ সাল ঃ

- মীরজাফরের সিংহাসনে আরোহণ

৩০ জুন ১৭৫৭ সাল ঃ

- রাজমহলে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে গ্রেপ্তার।

২ জুলাই, ১৭৫৭

- শৃঙ্খলিত অবস্থায় নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে মুর্শিদাবাদে আনয়ন। রাতে মীরজাফরের পুত্র মীরনের আদেশে ঘাতক মোহাম্মদী বেগের ছুরিকাঘাতে নবাব সিরাজউদ্দৌলা শাহাদাৎ বরণ করেন।

গ্রন্থনা ঃ আলম মাসুদ

www.pathagar.com

জিঞ্জিরার বন্দীশালায়

পীরজাদা গোলাম মোস্তফা

১৭৪০ খ্রিষ্টাব্দের ৯ এপ্রিল গিরিয়ার যুদ্ধে নবাব সরফরাজ খান আলীবর্দী খানের কাছে পরাজয় বরণ করেন। হতভাগ্য নবাব সরফরাজ খান গিরিয়ার প্রান্তরেই শহীদ হন। দুই তিন দিন পর আলীবর্দী খান বিজয়ীর বেশে মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করে বাংলার মসনদে আরোহণ করেন এবং পূর্ববর্তী নবাবদের সঞ্চিত সমস্ত সম্পদ তিনি হস্তগত করলেন।

আলীবর্দী খানের চরিত্রে সবচেয়ে মহৎ দিক ছিল নারী সম্পর্কে তাঁর কোন দুর্বলতা ছিল না। মুর্শিদাবাদের মসনদে নিশ্চিতভাবে আরোহণ করে তিনি সরফরাজ খানের স্ত্রী এবং ভগ্নি নফিসা বেগমের নিকট স্বীয় কৃতকর্মের জন্য মৌখিক ক্ষমাও প্রার্থনা করলেন কিন্তু সরফরাজ খানের পুত্র-কন্যা এবং আত্মীয়স্বজনকে জিঞ্জিরার প্রাসাদে চিরকালের জন্য বন্দী রাখার নির্দেশ দেয়া হলো। এই জিঞ্জিরার প্রাসাদ নির্মিত হয় নূরজাহানের ভগ্নিপতি ইব্রাহীম খান কর্তৃক ১৬২০-২১ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি ১৬১৮ সাল হতে ১৬২২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের সুবাদার ছিলেন।

নফিসা বেগম জিঞ্জিরায় বন্দী থাকাকালে উপলব্ধি করেন যে, এরূপ হীন অবস্থায় ভ্রাতুষ্পুত্র আগা বাবার ভবিষ্যত জীবন উপযুক্তভাবে গড়ে তোলা সম্ভব নয়, তাই তিনি নিজের আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে ঢাকার নবাব নাজিম নওয়াজিস মোহাম্মদ খানের নিকট প্রস্তাব করেন যে, তাকে যদি আগা বাবাকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করতে এবং উপযুক্তভাবে লালন-পালন করবার সুযোগ দেয়া হয় তা হলে তিনি নওয়াজিস খানের হেরেমের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করতে রাজী আছেন। নওয়াজিস খান ছিলেন ঘসেটি বেগমের স্বামী। উদারচেতা নওয়াজিস খান তৎক্ষণাৎ নফিসা বেগমের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং তাঁকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে ঢাকাস্থ নিজের হেরেমের সর্বময় কর্তৃত্ব প্রদান করেন। উল্লেখ্য যে, ১৭৪০ খৃঃ এপ্রিল

www.pathagar.com

পলাশী ট্রাজেডির ২৪০তম বার্ষিকী স্মারক/গ

www.pathagar.com

পলাশী ট্রাজেডির ২৪০তম বার্ষিকী স্মারক/গ

www.pathagar.com

সিরাজ অন্বেষা বনাম সিরাজ বিদ্বেষ

আলম মাসুদ

নবাব সিরাজউদ্‌দৌলাকে আমরা কোথায় রাখব? এই প্রশ্ন মাঝে মাঝে মনকে আলোড়িত করে। আমাদের সমাজ সিরাজউদদৌলার নামে এখনও সরব। বাংলাদেশে সিরাজ চর্চার দু'টি ধারা বিদ্যমান। এখানে সিরাজ অন্বেষা যেমন আছে সিরাজ বিদ্বেষও আছে। সিরাজ প্রীতি যেমন আছে সিরাজ ভীতিও আছে। সিরাজ প্রেমের ধারাটি প্রবল, বেগবান। পাশাপাশি সিরাজ নিন্দার ধারাটি দুর্বল, কিন্তু অনুপস্থিত নয়। বাংলাদেশে নবাব সিরাজউদ্‌দৌলার নাম উচ্চারিত হলে এখনও কারও কারও গাত্রদাহ শুরু হয়। একালের মীরজাফর, জগৎশেঠ, ঘষেটি বেগমরা সিরাজের নাম শুনলে এখনও ভয় পায়। কিন্তু কেন? নবাব তো নেই! সিরাজউদ্‌দৌলা-পলাশী-মুর্শিদাবাদ, যা ঘটার তাতো অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতেই ঘটে গেছে। তারপরও মৃত সিরাজকে কেন এতো ভয়? ১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজউদদৌলার বিরোধিতা যারা করেছিল তারা মীরজাফর। এটা ব্যক্তির নাম ও বিশেষণ দুই অর্থেই। ১৯৯৭ সালে যারা নবাব সিরাজউদ্‌দৌলার বিরোধিতা করে, সিরাজ স্মরণকে বিদ্রূপ করে, সিরাজ চর্চাকে কটাক্ষ করে তাদেরকে কোন্ অভিধায় চিহ্নিত করা যায়। নব্য মীরজাফর? না-কি অন্য কিছু? এটা জাতিই একদিন ঠিক করে নেবে।

নবাব সিরাজউদ্‌দৌলা একটি রাজনৈতিক চরিত্র। তাঁর মূল্যায়নে মতপার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। ইংরেজরা নবাব সিরাজউদ্‌দৌলাকে একজন বিদ্রোহী নবাব হিসেবে চিহ্নিত করে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছে। ভারতের হিন্দু রাজন্যবর্গ সিরাজউদ্‌দৌলার পতনের মধ্য দিয়ে মুসলিম রাষ্ট্রক্ষমতার অবসান এবং ইংরেজদের হাত ঘুরে ক্ষমতা নিজের হাতে পাওয়ার স্বপ্ন দেখেছে। তার বিপরীতে বাংলাদেশ নবাব সিরাজউদ্‌দৌলাকে বিগত ২৪০ বছর যাবত বুকে আগলে রেখেছে। ১৯০ বছর এই জনপদের মানুষ

www.pathagar.com

জবরদখলকারী বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বার বার যে বিদ্রোহ করেছে, স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছে সেখানে পলাশী বিপর্যয়ের শোকই শক্তি হয়ে জালেম শাসকের ভিত্ কাঁপিয়ে দিয়েছে। ১৮৫৭, ১৯৪৭, ১৯৭১ নবাব সিরাজউদ্দৌলার নাম আমাদের প্রতিটি মুক্তি সংগ্রামে, স্বাধীনতার লড়াইয়ে, রণাঙ্গনে শ্রদ্ধাভরে উচ্চারিত হয়েছে।

নবাব সিরাজউদদৌলা বাংলাদেশের ঘরে ঘরে একটি জনপ্রিয় নাম। সিরাজউদ্দৌলা ও দেশপ্রেম এ দু'টি শব্দ একে অন্যের পরিপূরক। এটাই এদেশের মানুষের মনের কথা। 'বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার মহান অধিপতি নবাব সিরাজউদদৌলা--------' এই সংলাপ এখনও হৃদয়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। খান আতাউর রহমানের সিরাজউদ্দৌলা চলচ্চিত্র এদেশে সুপারহিট হয়। সিরাজউদ্দৌলা যাত্রাপালা দেখার জন্য গ্রামে এখনও আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার ঢল নামে। সিরাজ নাট্যরস নাগরিকদের অন্যরকম আনন্দ দেয়। কাব্যে, সাহিত্যে, ইতিহাসের পাতায় সিরাজকে যতখানি পাওয়া যায় পাঠক তা লুফে নেয়। এই হচ্ছে জনগণের সিরাজউদ্দৌলা। টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত নবাব সিরাজউদ্দৌলার জন্য ঘরে ঘরে দেশপ্রেমিক জনতার আবেগ এতটুকুও ম্লান হয়নি। এখনও এদেশে পরম আদরে নবজাতকের নাম রাখা হয় সিরাজউদ্দৌলা।

কিন্তু সিরাজউদ্দৌলাকে অবহেলা করার একটি ঘরানাও এদেশে আছে। স্বাধীন বাংলাদেশের পঁচিশ বছর ও পাকিস্তান আমলের পঁচিশ বছর, এই পঞ্চাশ বছরে কখনোই রাষ্ট্রীয়ভাবে পলাশী দিবস পালিত হয়নি। নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে স্মরণ করার কোন আয়োজন বা প্রতিষ্ঠান তৈরী করা হয়নি। রাজনীতিবিদরা 'সিরাজউদ্দৌলার বাংলা জেগেছে জেগেছে' শ্লোগান দিয়ে কখনও কখনও ক্ষমতায় গেছেন। কিন্তু সিরাজকে মনে রাখার প্রয়োজন মনে করেন নি। তারা হয়ত ভেবেছিলেন, 'আমিই ইতিহাস, ভূগোল, অংক' সবকিছু। আমার আগে কেউ ছিল না। আমার পরেও কিছু থাকবে না। দু'একজন ব্যতিক্রম বাদে আপন ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রতি উদাসীন এসব শাসকরা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। ইতিহাস তাদের ক্ষমা করেনি। সিরাজউদ্দৌলাকে নিয়ে বাংলাদেশের জনমানসে কোন বিভ্রান্তি নেই। কিন্তু সিরাজের সঙ্গে আমাদের জনগণের সম্পর্ক কি? এই প্রশ্ন আকারে-ইঙ্গিতে উত্থাপন করেন এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী। সিরাজউদ্দৌলা তো বাঙ্গালী ছিলেন না। তার মুখের ভাষা বাংলা ছিল না। সিরাজউদ্দৌলা বহিরাগত। অতএব তাকে নিয়ে মাতামাতির প্রয়োজন নেই। সিরাজ চর্চাকে অনাবশ্যক বলতে চান এরা। ইতিহাসে পক্ষ-বিপক্ষের প্রশ্নটি এখানেই এসে যায়। বাংলাদেশের মানচিত্রে জন্মগ্রহণ করেননি। মুখের ভাষা বাংলা ছিল না। বাংলা ভাষা ভাল করে বলতে পারতেন না-এমন কালজয়ী রাজনৈতিক পুরুষ আমাদের ইতিহাসে একাধিক রয়েছেন। এঁরা এদেশের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে অশেষ অবদান রেখে গেছেন। রাজনৈতিক অঙ্গনের এসব প্রবাদ পুরুষের কাছে জাতি চিরঋণী হয়ে আছে। কেউ তাদের বাঙ্গালিত্ব নিয়ে প্রশ তোলেনা। শ্রদ্ধার পুষ্পস্তবক অর্পণ করতে কেউ কার্পণ্য করে না। কাজেই এখানে 'কোন্ নেতা কোথা হইতে আগত'-তার চাইতে বড় বিবেচ্য এই জনপদের মানুষের কল্যাণ সাধনে কে কতখানি ব্রতী ছিলেন। কোন রাজনৈতিক নেতা বা শাসক সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের চিন্তা, চেতনা ও মূল্যবোধকে লালন করেছেন। স্বাধীনতার জন্য আপোষহীন লড়াই করেছেন। জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ করেছেন। প্রয়োজনে জীবন দিয়েছেন। সেটাই বিবেচ্য।

কম্যুনিস্ট ভাবধারার চিন্তাবিদরা শ্রেণী সংগ্রামের প্রেক্ষাপট টেনে বলে থাকেন,

www.pathagar.com

সিরাজ-ক্লাইভের লড়াইটা হচ্ছে সামন্তবাদের সঙ্গে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের লড়াই। পলাশীর যুদ্ধে তাই সাধারণ মানুষের কোন অংশ গ্রহণ নেই। ইতিহাসের পাতা উল্টে একথা স্পষ্টভাবে বলা যায়, নবাব সিরাজউদ্‌দৌলা প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিলেন। জনপ্রিয়তা হারিয়ে জনরোষের শিকার হননি। আত্মীয়দের ঈর্ষা, আমলাতন্ত্রের বিশ্বাসঘাতকতা আর বৃটিশের ষড়যন্ত্র এই তিনে মিলে সিরাজকে পদচ্যুত করেছিল। ১৭৫৬ সালের ৯ এপ্রিল থেকে ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত নবাব সিরাজউদ্‌দৌলা মাত্র চৌদ্দ মাসের জন্য বাংলার নবাব হয়েছিলেন। একথা কেউ বলতে পারবে না যে, সিরাজউদ্‌দৌলার বিরুদ্ধে কোন গণআন্দোলন হয়েছিল। কোন কৃষক শ্রমিক বিদ্রোহ হয়েছিল। কিন্তু বৃটিশের বিরুদ্ধে উপমহাদেশে ঠিকই পরবর্তী সময়ে গণআন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি হয়। বরং ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, সিরাজউদ্‌দৌলা যৌবনে বর্গী দমন করে এদেশের সাধারণ মানুষের প্রিয়পাত্রে পরিণত হয়েছিলেন। ইংরেজ বেনিয়াদের প্রতিটি আধিপত্যবাদী পদক্ষেপকে তিনি মোকাবেলার চেষ্টা করেছিলেন। নবাব সিরাজউদ্‌দৌলা প্রজাহিতৈষী শাসক ছিলেন। তাঁর পতনের পরই প্রকৃতপক্ষে বাংলার জনজীবনে দুর্দশার দীর্ঘ কালো রজনী শুরু হয়। ১৯০ বছর বৃটিশের জুলুম নির্যাতন সহ্য করার পর এই জনপদের মানুষ রক্ত ও ঘামের বিনিময়ে আবার রাষ্ট্রক্ষমতা ফিরে পায়। ফিউডাল লর্ড আখ্যা দিয়েও সিরাজকে যাদুঘরে আটকে রাখা যাবে না। কারণ গণতন্ত্রের এই যুগে জনগণের ভোটে নির্বাচিত অনেক নেতা-নেত্রীর আচরণ সামন্ত প্রভুকেও হার মানায়।

বাংলাদেশে সিরাজ চর্চার পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। নবাব সিরাজউদ্‌দৌলাকে ঠিক কোথায় রাখব, আমাদের নীতি-নির্ধারকরা এখনও তা স্থির করার মতো মানসিক স্থিরতা অর্জন করতে পারেননি। কিন্তু আশার আলো হচ্ছে এদেশের জনগণ। সিরাজ সম্পর্কে তাদের সিদ্ধান্ত স্পষ্ট ও দ্বিধাহীন। সিরাজউদ্‌দৌলা আমাদের নেতা, আমাদের বীর, আমাদেরই ভাই-একথা গর্বভরে বলেন এদেশের সাধারণ মানুষ। সিরাজের নাম উচ্চারিত হলে তাদের বুক ফুলে ওঠে। চোখে মুখে আনন্দের দ্যুতি ছড়িয়ে পড়ে। সিরাজের পরাজয়কে তারা নৈতিক বিজয় বলে মনে করে। সিরাজ জীবন দিয়েছেন, স্বাধীনতা দেননি। তাই প্রাজ্ঞজনের বলিষ্ঠ উচ্চারণ SIRAJ WAS KILLED NOT DEFEATED. সিরাজ মানেই মাথা নত না করা। বাংলাদেশের জনগণও মাথা নত করতে জানেনা। তারা পরাভব মানেনা।

এরাই সিরাজকে সঙ্গে নিয়ে দৃঢ়পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন প্রায় আড়াই শতাব্দী ধরে। একবিংশ শতাব্দী বিজয়ের লড়াইয়েও নবাব সিরাজউদ্‌দৌলা বাংলাদেশের জনগণের বিশ্বস্ত সহযোদ্ধা হবেন। সিরাজকে সঙ্গে না রাখলে মীরজাফরদের আমরা তাড়াতে পারব না। সিরাজউদ্‌দৌলাকে জনগণের কাছ থেকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। সিরাজ বিদ্বেষীরা মীরজাফরের পরিণতিই লাভ করবে। স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে যখনই চক্রান্তকারীরা তৎপর হবে সিরাজ আমাদের ভরসা দেবেন, নেতৃত্ব দেবেন। ইতিহাসই সিরাজের সঙ্গে আমাদের ভবিষ্যত সম্পর্ক স্থির করে দিয়েছে।

www.pathagar.com

পলাশী যুদ্ধ পরবর্তী লুণ্ঠন

আলফাজ আনাম মাসুম

পলাশীর পরাজয় নাটকের মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক পরাধীনতার পাশাপাশি বাংলায় অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের সূচনা ঘটে। নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা ছিল সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা সম্পদশালী, সমৃদ্ধশালী দেশ। অধ্যাপক আব্দুর রহিম তার বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন, তৎকালীন বাংলার বার্ষিক রফতানী বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল সাড়ে সাত কোটি টাকা ও বর্তমান মুদ্রামানে পনেরো হাজার কোটি টাকা। কিঞ্চিদবিক আড়াই কোটি অধিবাসী অধুৎষিত এ বাংলার এক হাজার কোটি টাকার আমদানী ব্যয় বাদ দিয়ে বৈদেশিক মুদ্রায় নীট আয় ছিল তৎকালীন সাত কোটি টাকা ও বর্তমান মুদ্রামানে প্রায় চৌদ্দ হাজার কোটি টাকা। নিত্য ব্যবহার্য জীবনোপকরণের মূল্য এত কম ছিল যে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিবারের ভাত, মাছ, গোশত, দুধ, ঘি, চিনি ইত্যাদি খেয়ে সাধারণ মানের কাপড় পড়ে একমাস চলার জন্য প্রয়োজন হতো মাত্র ১ টাকা ৪ আনা। "

নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ থেকে সিরাজউদ্দৌলা পর্যন্ত এই দীর্ঘ শাসনামলে শুধুমাত্র নগদ অর্থ সঞ্চিত ছিল ৬৮ কোটি টাকা বর্তমানে এ সংখ্যা দাড়ায় ১,৩৬,০০০,০০,০০,০০০= (এক লক্ষ ছত্রিশ হাজার কোটি টাকারও বেশী) এ গুলো ছাড়াও হীরা, জহরত, স্বর্ণ, স্বর্ণের বার ছিল যেগুলোর সঠিক হিসাব পাওয়া দুষ্কর।

সিরাজদ্দৌলাকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য মীরজাফর উমিচাঁদ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সাথে এক ষড়যন্ত্রমুলক চুক্তি সম্পাদন করে এই চুক্তির শর্ত পূরণ করতে গিয়ে বাংলার রাজ কোষ শূন্য হয়ে পড়ে। শর্ত অনুযায়ী কোম্পানীকে ভূয়া ক্ষতিপূরণ দিতে হয় ১০লক্ষ টাকা, ইউরোপীয়দের ৫০ লক্ষ টাকা, হিন্দু প্রধানকে ২০ লক্ষ এবং আরমেনীয়দেরকে ৭ লক্ষ টাকা। পতন ত্বরান্বিত করার জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত

www.pathagar.com

হওয়ার পূর্বেই ক্লাইভকে দিতে হয় ৫২ লক্ষ টাকা। (Fall of Sirajuddowla-Dr. Mohar Ali)

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৭৫৭-১৭৬০ সাল পর্যন্ত মীরজাফরের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ৩ বছরে ২ কোটি ২৫ লাখ রুপী গ্রহণ করে। এ ছাড়া ৫৮ লাখ ৭০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছিল কোম্পানীর প্রধান কর্মকর্তাদের। ক্লাইভ ব্যক্তিগতভাবে পান ৩৪ হাজার ৫শ' পাউন্ড স্টার্লিং। এভাবে এক হিসাবে দেখা গেছে মীরজাফর ও অন্যদের কাছ থেকে কোম্পানী ২১ লাখ ৬৭ হাজার ৬শ' ২৫ পাউন্ড স্টার্লিং পায়। এ ছাড়া রাজস্ব হিসেবে লাভ করে ১ কোটি ৭ লাখ ৩১ হাজার ৬৩৮ পাউন্ড স্টার্লিং। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ কোম্পানী তাদের অন্যান্য অংশ এবং চীনে বিনিয়োগ করে ১৭৫৭ সালের পূর্বে কোম্পানীর বাণিজ্যের ৭৪% চলত ইংল্যান্ড থেকে আসা স্বর্ণ ও রৌপ্যের আমদানি। পলাশী যুদ্ধের এক যুগের মধ্যে এ আমদানি বন্ধ করে দেয়া হয়।

কোম্পানী ও তাদের কর্মচারীগণ যাকে খুশী তাকে নবাবের পদে অধিষ্ঠিত করতে এবং যাকে খুশী তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারতো। ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৫ সাল পর্যন্ত মাত্র আট/ন বছরে এ ব্যাপারে কোম্পানী ও তার দেশী-বিদেশী কর্মচারীদের পকেটে যায় কমপক্ষে ৬২,২১,১৬৫ পাউন্ড। প্রত্যেক নবাব কোম্পানীকে বিভিন্ন বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধা দানের পরও বহু মূল্যবান উপঢৌকনাদি দিয়ে সন্তুষ্ট রাখতো। [বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস- আব্বাস আলী খান]

অন্য আরেক তথ্যে দেখা যায় ১৭৫৭ থেকে ১৭৮০ সাল পর্যন্ত ২৩ বছরে বাংলা থেকে ইংল্যান্ডে চালান হয় ৩ কোটি ৮০ লাখ পাউন্ড যা সমকালীন মূল্যের ৬০ কোটি টাকা। ১৯০০ সালের মূল্যমানে এ হিসাব দাঁড়ায় ৩০০ কোটি টাকা।

মুর্শিদাবাদের খাজাঞ্চি খানায় পাওয়া গিয়েছিল ১৫ লক্ষ পাউন্ডের টাকা। এ ছাড়া ছিল বহু মূল্যবান মণি-মানিক্য। এই নগদ অর্থের মধ্যে বৃটিশ স্থল ও নৌসেনা পায় ৪ লক্ষ পাউন্ড, সিলেক্ট কমিটির ৬ সদস্য পায় ৯ লক্ষ পাউন্ড, কাউন্সিল মেম্বাররা পায় প্রত্যেকে ৫০ থেকে ৮০ হাজার পাউন্ড। ক্লাইভ পায় ২ লক্ষ ৩৪ হাজার পাউন্ড সেই সঙ্গে ৩০ হাজার পাউন্ড বার্ষিক আয়ের জমিদারী।

পলাশীর যুদ্ধ নাটক সমাপ্তির পর মীরজাফর নবাবের হীরাঝিল প্রাসাদ লুণ্ঠন করেন। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, ইয়ার লতিফ এবং ক্লাইভ। হীরাঝিলের প্রকাশ্য ধন-ভাণ্ডারে সঞ্চিত সম্পদের মধ্যে ছিল ১ কোটি ৭৬ লাখ রৌপ্য মুদ্রা, ৩২ লাখ স্বর্ণমুদ্রা, দুই সিন্দুক অমুদ্রিত স্বর্ণপিণ্ড, ৪ বাক্স হীরা-জহরত, ২ বাক্স চুনী, পান্না প্রভৃতি মূল্যবান পাথর। এই ধন-ভাণ্ডারে সঞ্চিত ছিলো ৮ কোটি টাকা। মীর জাফরের সহযোগী রামচাঁদ সম্পর্কে বলা হয় তিনি পলাশী যুদ্ধের সময় বেতন পেতেন মাসিক ৬০ টাকা। এর ১০ বছর পর মৃত্যুর সময় তার কাছে নগদে ও হুন্ডিতে পাওয়া যায় ৭১ লাখ টাকা, ৪শ'টি কলসভরা স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্য, ১৮ লাখ টাকার জমিদারী, ২০ লাখ টাকার জহরত।

এভাবে নগদ অর্থ লুণ্ঠনের পাশাপাশি রাজস্ব বিভাগ কোম্পানী নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। অধিক মাত্রায় রাজস্ব আদায়ের জন্য কৃষক সম্প্রদায়ের উপর চলে নির্মম নির্যাতন। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিদেশী বণিকদের তাড়িয়ে দিয়ে, পণ্যের মূল্য অভ্যন্তরীণ মূল্যের অস্বাভাবিকভাবে নামিয়ে দেয়া হয়। পণ্যের মূল্যের চেয়ে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি

www.pathagar.com

পায়। ফলে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, লবণ শিল্প, তাঁত শিল্প, চিনি শিল্প, রেশম শিল্পের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের আয় রোজগারের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

কৃষকদের উপর খাজনা বৃদ্ধি করা হয়। ১৭৫৭ সালে রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা। ১৭৬১ সালের মধ্যে খাজনা বৃদ্ধি করা হয় বিঘা প্রতি ২ টাকা। জমিদাররা কোম্পানীকে খাজনা দিত ৩৭ লক্ষ ৭৫ হাজার পাউন্ড কিন্তু প্রজাদের নিকট থেকে আদায় করা হতো ১ কোটি ৩০ লক্ষ পাউন্ড। খাজনার পরিমাণ এমন এক পর্যায়ে দাঁড়ায় যে উৎপন্ন ফসলের মূল্যের চেয়ে ৩/৪ গুণ বেশী। এসব অর্থ দিয়ে ১৭৮৫ সালের মধ্যে ইউরোপে অসংখ্য ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের অভ্যুদয় ঘটে।

ব্যবসা-বাণিজ্য সাধারণ জনগণের হাত থেকে হিন্দু জমিদার ফড়িয়াদের হাতে চলে যায়। এদিকে উৎপন্ন ফসলের চেয়ে খাজনার পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষকরা ফসল উৎপাদনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। হিন্দু নব্য পুঁজিপতিরা অতি লোভে ধান-চাউল গুদামজাত করে। ফলে ১৭৭৬ সালে পরিকল্পিত দুর্ভিক্ষে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ লোক প্রাণ হারায়। এ সংখ্যা ১ কোটিরও বেশী। '৭৬-এর মনন্তরের মাধ্যমে বাংলার সংখ্যাগুরু মুসলমানরা দরিদ্র নিপীড়িত সর্বহারা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়। এটা করা হয় যাতে ভবিষ্যতে মুসলমানরা কখনও মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে।

সিরাজউদ্দৌলাহকে অন্ধকুপ হত্যার অপবাদ দেয়া হয় এ প্রসঙ্গে এন ব্যাসান্ত বলেছেন –

Geometory disproving arithmatic lie to the story

www.pathagar.com

পলাশী যুদ্ধপূর্ব বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি

আমিন আল আসাদ

পলাশী যুদ্ধের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে বাংলাদেশের পরিস্থিতি ছিলো আমলাতান্ত্রিক ষড়যন্ত্রের ধোয়ায় আচ্ছাদিত। বিশেষ করে প্রতিহিংসাপরায়ণ ধূরন্ধর হিন্দু আমাত্যবর্গ, আমলা, পুঁজিপতি, আড়তদার জোতদার শ্রেণীতে ছিলো প্রবল রকম স্বার্থান্বেষী ও সুযোগ সন্ধানী। এরা যুগ যুগ ধরে মনের ভেতর লুকিয়ে রেখেছিলো মুসলিম বিদ্বেষের বিষ। রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, উমিচাঁদ, জগতশেঠ, মানিক চাঁদ, নন্দকুমার দের বিশ্বাসঘাতকতাই এর জ্বলন্ত প্রমাণ। মীরন, মীরজাফর, ইয়ার লতিফ, মোহাম্মাদী বেগদের মতো মুসলিম মুনাফেকরা ও অপশক্তির কাছে আত্মা বিক্রয় করেছিলো। জাতীয় স্বার্থের চেয়ে ভোগের পেয়ালাই তাদের কাছে বেশী প্রাধান্য পেয়েছিলো। মোহনলাল, মীরমদনের সংখ্যা ছিলো খুবই কম। সাধারণ জনগণ দেশপ্রেমিক হলেও ছিলো অসংগঠিত।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান তার 'আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারাতে লিখেন "আঠারো শতকের শুরু থেকে ইংরেজ বণিক ও বর্ণ হিন্দুদের মধ্যে ব্যবসায়িক সম্পর্কের সূত্র ধরে মৈত্রীর সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকে। ১৭৩৬ থেকে ১৭৪০ সালের মধ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কলকাতায় ৫২ জন স্থানীয় ব্যবসায়ীকে তাদের বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত করে। এরা সকলেই ছিলো হিন্দু। ১৭৩৯ সালে কাশিম বাজারে কোম্পানীর সকল এ দেশীয় কর্মচারীর পরিচয়ও ছিলো অভিন্ন। এভাবেই ইঙ্গ-হিন্দু ষড়যন্ত্রমূলক মৈত্রী গড়ে উঠে। মুসলিম শাসনের অবসান ছিলো এ মৈত্রীজোটের অভিন্ন লক্ষ্য। এস.সি. হিল তাঁর 'বেঙ্গল ইন ১৭৫৬-৫৭' নামক বইতে প্রমাণপঞ্জীসহ এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।" (আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা- মোহাম্মদ আবদুল মান্নান পৃঃ ৩০,৩১) "পলাশীর যুদ্ধকে কোন

www.pathagar.com

কোন হিন্দু লেখক 'দেবাসুর সংগ্রাম' নামে অভিহিত করেছেন। এখানে দেবতা হলেন ক্লাইভ আর 'অসুর'রূপে বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার লড়াইয়ের শহীদ তরুণ নবাব সিরাজকেই চিহ্নিত করা হয়। পলাশীর শোকাবহ বিপর্যয়কে কলকাতায় 'পলাশী'র বিজয়োৎসব' রূপে পালন করা হয় এবং দূর্গা দেবীর অকাল-বোধনের মাধ্যমে শারদীয় দুর্গোৎসব পালন করে ক্লাইভকে দেবতুল্য সম্বর্ধনা দিয়ে বরণ করা হয়।" (আমাদের জাতিসত্তার বিকাশ ধারা– মোঃ আঃ মাঃ পৃঃ ৩১)। এসব স্বার্থান্বেষী হিন্দুদের ষড়যন্ত্র হীন মানসিকতার স্বাক্ষ্য বহন করে। কবি ফারুক মাহমুদ তার ইতিহাসের অন্তরালে গ্রন্থে ১৫৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন "১৭০৭ সাল থেকেই সারা উপমহাদেশে বৌদ্ধ নিধনযজ্ঞের মতো, উত্তর মধ্য-পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারত জুড়ে বর্ণ হিন্দু, রাজপুত, জাঠ ও মারাঠা এবং শিখদের নেতৃত্বে মুসলিম নিধনযজ্ঞ তখন প্রায় পূর্ণোদ্যমে চলছে। মদ-নারী, শাণ-শওকত ও অলসতা-বিলাসিতার শিকার, মুসলিম শাসক ও অভিজাত শ্রেণীর আত্মঘাতী সংঘাত– সংঘর্ষের সুযোগ নিয়ে নব-জাগ্রত ব্রাহ্মণ্য শক্তিগুলো তাদেরকে ধ্বংস করে চলছিলো। অবশ্য বাংলার পরিস্থিতি ছিলো ভিন্নরূপ। এখানে প্রশাসন ছিলো মিশ্র। নামে মুসলমানদের হাতে নবাবী থাকলেও সকল ক্ষেত্রেই প্রাধান্য ছিলো হিন্দুদের। মোঘলাই সংস্কৃতির সাধারণ বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকারী বাংলার মুসলমান আমীর ওমরাহ ও উচ্চ শ্রেণীও যাবতীয় নৈতিকতা ও সততা বিসর্জন দিয়ে তখন ভাইয়ে-ভাইয়ে, পিতা-পুত্রে, খালা-ভাগিনা, চাচা-ভাতিজায় কাড়াকাড়ি, হানাহানি, সংঘাত-সংঘর্ষে লিপ্ত। তা সত্ত্বেও বাংলার জনসাধারণের সংখ্যাগুরু অংশ মুসলমান থাকায় সারা বাংলায় বর্ণ হিন্দুদের সরাসরি সংঘবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের উপর হামলা করার কোন সুযোগ তাদের ছিলো না। এ কারণেই এ ব্যাপারে তারা বহিঃশক্তিকে কাজে লাগাবার কূটনীতি গ্রহণ করেন।" ইতিহাসের অন্তরালে– কবি ফারুক মাহমুদ পৃষ্ঠা–১৫৪-১৫৫, <এ. আর. মল্লিক, বৃটিশ পলিসি এন্ড দি মুসলিম্স ইন বেঙ্গল, পৃঃ ৬২)

ইংরেজরা বিশ্ব ব্যাংকার বা রাষ্ট্রীয় অর্থ নিয়ন্ত্রক জগৎসেঠ এবং সমরশক্তির নিয়ন্ত্রক মীরজাফরকে কব্জা করে মূলত বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের মেরুদণ্ডকে খণ্ড-বিখণ্ড করে দিয়েছিলো। অবশ্য ইংরেজদের সাথে মীরজাফরদের সখ্যতার বহু পূর্ব থেকেই জগৎ শেঠদের সখ্যতা সৃষ্টি হয়েছিলো "ইংরেজদের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ আলিবর্দী খান যতবারই ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছেন, জগৎশেঠ মধ্যস্থতা করে তা মিটিয়ে দিয়ে ইংরেজদেরকে সুযোগ দিয়েছেন নবাবের কোলকাতাস্থ সেনাপতি মানিক চাঁদ ও চন্দন নগরের সেনাপতি রাজা নন্দকুমারের নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে উত্তরোত্তর শক্তি সংগ্রহ করার [১৭৪৪ সাল ৮ নভেম্বর কোর্ট অব ডাইরেক্টর লিখিত চিঠি] দু'মুখী ঐতিহ্য রক্ষা করেই জগৎশেঠ একদিকে আলীবর্দীর দরবার অলংকৃত করেছেন অপরদিকে মারাঠা ও ইংরেজদেরকে সহযোগিতা দান করেছেন।" [কবি ফারুক মাহমদ– ইতিহাসরে অন্তরালে পৃঃ ১৫৬] নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার শাসনামলেও তারা একই ভূমিকা পারন করতে থাকে। ইংরেজদের পদতলে আত্মা বন্ধক দিয়েছিলো সরকারী সামারিক গোয়েন্দা বিভাগীয় প্রধানরাও। পলাশী যুদ্ধের অল্প কিছুদিন আগে এই মর্মে ভীতি ছড়ানো

www.pathagar.com

হয়েছিলো যে "আহমদ শাহ আবদালী উত্তর ভারত জয় করে দিল্লী দখল করেই বিহার সীমান্ত আক্রমণ করবেন।" 'আবদালী ভীতি' এত ব্যাপক আকার ধারণ করে যে, পলাশী যুদ্ধের অল্প কিছুদিন আগেই সিরাজ-উদ-দৌলা তাঁর খাস সৈন্যদের নিয়ে ঘটিত একটি শক্তিশালী বাহিনীকে বিহারের পশ্চিম সীমান্তে প্রেরণ করেন [হীল, সিরাজ-উদ-দৌলা টু-ওয়াটসন ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৪১] এতে নবাবের সৈন্যবাহিনী দুর্বল হয়ে পড়ে এবং নবাবকে মহারাজা মনসবদার জমিদারদের সরবরাহকৃত সৈন্যদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হয়। পরিস্থিতি এরূপ করে দিয়ে জগৎশেঠরা একদিকে বর্ণ হিন্দু জমিদার, মসবদার সেনাপতিদের সংঘবদ্ধ করেন ও মুসলিম প্রভাবশালীদের ঘুষ দিয়ে হাত করেন। এছাড়া ১৭৫৬ সালে ইংরেজ কর্তৃক নবাবের অনুমতি ব্যতীত কাশিম বাজার ও পেরিং দূর্গ নির্মাণের ঔদ্ধত্যের জবাবে নবাবের কলকাতা বিজয়ের পর ইংরেজরা নবাবকে সামরিক রীতিবিরোধী হিংস্র ও জালিম হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য নবাবের উপর 'অন্ধকূপ হত্যা' নামক একটি কল্পিত হত্যাকাণ্ডের অপবাদ ছুড়ে দিয়ে ইংরেজদেরকে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে। অথচ তা ছিলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। [অন্ধকূপ হত্যা রহস্য–রুহুল আমীন, ই. ফা. বা]

এত সব ঈঙ্গ-হিন্দু অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্রের পরও স্থূল বুদ্ধিসম্পন্ন লোভী প্রতারক মীরজাফরকেও ইতিহাস কোনদিন ক্ষমা করবে না। আর এক্ষেত্রে যে কোন প্রচেষ্টাই হবে বাতুলতা। ঈঙ্গ-হিন্দুদের ফেলা নবাবীর টোপে আত্মসমর্পণকারী মীরজাফর যদি ১৭৫৭ সালের ১লা মে গোপনে ১১ দফা গোলামী চুক্তিতে দাসখত দিয়ে পলাশীর প্রান্তরে নিষ্ক্রীয় না থাকতো তাহলে বাংলার ইতিহাস আজ অন্যভাবে লিখিত হতো। রক্তাক্ত হতো না বাঙালীর খুনে ক্লাইভের খঞ্জর। একথা ইংরেজ ঐতিহাসিকরাও স্বীকার করেন সে সেদিন বাংলার সাধারণ নিরস্ত্র জনগণও যদি ইংরেজদের বিরুদ্ধে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করলেও ইংরেজরা পরাস্ত হতো।

কিন্তু বিবিধ হীন প্রক্রিয়ায় জনগণের মনোবলকে ভেঙ্গে দেয়া হয়েছিলো। আজ প্রয়োজন সেই ইতিহাস খুটে খুটে গবেষণার।

www.pathagar.com

'পলাশী ট্রাজেডীর ২৩৪ বছর পর
সিরাজদ্দৌলা মুর্শিদাবাদ'

পলাশীর প্রান্তরে

আবদুল হাই শিকদার-এর
সরেজমিন প্রতিবেদন

পলাশী বাসস্ট্যান্ডে আমরা এসে নামলাম পৌণে একটায়। কলকাতা থেকে পলাশী যাওয়ার দুটি পথ। রেলপথ ও সড়ক। শিয়ালদহ স্টেশন থেকে দূরত্ব ১৫০ কিলোমিটার। সড়ক পথে ১৭২ কিলোমিটার। পলাশী বাসস্ট্যান্ড থেকে পলাশী যুদ্ধ ময়দান দেড় কিলোমিটার পথ। এই পথে বাস, রিক্সা ও রিক্সা ভ্যান দেখলাম চলাচল করে। পলাশী বাসস্ট্যান্ডেই আন্তর্জাতিক 'ইসকন'দের মন্দির। সারা গায়ে 'হরে হরে' 'হরে কৃষ্ণ হরে'। ইসকন এর পুরো নাম ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনসাসনেস। এটা মার্কিন-ইহুদী লবির সাহায্যে পরিচালিত একটি উগ্র হিন্দু মতবাদ প্রচার প্রতিষ্ঠান।

পলাশী নদীয়া জেলার কালিগঞ্জ থানার অন্তর্ভুক্ত এখন। পলাশী বাসস্ট্যান্ডেই একটি হিন্দু হোটেলে খেতে খেতে জেনে নিচ্ছিলাম পলাশী মাঠে যাওয়ার খবরাখবর। মূল রাস্তা থেকে যে পথ সোজা চলে গেছে পলাশী মাঠের দিকে ঠিক সেই মোড়ে, অর্থাৎ পলাশীর প্রবেশপথে ত্রিকোণ আইল্যান্ডের উপর সাত-আট ফুট উঁচু একটি আবক্ষ মূর্তি। আমাদের ধারণা ছিলো হয়তো সিরাজদ্দৌলার হবে। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। পলাশীর মাঠের দিকে আমরা এগুলাম রবীন্দ্রনাথকে পেছনে ফেলে।

পেছনে রবীন্দ্রনাথ, সামনে টানা দেবদারু শোভিত কালো পীচের পথ। সোজা চলে গেছে দিগন্ত রেখার দিকে। রাস্তার আশে পাশে দু'চারটে বাড়ি। দূরে দূরে গ্রাম। রিকশাওয়ালা বললো বেশিরভাগই মুসলমানদের ঘরবাড়ি।

পথের প্রান্তে পলাশীর প্রান্তর। ভিতরে উত্তেজনা বোধ করছি আমি। আনীসের চোখে দিগন্ত রেখার কোল ঘেঁষে থাকা মাঠ। আর চারদিকে কেবল আমের বাগান। থই থই সবুজ। মানুষের

www.pathagar.com

চলাচল খুবই কম। পাখির কলরব শুনতে শুনতে বেদনা মোচড় দিয়ে ওঠে বুকে। রিকশা এগুচ্ছে। এরই মধ্যে হাতের বাঁ দিকে দূরে উঁচু চিমনী। জিজ্ঞেস করলাম রিকশাওয়ালাকে। বললো, 'পলাশী রামনগর চিনিকলের চিমনী।' বললাম, 'মানে'। রিকশাওয়ালা বললো, 'পলাশীর মনুমেন্টের পাশে এখন চিনির কল হয়েছে গো বাবু।'

বললাম, 'সে কি। কবে থেকে?'

বললো, 'সেই কবে থেকে।'

বলতে বলতে রিকশা থামিয়ে দিলো চালক। কি ব্যাপার। সামনে তাকিয়ে দেখি একটি কালো মনুমেন্ট। রিক্সাওয়ালা বললো এইতো পলাশী শুরু। লাফিয়ে নামবো কি হাতের বাঁ দিকের চিনিকল আর একটা বাংলো বাড়ি ছাড়া তিনটি দিকই সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। দূরে দূরে আমের বাগান। আমরা যে রাস্তায় এসেছি, সেটা যে কিনা কিলোমিটার দূর থেকে উঁচু হয়ে দেবদারু গাছের মাঝ দিয়ে, সোজা এতো উঁচুতে এসেছে বুঝতে পারিনি। এই উঁচু বাঁধানো জায়গাটুকুই পলাশীর এক প্রান্ত।

মনুমেন্টটি কার তৈরী বলা মুশকিল। কেউ লিখে রাখেনি নির্মাণের তারিখ। অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়'র মতে ১৮৮৩ সালে এই মনুমেন্টের জন্ম। দেখেও এর বেশি প্রাচীন একে মনে হয় না। এই স্তম্ভ ইংরেজদের নির্মিত জয়স্তম্ভ। কিন্তু আজতক কেউ এই জয়স্তম্ভকে ভেঙ্গে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের সবচেয়ে কলংকের দিন হিসেবে চিহ্নিত করেনি। মনুমেন্টের গায়ে বাংলার কোন চিহ্ন নেই। বিশুদ্ধ ইংরেজীতে লেখা Battle Field of Plassey. June 23rd 1757. আর এই ইংরেজ জয়স্তম্ভের পাশেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরাকীর্তি রক্ষণ সংক্রান্ত নির্দেশনামা বা সাবধানবাণী। এতে লেখা 'এই মনুমেন্ট আমাদের জাতীয় সম্পত্তি। একে রক্ষা করার দায়িত্ব আপনার, আমার–সকলের।'

মনুমেন্টটি চৌকো আকারের কালো পাথরের। চারদিকে দশফুট ব্যাসের গোল বৃত্ত। বৃত্তের মাঝখানে স্থানীয় ছেলেমেয়েদের পুঁতে দেয়া দু'একটা ফুলের গাছ। পশ্চিমে পুরানো আমলের উঁচু সড়ক ভাঙ্গাচোরা। সড়কের দু'ধারে বাবলা গাছের সারি। দক্ষিণে পলাশী রামনগর চিনিকল। চিনিকলের এপারে ডাকবাংলো, পাবলিক ওয়ার্ক্স ডিপার্টমেন্টের। ডাকবাংলোর দেয়ালে লেখা 'SNAKE RESEARCH UNIT' কে লিখেছে কেউ বলতে পারলো না। পশ্চিমে পুরানো দিনের সড়কের ধার ঘেঁষে বিশাল বটগাছ। জানা গেল এই বটগাছ সেই আমলের। অর্থাৎ পলাশী যুদ্ধের সময়কার। বটগাছের নিচে কয়েকটি বস্তিবাড়ি। বোধকরি সাপুড়ে জাতীয় কোন গরীব পেশাজীবীদের। ঐতিহাসিকদের ভাষ্য অনুযায়ী এটা অর্থাৎ এই মনুমেন্ট এলাকা, পলাশী মাঠের একদম পূর্ব প্রান্ত। মূলমাঠ ভেঙ্গে গেছে ভাগীরথী অর্থাৎ গঙ্গা নদীতে। এখনও যেটুকু আছে তা এই উঁচু পুরানো সড়কের ওপারে।

আমরা এই উঁচু সড়ক পেরিয়ে মূল মাঠে যাবো। মাথার উপরে আগুন সূর্য। খাঁ খাঁ রোদে পুড়ছে পলাশী। কলিকাতা লায়ন্স ক্লাবের দেয়া একটি সচল টিউবওয়েল দেখলাম মনুমেন্টের পাশে। আর একটি ভাঙ্গা চালাঘর। পলাশীর চারদিকে অসহ্য শব্দহীনতা, অথচ পাখি ডাকছে প্রচুর। ডাকবাংলো আর মূল মাঠে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি আমরা। এমন সময় দেখি সাইকেলে চেপে একজন এলেন। টিউবওয়েলে গোসল করলেন। অজু

www.pathagar.com

করলেন। নামাজ পড়লেন। আমরা এই প্রায় জনমানবশূন্য মনুমেন্টের পাশে দাঁড়িয়ে দেখছি।

বিল্লাল শেখ

লোকটির নাম বিল্লাল শেখ। গরীব মানুষ। ব্যবসা করেন গরু-মোষের। নিজেদের সমস্ত পরিচয় দেয়ার পরও সন্দেহ যায় না বিল্লাল শেখের। বললাম, 'কেমন আছেন আপনারা?'

বললেন, 'ভাইরে ভারতবর্ষের মুসলমানদের আর ভালো মন্দ।'

- 'কেন'

- 'কেন আবার। বোঝেন না।'

বললাম, 'আপনার কি জানা আছে কোনটি পলাশীর আসল মাঠ?'

বললেন,'আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, এটা ছিলো মাঠের পূর্ব প্রান্ত। এই উঁচু সড়কের ওপারে মূল মাঠ। তবে বেশিরভাগই ভেঙ্গে নিয়েছে নদী। এখন অবশ্য নদী নেই। পুরোটাই ধান, পাট, ইক্ষুর ক্ষেত আর বিল।'

বললাম, 'পলাশীর জমিজমা কারা ভোগ করছে?' বললেন, 'জমিজমা কি পড়ে আছে? সব ভাগ করে নিয়েছে হিন্দু-মুসলমান।'

জানতে চাইলাম, ২৩ জুন এখানে উদযাপিত হয় কি না?'

বললেন, '২৩ জুন আবার কি?'

-'ওই যে দিন পলাশীর যুদ্ধ হয়।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বিল্লাল শেখ, 'না ভাই। কেউ পালন করে না।'

বললাম, 'কলকাতা থেকে কেউ আসে কিনা?'

বললেন, না'

বিল্লাল শেখকে সিরাজদ্দৌলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। বললেন, 'সে আর কি বলবো দাদা। তারা হচ্ছেন পুরানো লোক। তাদের কথা কি কেউ মনে রাখে। এই যে মনুমেন্টটা দেখছেন, এটাও নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। স্থানীয় মুসলমান ছেলেরা সব ঠিকঠাক করেছে। ফুলের গাছ লাগিয়েছে।'

ডাকবাংলো ও অরবিন্দ

পিডব্লিউডি'র লাল ইটের ডাকবাংলার প্রতিষ্ঠাতা লর্ড কার্জন। কার্জন সে সময় নাকি পুরো নদীয়া জেলার নাম রাখতে চেয়েছিলেন পলাশী। ডাকবাংলোয় এখন থাকে শুধু একজন চৌকিদার, নাম কানন। বিল্লাল শেখই গেট থেকে ডেকে আনলো কাননকে। কানন কিছুতেই ঢুকতে দেবে না ভিতরে। কাননের পুরো নাম কাননচন্দ্র রায়। কাননকে রাজী করানো হলো লক্ষ্মীদেবীর দোহাই দিয়ে।

দুই শয্যাবিশিষ্ট ডাকবাংলো দক্ষিণ দুয়ারী। ঘরের প্রধান কক্ষে ঋষি অরবিন্দের ছবি এবং পাশে ঋষি সাহেবের মায়ের ছবি। কাননকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে তার অজ্ঞতা জানালো। ডাকবাংলোতে দুটো পেইন্টিং। একটি জল রং, অন্যটি

www.pathagar.com

তৈলচিত্র। একটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অন্যটি বাঘের। কানন জানালো আগে পলাশী যুদ্ধের পুরো মানচিত্র ছিলো এখানে। এখন ওটা সরিয়ে নেয়া হয়েছে। কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে কানন জানে না।

কথা বলতে বলতে কানন বললো, 'একটু বসুন দাদাবাবুরা আমি যাব আর আসবো।' থই থই আম বাগানে হারিয়ে গেল কানন। ফিরে এলো একটু বাদেই। হাতে অনেকগুলো পাকা টসটসে কালো জাম। দশ বছর ধরে কানন আছে পলাশীতে। আগে মালি ছিলো চারজন। এখন তারা কেউ নেই। তেমন কেউ একটা পলাশীতে আসে না, বললো কানন। ৮/৯ বছর আগে পলাশী মাঠ ছিলো সমাজবিরোধী আর সন্ত্রাসীদের আখড়া। এটা ছিলো হত্যা, লুটপাট আর নারী ধর্ষণের জন্য নির্ধারিত জায়গা। সন্ত্রাসীদের ভয়ে সবাই ছিলো তটস্থ। ফলে এমনিতেই লোকজনের আসা কমে গিয়েছিলো। এখন দু'চারজন এলেও, কেউ বাংলোতে থাকে না।

কাননকে বললাম, 'সিরাজদ্দৌলা সম্পর্কে কি জানো?'

কানন বললো, 'কি জানবো বলুন। লোকটা বড্ড দুঃশ্চরিত্র ছিলো। তাইতো হেরেছে।'

বললাম, 'সিরাজ সম্পর্কে এই অপবাদ তো ইংরেজদের বানানো?'

বললো, 'বানানো হোক আর যাই হোক ঘটনা তো সত্য।'

মূল প্রান্তরে

কানন আর বিল্লাল শেখকে রেখে আমরা উঁচু পুরানো সড়ক অতিক্রম করে আরও চারশত গজ এগিয়ে দাঁড়ালাম পলাশীর মূল মাঠে। বেলা একটু হেলে গেলেও রোদে ঘামে জ্যাবজ্যাবে হয়ে গেছি সবাই। আনীস হাঁটু মুড়ে বসে পড়লো চাষ করা মাটিতে। দু'হাত দিয়ে খামচে তুলে ধরলো মাটি। বললো, 'দেখুন এ মাটির সাথে সারা বাংলাদেশের মাটির কোনো পার্থক্য নেই। অথচ এতো বিশ্বাসঘাতকতা লেখা ছিলো এর অন্তরে।"

ধূ ধূ প্রান্তর। এখানে ওখানে দু'একটা কুঁড়েঘর। শিমুল, বাবলার গাছ। ধান পাট আর ইক্ষুর ক্ষেত। দূরে দক্ষিণে দেখা যায় আমবাগান, গ্রাম। পশ্চিমে ভাগীরথীর পরিত্যক্ত পানি। মজা বিল। নদী সরে গেছে দূরে। হাই ভোল্টেজের তার চলে গেছে বহরমপুর থেকে নদীয়া। ফারাক্কা থেকে অন্য কোথাও। গরুর পাল চড়ছে ভাগীরথীর তীরে তীরে। আমরা যে স্মরণ স্তম্ভের কাছে দাঁড়ালাম সেখানেও দেখলাম গরু চরাচ্ছে রাখাল। ছোট ছোট শিশু-কিশোররা এসেছে পলাশীর মাঠে। গরু বকরী চড়াতে।

মাঝে দু'একটা গভীর নলকূপের ঘরও দেখলাম। হায় পলাশী। তোমার বুকে, এইখানে ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন যুদ্ধ নামের মিথ্যা মহড়া দিয়ে, সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে, জগৎশেঠ মিরজাফর চক্র বাংলার স্বাধীনতা তুলে দিয়েছিলো বেনিয়া ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে। আর বাংলার স্বাধীনতা রক্ষায় ব্যর্থ, একলা, নিঃসঙ্গ নবাব মাথা নত করে ত্যাগ করেছেন যুদ্ধক্ষেত্র। আর সেই গ্লানি সেই কষ্ট আমাদের হৃদয়ে, রক্তে। হাহাকার করে উঠলো বুক। এই পলাশীতেই বাংলার স্বাধীনতার কবর দেখতে পেয়েছেন জাতীয় কবি কাজী নজরুল। আবার বাংলা ভাষার কবি নবীনচন্দ্র সেন

www.pathagar.com

'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যে জয়গান গেয়েছেন ইংরেজের। আর কলংক মাখিয়েছেন সিরাজদ্দৌলার নামে। তাইতো আক্ষেপ ঝরে পড়েছে অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়ের কলমে, "সেকালে ইংরাজ-বাঙ্গালী মিলিত হইয়া, সিরাজের নামে কত অলীক কলঙ্ক রটনা করিয়া গিয়েছেন, তাহা ইতিহাসের নিকট অপরিচিত নাই। অবসর পাইলে একালের পরিচয় প্রদান করিতে পারেন, 'পলাশীর যুদ্ধকাব্যই' তাহার উৎকৃষ্ট নির্দশন! যাহা সেকালের লোকেও জানিত না, যাহা সিরাজদ্দৌলার শত্রু দলও কল্পনা করিতে সাহস পাইত না,–একালের লোকে তাহারও অভাব পূরণ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছে না।" এবং সবশেষে ব্যথিত মন্তব্য, "যে দেশের কবি-কাহিনী ইতিহাস রচনার ভার গ্রহণ করিয়াছে, সে দেশে সিরাজ কালিমা উত্তরোত্তর দুরপনেয় হইয়া উঠিবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের কথা কি?" [সিরাজদ্দৌলা]

মীরমদনের স্মৃতিস্তম্ভ

সাবেক ভাগীরথীর পূর্ব তীরে অর্থাৎ আজকের পলাশীর হৃদয়ের ঠিক মাঝখানে, পৌণে দু'হাত উঁচু দেয়াল দ্বারা ঘেরাও, উত্তর-দক্ষিণে পৌণে চার হাত লম্বা সিমেন্টের চত্বর। এই চত্বরের দেড় হাত অভ্যন্তরে দুই হাত উঁচু লাল ইটের একটা বেদী। বেদীর মাঝখানে তিনটি স্তম্ভ। মাঝখানের স্তম্ভটি অন্য দুটির চেয়ে উঁচু। এটিতে খোদাই করা মীর মদনের নাম। মীরমদনের স্তম্ভের ডানে নাওয়ি সিংহ হাজারী, বামে বাহাদুর আলী খানের স্মৃতি স্তম্ভ। পুরো চত্বরের উর্ধ্বাংশ খোলা। চত্বর অপরিষ্কার। প্রবেশপথে নেই কোনো দরোজা। এই চত্বর ও স্তম্ভের নির্মাতা নদীয়া জেলা সিটিজেনস কাউন্সিল। ১৯৭২-৭৩ সালে তারা তাদের স্বাধীনতার সিলভার জুবিলি উপলক্ষে এই চত্বর নির্মাণ করে। স্তম্ভের গায়ে মার্বেল পাথরে কালো অক্ষরে লেখা ঃ

Here Fell Bakshi mir madan, chief of artilliery, bahadur Ali Khan, Commander of Musketeers, Nauwe Singh Hazari, Captain of Artillery of Nawab Siraj-ud-Daula At the Head of the charge ordered by mir madan at 2 p. m. on june 23, 1757 in the battle of plassey.

এই স্তম্ভ চত্বরের পশ্চিম কোণায় একটি ঘন সবুজ নিম গাছ। দক্ষিণ-পশ্চিম পাশে একটি মাথাভাঙ্গা বটগাছ। বেদী থেকে পশ্চিম দিকে তাকালে সাবেক ভাগীরথীর পানি দেখা যায়। আর উপরে নীল পাথরের মতো জমাট আকাশ মৌন।

১৯৭৩ সালের পর আর কেউ এই স্তম্ভ চত্বরের খোঁজ নিয়েছে কিনা কেউ বলতে পারে না।

পলাশী মাঠের বিবিধ মানুষ

মীরমদন স্মৃতি স্তম্ভের পাশ ঘেঁষেই একটি মেঠো পথ। ধান পাটের বুক চিড়ে উঠে গেছে উঁচু সড়কে। এই মেঠো পথে গরু চড়াচ্ছিলো রবি রাজোয়াল। রাজোয়ালরা বর্ণ হিন্দুদের চোখে নিচু জাতের মানুষ। বয়স পঁচিশ কি ছাব্বিশ। বউ আছে। বাচ্চা দুটা। বললো, 'এখানে নদী ছিলো। এখন সরে গেছে। আর আমাদের বাড়ি ওই গাঁয়ে।

বললাম, 'রবি তুমি জানো এটা কিসের মাঠ'?

www.pathagar.com

রবি বললো, 'চিনি কলের মাঠ।'

– 'এই মাঠের আর কোনো নাম আছে রবি?'

- 'পলাশীর মাঠ।'

- 'এই মাঠে, এইখানে কি হয়েছিলো রবি?'

- 'এইখানে মারামারি হয়।'

- 'কার কার সাথে?'

- 'তা অতো জানি না বাপু।'

বললাম, 'আচ্ছা রবি তুমি সিরাজদ্দৌলার নাম জান'?

বললো, 'দাদা ঠাকুরদার কাছে শুনেছি'।

- কি শুনেছো?

- শুনেছি এখানে সিরাজদ্দৌলার আমবাগান ছিলো। খুব আম খেতো সে। খুব দুর্ধর্ষ লোক ছিলো সে। অত্যাচার করতো। মেয়েলোক ধরে ধরে আনতো একানে।

- সিরাজদ্দৌলাকে কারা হত্যা করেছিলো জান?

- ইংরেজরা নাকি তাকে মেরেছে শুনেছি।

- কেন মেরেছে তা জান?

- কিজানি আমরা গরীব মানুষ কেমন করে বলবো।

- ওই মনুমেন্ট ওটা কিসের জান?

- জানি না

- ২৩ জুন কিহয়েছিলো এখানে জান?

- না বাবু।

- ১৫ আগস্ট তোমাদের কি দিন জান?

- স্বাধীনতার দিন।

- কি ভাবে তোমাদের স্বাধীনতা এসেছিলো তা জান?

- সুভাষ বোসু এনেছিলো।

- রবীন্দ্রনাথের নাম জানো?

- হ্যাঁ বাবু সে অবতার ছিলো।

- নজরুল ইসলামের নাম জান!

- না বাবু।

পলাশীর একাংশ উঁচু অন্য অংশ খানিকটা নীচু। সম্ভবত নদীর ভাঙ্গনের জন্যই এমনটি হয়েছিলো। যা হোক। পাটের সবুজ ক্ষেতে ছোট ছোট চারাগাছ। নিড়ানী দিচ্ছিল কয়েকজন ক্ষেতমজুর। আমরা একটু এগিয়ে তাদের কাছে গেলাম। নাম জানা গেল দু'জনের। উত্তম কুমার ও তাপস বিশ্বাস। বললাম, 'এটা কিসের মাঠ জানেন'?

www.pathagar.com

- উত্তম বললো, 'রাক্ষুসী পলাশী'।

- রাক্ষুসী কেন

- কি জানি সবাই বলে তাই বলি।

- এখানে যে যুদ্ধ হয়েছিলো তা জানেন?

- জানি, মীরজাফরের সাথে যুদ্ধ হয়েছিলো।

- কার সাথে যুদ্ধ করেছিলো মীরজাফর?

- ইংরাজদের সাথে

- সিরাজদ্দৌলার নাম শুনেছেন?

- শুনেছি।

- তিনি কে ছিলেন তা জানেন?

- না।

পাট ক্ষেত পাড়ি দিয়ে পশ্চিম দিকে আরও গভীরে এগুলো আমাদের তিনজনের দলটি। ঘামে ততক্ষণে নেয়ে উঠেছে আনীস আর রশীদ। কিন্তু ক্লান্তি নেই কারো। পলাশী ট্রাজেডীর ২৩৪ বছর পর নতুন ট্রাজেডীর মুখোমুখি আজ আমরা।

এগিয়ে দেখি জলাভূমির পাড়ে বকরী চড়াচ্ছে এক দঙ্গল ছেলেমেয়ে। ডাকলাম। কাছে আসে না। হাত ইশারায় ডেকে ডেকে, চিৎকার করে বললাম, 'তোমাদের ছবি তুলবো।'

অমনি দৌড়ে ছুটে এলো পশ্চিমবাংলা তথা ভারতের ভবিষ্যৎ। সংখ্যায় ওরা ১১ জন, সুকুমার, মৃত্যুঞ্জয়, সোমেন, শ্যামলী, প্রশান্ত, অঞ্জলি, প্রতিমা, সুনেত্রা, নমিতা, আশা ও ভোলা। প্রশান্ত খুব চটপটে। এসেই তাড়া, 'ছবি তুলুন, বাবু। আমাদের ছাগল লোকের ক্ষেত্রে ঢুকে যাবে।'

বললাম, 'তোমরা তার আগে বলো দেখি এটা কিসের মাঠ'?

প্রশান্ত বলল, 'সে কি, ধান হয় এ মাঠে, আমরা এখানে কত খেলি'।

- তোমাদের বাবা-মা বলেন নি কখনো?

প্রশান্তর চটপটে জবাব, 'বলেছে যা ছাগল নিয়ে মাঠে যা'।

বললাম, 'সিরাজদ্দৌলার নাম শুনেছো।'

প্রশান্ত আমতা আমতা করে। এবার জবাব দেয় ভোলা, 'না বাবু।'

দূরের মনুমেন্ট দেখিয়ে বললাম, 'ওটা কি জান?'

ভোলা বলে, 'জানি না আবার, পাথর দিয়ে বানিয়েছে বাবুরা।'

সবাই অস্থির, 'এবার ছবি তুলুন।'

বললাম, 'তুলছি, আর দু' একটি কথার জবাব দিলেই তুলবো। আচ্ছা বলতো, তোমাদের গাঁয়ের নাম কি? প্রশান্ত বললো, 'পলাশী।'

- তোমরা কে কে স্কুলে পড়?

www.pathagar.com

চারজন হাত তুললো।

তাদেরকে বললাম, 'এখানে যে যুদ্ধ হয়েছিল তা জান'?

ভোলা বললো, 'বাপের জন্মে আমরা কখনও যুদ্ধ দেখিনি'।

অঞ্জলি আমাকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, 'যুদ্ধটা কি জিনিস বাবু?'

বললাম, 'অনেক লোকের মারামারি, গোলাগুলী।'

- মানুষ মরে যায় না?

বললাম, 'কতো মরে।' অঞ্জলির চোখে ভয় এসে ভীড় করে।

পলাশীর ভূমিহীন দরিদ্র পরিবারের সন্তান এই শিশু-কিশোররা। তাদের কারোরই বয়স ১২ বছরের উপরে নয়। বিদেশী লোকেরা কেন এখানে বেড়াতে আসে আর কেনই বা আমরা ছবি তুলছি এরা জানে না। বোঝেও না।

বেলা তখনই অনেক হেলে পড়েছে পশ্চিমে। মাঠ পেরিয়ে মনুমেন্টের দিকে যেতে, উঠলাম পুরানো সড়কে। এর মধ্যে বিল্লাল শেখ ছুটে এসেছে তার আরও দু'জন সঙ্গী নিয়ে। পলাশী মাঠে তাদেরও ছবি তুললাম। সড়কে উঠেই দেখা একজন বয়স্ক ভদ্রলোকের সাথে। দুটো কথা বলার অনুমতি চাইতেই নামলেন সাইকেল থেকে। নাম গণপতি মন্ডল। মোড়ল গোছের মানুষ। বয়স পঞ্চাশের কোঠায়। অত্যন্ত সাবধানী। কথা বলেন হিসাব করে, ধীরে ধীরে, চিবিয়ে চিবিয়ে।

বললাম, 'দাদা এই পলাশী মাঠে কি হয়েছিলো জানেন'?

গণপতি মন্ডল কুত কুত করে তাকিয়ে রইলেন আমাদের দিকে। তারপর বললেন, 'যুদ্ধ'।

- কার কার সাথে?

গণপতি মন্ডল হাত দিয়ে মনুমেন্ট অর ডাকবাংলা দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'ওখানে যান সব জানতে পারবেন।' বলেই আমাদের আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে সাইকেলে চাপলেন।

গণপতি মন্ডল চলে যেতেই অন্য একটি সাইকেলে চেপে একজন স্কুল ছাত্র এলো। বয়স পনের যোল বছর। নাম বিশ্বনাথ ঘোষ। ক্লাস নাইনে পড়ে। ৭৫ জন ছাত্র পড়ে বিশ্বনাথের ক্লাসে। ওর ক্রমিক নম্বর ৮।

বললাম, 'বিশ্বনাথ এই জায়গাটা কি জন্য বিখ্যাত জানো'?

- বিশ্বনাথের সাফ জবাব 'না'।

- ওই মনুমেন্টটা কি তা জান?

- জানি।

- বলোতো-

- শুনতে পাই যুদ্ধ হয়েছিলো।

- কার কার সাথে?

www.pathagar.com

- অতো তো বলতে পারবো না। বাবার কাছে শুনেছি মীরজাফর আর মীর কাশিমের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধলো, সেই জন্য ইংরেজরা যুদ্ধ থামাতে এই মনুমেন্ট বানালো।

- সিরাজদ্দৌলা কে ছিলো জান?

- জানি, ভালো লোক ছিলো।

- আর কিছু জানো? তোমাদের পাঠ্যবইয়ে তাঁর কথা নেই?

- দেখুন ইতিহাসে আমি খুব একটা ভালো নই।

- আচ্ছা ঠিক আছে, ধরে নিলাম তুমি ইতিহাসে ভালো নও। কিন্তু এই মাঠের নামটা নিশ্চয়ই জানো?

বিশ্বনাথ এবার কিছুটা রেগে যায়, 'আমাদের বাড়ি তো এখান থেকে দুই কিলোমিটার দূরে। আমি কি করে জানবো এই মাঠের নাম'।

বললাম, 'তোমার বাবা কি করেন'?

বিশ্বনাথ বললো, 'ব্যবসা করেন ভূষিমালের। বিশ্বনাথ চলে যেতে পারলে বাঁচে। বললাম, 'বিশ্ব আর মাত্র দুটি প্রশ্ন করবো তোমাকে'?

বিশ্বনাথ রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে বললো, 'বলুন'।

- আচ্ছা বিশ্ব, ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন কি হয়েছিলো পলাশীর মাঠে তা জান?

- জানি

- কি জান?

- যুদ্ধ হয়েছিলো।

- কোথায় হয়েছিলো যুদ্ধ?

- জানি না।

বিশ্ব শিষ দিতে দিতে চলে গেল।

আমরা মানে আনীস, রশীদ আর আমি সেই প্রাচীন প্রান্তরে দাঁড়িয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। রশীদ বললো, 'সেই ইতিহাসটা মনে পড়ছে আমার।'

আনীস বললো, 'কোন ইতিহাস?'

রশীদ বললো, 'পলাশীর প্রান্তরে বাংলা বিহার উড়িষ্যার স্বাধীনতার সূর্য যখন অস্ত যাচ্ছে, চারদিকে বিশ্বাসঘাতক আর চক্রান্তকারীদের উল্লাসধ্বনি, মীরজাফর, রায়দুর্লভ ইয়ার লতিফের নেতৃত্বে হাজার হাজার সৈন্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছে, মীরমদন নিহত, মোহনলাল আর সিমফ্রে লড়ছে সর্বশক্তি দিয়ে, কিংকর্তব্যবিমূঢ় তরুণ নবাব। আর পলাশী থেকে মাত্র অর্ধক্রোশ দূরে নিরুদ্বিগ্ন গুরুমশায় টোলে পড়াচ্ছেন ছাত্র। কৃষক কাজ করছে মাঠে। সেদিন না হয় হয়েছিলো রাজায় রাজায় যুদ্ধ, প্রজা ছিলো নিরীহ দর্শক। কিন্তু আজ ২৩৪ বছর পর বাঙ্গালী সত্যি কি হতে পেরেছে সচেতন? আজ আর এ কথা বলার উপায় নেই দেশটা রাজাদের। তাহলে? আসলে ২৩৪ বছরেও বাঙ্গালীর কোন উন্নতি হয়নি। ২৩৪ বছর আগে সেই অভিশপ্ত ১৭৫৭ সালের ২৩ জুনে বাঙ্গালী যেখানে দাঁড়িয়েছিলো- আজ ১৯৯১ সালের ৮ জুন আছে

www.pathagar.com

সেইখানে দাঁড়িয়ে। বাঙ্গালী মানুষ হলো না'।

আনীস বললো, 'এর জন্য দায়ী কে?

রশীদ বললো, 'সাম্রাজ্যবাদ'।

আমার বলতে ইচ্ছে করছিলো, 'এর জন্য কি কেবল সাম্রাজ্যবাদ দায়ী? তা তো নয়। দায়ী তো আরও অনেকে। জনগণকে দোষ দিয়ে লাভ কি? তারা কি কখনও ক্ষমতা দখল করতে পেরেছে'?

কিন্তু তার আগেই আনীস বললো, 'পূর্ব বাংলার বাঙ্গালীরা তবু পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করে 'বাংলা' নামে সৃষ্টি করেছে একটি দেশ। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালীরা? তারা তো তাদের আত্মপরিচয় বিস্মৃত হয়ে দিল্লীর দাসত্ব শৃঙ্খল গলায় পেঁচিয়ে ভাবছে মনিহার। রবীন্দ্রনাথের 'দুই পাখি' কবিতার খাঁচার পাখি এরা। নিল্লীর শেখানো বুলিই আজ এদের মাতৃভাষা। নইলে এমন কি কখনও হয়, একটি জাতি নিজের স্বাধীনতা স্বকীয়তা বিসর্জন দিয়ে সর্বভারতীয় মোহের মধ্যে খুঁজছে মুক্তি!

মনুমেন্টের কাছাকাছি উঠে এসেছি আমরা। আর একটু পরেই উঁচু সড়কের ওপারে হারিয়ে যাবে পলাশী। পশ্চিম আকাশে লাল হয়ে তলিয়ে যাচ্ছে সূর্য। হঠাৎ আনীস হাত তুলে বললো, 'দেখুন দেখুন।'

তাকিয়ে দেখি সেই মহাকালের স্বাক্ষী প্রাচীন বটবৃক্ষের একেবারে শীর্ষে বসে আছে দুটো শকুন। আমরা যখন মাঠের দিকে নেমে গিয়েছিলাম তখন বটগাছে কোন শকুন দেখিনি। এখন ফেরার পথে মহাকালের মাথার উপর শকুন। আবছা অন্ধকারের মধ্যেই আন্দাজে ক্যামেরার সার্টার টিপলাম। মনে মনে ভাবলাম, কি লাভ ছবি তুলে। এশিয়ার আকাশে আকাশে আজও অজস্র শকুন উড়ছে। শকুন উড়ছে এই উপমহাদেশের প্রতিটি জনগণের মাথার উপরে। এই শকুনীরাই তো উড়ে এসেছিলো মধ্য এশিয়া থেকে আজ থেকে ৩০০০ বছর আগে। শকুনীরা এসেছিলো সাত সমুদ্র সাতাশ নদীর ওপারের ইউরোপ থেকে। এই শকুন পলাশীর প্রান্তরে কেড়ে নিয়েছিলো বাংলার স্বাধীনতা। এই শকুন খুবলে খেয়েছে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার আপেলের মতো টকটকে লাল হৃদপিণ্ড। আশ্চর্য, এতো বছর পরেও পলাশী থেকে চলে যায়নি শকুনেরা!

মনুমেন্ট পেরিয়ে আধুনিক পীচের রাস্তায় উঠলাম। রিক্সা জান দাঁড়িয়েছিলো একটা। ঝটপট উঠতে বললো চালক। জায়গাটা ভালো নয়। তাছাড়া আপনাদের কাছে জিনিসপত্র রয়েছে। দেবদারু সারির ভিতর কালো অজগরের মতো পীচের পথ তখন আরো কালো হয়ে গেছে।

ভ্যান এগিয়ে চলে। অনেকক্ষণ। পেছনে তাকিয়ে দেখি পথের শেষ প্রান্তে আবছা অন্ধকারে ক্লাইভের মতো ভঙ্গি করে দাঁড়িয়ে আছে মনুমেন্ট। মুহূর্তে ফিরিয়ে নিলাম চোখ। পেছনে আমাদের পরাজয়--সামনে হাতছানি দিয়ে ডাকছে ভবিষ্যৎ।

সিরাজের রক্তে রঞ্জিত জাফরাগঞ্জ প্রাসাদ এখন নিমকহারাম দেউড়ি

কাটরা মসজিদ, কাঠগোলার বাগান, জগৎশেঠের বাড়ি দেখে আমাদের টাঙ্গা এসে থামলো নিমকহারাম দেউড়িতে। নিমকহারাম দেউড়ির আসল নাম জাফরাগঞ্জ প্রাসাদ। মীরজাফরের স্ত্রী, নবাব আলীবর্দী খানের বৈমাত্রেয় বোন শাহ খানাম ছিলেন এই

www.pathagar.com

প্রাসাদের নির্মাতা। নবাব হওয়ার পর মীরজাফর চলে যান সিরাজের প্রাসাদ হীরাঝিলে। জাফরাগঞ্জ প্রাসাদ অর্পণ করেন মীরনের হাতে। এখন অবশ্য বাইরের নহবত দরওয়াজা এবং প্রাসাদের পিছনে মীরজাফরের মসজিদ ভিন্ন আর তেমন কিছু অবশিষ্ট নেই। ১৮৯৭-এর ভূমিকম্পে এই প্রাসাদ বিধ্বস্ত হয়। মসজিদের ভিতরে আছে একটি গোপন সুড়ঙ্গ পথ। এই পথের অন্যপ্রান্ত জগৎশেঠের শয্যাগৃহ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, গাইড জানালো। এখন জাফরাগঞ্জের যে অর্ধভগ্ন বাড়িটি আছে তাতে বাস করেন মীরনের বংশধর সৈয়দ মোহাম্মদ রেজা আলী খান B. Sc. M. A. B. Ed । ঘরের দরোজায় তার নামফলক টাঙ্গানো।

জাফরাগঞ্জ প্রাসাদ এখন নিমকহারাম দেউড়ি বলে সর্বমহলে পরিচিত। কারণ এই প্রাসাদের একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে ক্লাইভের পরামর্শে মীরজাফরের অনুমতিতে, মিরনের আদেশে, মোহাম্মদী বেগ দ্বারা নির্মমভাবে নিহত হয়েছিলেন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব। ঐতিহাসিক নিখিল রায় লিখেছেন, 'জাফরাগঞ্জ সিরাজের বধ্যভূমি-বাঙ্গালা, বিহার উড়িষ্যার স্বাধীনতার সমাধিক্ষেত্র।' এই ঐতিহাসিক অবশ্য তার 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী'তে লিখেছেন, 'সিরাজের রক্তে জাফরাগঞ্জের যে গৃহ রঞ্জিত হইয়াছিলো, এক্ষণে তাহা ভূমিসাৎ হইয়াছে–তাহার কোন চিহ্নই বর্তমান নাই। এখন সেখানে একটি প্রকাণ্ড নিম্ববৃক্ষ দণ্ডায়মান রহিয়াছে।' কিন্তু দেউড়ির বাইরে ভাড়া করা গাইড বললো সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়নি সে কক্ষ। আপনাদের দেখাতে পারবো।

অভিশপ্ত সেই কক্ষে

২৩ জুন পলাশী বিপর্যয়। রাজধানী শত্রুশূন্য। কিন্তু মীরজাফর অপেক্ষা করছেন ক্লাইভের জন্য। ক্লাইভ তাকে সিংহাসনে বসালে তবে তিনি বসবেন। নইলে নয়। অবশেষে '২৯ জুন দুইশত গোরা এবং পাঁচশত কালা সিপাহী সমভিব্যহারে ইংরেজ সেনাপতি মনসুরগঞ্জে শুভাগমন করিলেন।' ক্লাইভ লিখিয়া গিয়াছেন,–'সেদিন যতো লোক রাজপথ পার্শ্বে সমবেত হইয়াছিলো, তাহারা ইংরেজ নিধনে কৃতসংকল্প হইলে, কেবল লাঠিসোঁটা এবং লোষ্ট্রনিক্ষেপেই তৎকার্য সাধন করিতে পারিত।'

[সিরাজদ্দৌলা। অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়। পৃঃ ৩৮৩]

মীরজাফর সিংহাসনে উপবেশন করলেন। এমন সময় খবর এলো সিরাজ ধরা পড়ছেন। 'মীরজাফরের প্রবল উৎকণ্ঠা দূর হইয়া গেল। তিনি ক্লাইভের কণ্ঠলগ্ন হইয়া হীরাঝিলে মন্ত্রণা করিতেছিলেন। সংবাদ পাইবামাত্র সিরাজদ্দৌলাকে বাঁধিয়া আনিবার জন্য যুবরাজ মীরনকে সসৈন্যে রাজমহলে পাঠাইয়া দিলেন।' [ঐ]

অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়র মতে 'আত্মভৃত্যবর্গের নিষ্ঠুর নির্যাতনে জীবন্মৃত কলেবরে সিরাজদ্দৌলা বন্দী বেশে মুর্শিদাবাদে উপনীত হইলেন। আলিবর্দীর স্নেহপুত্তলির এই ভাগ্য পরিবর্তনের চিত্র সম্মুখে দেখিয়া মুর্শিদাবাদের লোকে হাহাকার করিয়া উঠিল।' ঐতিহাসিক স্কটের HISTORY OF BENGAL -এ মুসলমান ঐতিহাসিকদের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, Be warned by example, o ye men of understanding and view well the revolutions of fortune. Place not your reliance upon the world's success, for it is uncertain and inconstant, like a public figure, who goes daily from house to house."

www.pathagar.com

মীরজাফরের মন্ত্রণাকক্ষে হয়তো এজন্যই ক্লাইভ তৎপর হয়ে উঠলেন। দ্রুত নিষ্পত্তি চাই। সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। জাফরাগঞ্জ প্রাসাদের ছোট্ট একটি অন্ধ কুঠুরিতে নিক্ষেপ করা হলো সিরাজকে। তারিখটা ২ জুলাই ১৭৫৭। পরদিন গভীর রাতে এগিয়ে এলো ঘাতক। তার অট্টহাসিতে কেঁপে ওঠে জাফরাগঞ্জ। কেঁপে ওঠে মুর্শিদাবাদ। বাংলার নবাব ঘাতকের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে অপমান করেননি বাংলাদেশকে। চেয়েছিলেন শুধু দু'রাকাত নামাজ আদায়ের সময়। কিন্তু সে সময়টুকুও তাকে দেয়নি ঘাতক। সেই অভিশপ্ত কক্ষ দেখতে পাবো আমরা!

সদর রাস্তা থেকে নিমকহারাম দেউড়ির প্রধান প্রবেশ তোরণের পরে ভিতরে বাক নিয়েই প্রাসাদের মুখোমুখি আরও একটি তোরণ। এই তোরণ থেকে প্রাসাদ পর্যন্ত সুড়কির পথ। পথ দিয়ে প্রাসাদের দিকে এগুতেই গাইড বললো, ডান দিকের দেয়াল ঘেঁষে প্রাসাদ পর্যন্ত টানা ছোট ছোট ঘরগুলোকে দেখুন। এরই তৃতীয় যে কুঠুরি দেখছেন ছাদবিহীন, ওইখানে দিনগত রাতে, গভীর রাতে হত্যা করা হয় নবাব সিরাজদ্দৌলাকে। থমকে দাঁড়ালাম আমরা।

এতক্ষণ অনর্গল কথা বলছিলাম। এবার স্তব্ধতা আমাদের ঘিরে। ধীর পায়ে এগুলাম কক্ষের দিকে। ছোট্ট একটি অপরিসর কক্ষ। মাথার উপরে কোন ছাদ নেই। দেয়ালগুলো ভাঙ্গা। একটি প্রবেশ পথ। তাতেও কোন দরজা নেই। ভিতরে ময়লার স্তূপ। অত্যন্ত অযত্নে ঘরের ভেতর পড়ে আছে মাটি চাপা দেয়ার একটি রোলার। মেঝে ফুঁড়ে মাথা তুলেছে আগাছা। না, সিরাজের কোন স্মৃতিচিহ্ন কোথাও নেই। নেই সামান্য একটি ফলকও।

এখানে এই কক্ষে নির্মমভাবে নৃশংস উপায়ে হত্যা করা হয়েছিলো বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবকে। সেই পবিত্র রক্তরঞ্জিত কক্ষের একি হাল! আনীস আর রশীদের চোখে পানি টলমল করে ওঠে। ক্রুদ্ধ আনীস চাপা যন্ত্রণায় কাঁপে, সত্যি, এদেশে কি মানুষ নেই? বাংলার প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামীর স্মৃতিবাহী এই কক্ষটিকে কি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে হেফাজত করা যেতো না? কে বারণ করেছিলো? সামান্য মানবতা, সামান্য দায়িত্ববোধ কি থাকতে নেই একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের?"

অভিশপ্ত কক্ষটির বাইরে এসে দাঁড়াই আমরা। আর কিছু দেখতে রাজী ছিলো না আমার দল। গাইড একরকম জোর করে নিয়ে যায় প্রাসাদের অস্ত্রাগারে। অস্ত্রাগার এখন নামেই অস্ত্রাগার। অস্ত্র বলতে আছে দু'টি তলোয়ার। আর সরফরাজ খানের ফুটি মসজিদের একটা তৈলচিত্র। তলোয়ার দু'টির একটি নবাব সিরাজের অন্যটি মীরজাফরের। নিমকহারাম দেউড়ি থেকে মাথা নীচু করে বেরিয়ে আসি আমরা। ক্লাইভ, মীরজাফর, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, উমিচাঁদ, রাজবল্লভ, মীরন আর মোহাম্মদী বেগদের এই হিংস্র ভবন আমাদের আর আকৃষ্ট করে না।

জাফরাগঞ্জ কবরগাহ

এরপরেই মীরজাফরদের সমাধিক্ষেত্র। এক মিরন বাদে মীরজাফর বংশের প্রায় ১১০০ জনের কবর রয়েছে এই কবরগাহে। মীরজাফরের কবর দেখতে ঢুকলাম

www.pathagar.com

ভেতরে। কালো পাথরের কবর। কবর রয়েছে তার তিন স্ত্রীরও। মীরজাফরের কবরের সামনে গিয়ে বেশিরভাগ পর্যটকই নাকি উত্তেজিত হয়ে পড়ে। আমরাও তেমন উত্তেজিত ক্রুদ্ধ একজনকে পেলাম।

খুব বেশী না হলেও যত্নের সাথে সংরক্ষিত এই কবরগাহ। এখানে মীরন যে পায়রা দিয়ে ইংরেজদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতো, সেই পায়রার কবরও দেখলাম।

কবরগাহে ঢুকতে দু'টাকা লাগে, নিমকহারাম দেউড়িতে লাগে, এক টাকা। এইসব মীরজাফরের বংশধররা ভোগ করে। আর এই ভোগের যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য ছাপিয়েছে কুপন। নমুনা দেখুন ঃ

আমাদের আবেদন

এই সমাধিক্ষেত্র মীরজাফরের পারিবারিক। এখানে মীরন, মীর কাশিম বাদে সব নবাব নাজিমদের কবর আছে। দীর্ঘদিন ধরে আমাদের পূর্ব পুরুষ এই সমাধিক্ষেত্রে সেবাযত্ন করে এসেছেন। পরপর আমরাও করছি। দুঃখের বিষয় আমাদের মাসিক ভাতা সেই নবাবী আমলের এগার টাকা করে আজও রয়েছে। এতে জীবনধারণ করা কঠিন হচ্ছে। তাই আমাদের জীবন রক্ষার জন্য আপনার নিকট হতে সামান্য সাহায্য লইয়া ধন্যবাদ জানাই।

ইতি-

গার্ড ৪ জন ও মুন্সী

জাফরাগঞ্জ

পোঃ নশীপুর, রাজবাটি

মুর্শিদাবাদ-১৫০৬

তবে একথা সত্য মীরজাফরের বংশধরদের কেউ আজ আর আর্থিক দিক দিয়ে সচ্ছল নেই-সরকারী উদাসীনতা তাদের ঠেলে দিয়েছে দারিদ্র্যের মধ্যে।

মীরজাফরের বংশধরদের লেখা ইতিহাস

তৎকালীন পাকিস্তানে সামরিক শাসন আমদানির নায়ক ছিলেন মীরজাফরের অন্যতম সুযোগ্য উত্তরাধিকারী ইসকান্দার মির্জা! ইসকান্দার মির্জাও মরেছে। কিন্তু তাদের বংশধররা রয়ে গেছে এখানে ওখানে। তারা ইদানীং মুর্শিদাবাদের ইতিহাস রচনায় হাত দিয়েছেন। এইসব ইতিহাস গ্রন্থে মীরজাফরকে নতুনভাবে একজন দেশপ্রেমিক হিসাবে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। পাশাপাশি সিরাজদ্দৌলা সম্পর্কে করা হয়েছে অশোভন ও আপত্তিকর মন্তব্য। এই রকম একটি ইতিহাস গ্রন্থ আমরা কিনলাম নিমকহারাম দেউড়ির প্রবেশ পথে। বইটির নাম 'বিচিত্র মুর্শিদাবাদ'। মূল্যঃ ৬.৫০ টাকা। লেখক এম বেগম। প্রকাশক সৈয়দ নবাব আলম। ভূমিকা লিখেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গোল্ড মেডালিস্ট জনৈক রবীন্দ্র আদিত্য। এই এম বেগম লিখেছেন, 'রাজনৈতিক চাতুরী ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রেই সিরাজকে প্রকৃত বীরের আখ্যায় অভিহিত করা যায় না। হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজেরা

www.pathagar.com

সিরাজদ্দৌলার চরিত্র সম্পর্কে কোন সুন্দর মন্তব্য করেননি।'

[বিচিত্র মুর্শিদাবাদ। পৃঃ ৮]

সিরাজের দলিত-মথিত লাশ ফেলে দেয়া হয়েছিলো বাজারের ময়লা স্তূপে

নিমকহারাম দেউড়ি থেকে যে পথ দিয়ে মিরনের নেতৃত্বে, শহীদ সিরাজের খন্ড-বিখন্ড, দলিত-মথিত লাশ হাতীর পিঠে চাপিয়ে বেরিয়েছিলো হিংস্র উল্লাসমুখর মিছিল, সেই পথ দিয়ে টাঙ্গা এগিয়ে চললো। ইটের খোয়া বিছানো এবড়ো-থেবড়ো পথ। দুপুর একটার সময় টাঙ্গা পৌঁছলো হাজার দুয়ারী প্রাসাদের গেটে। বিশাল বিস্তৃত হাজার দুয়ারী মীরজাফর ও ক্লাইভের প্রিয়জনদের বিলাসী আবাসস্থল। ভিতরে ঢুকতে গিয়ে থামলাম।

মুর্শিদাবাদে আমাদের প্রায় একটা দিন পার হয়ে গেছে। এখনও শহীদ নবাব সিরাজের সমাধিস্থলে যাইনি। না, আর কোথাও নয়। সবার আগে খোশবাগ। তারপর অন্যকিছু।

খোশবাগের পথে

মীরজাফরের সপ্তম পুরুষ নবাব ওয়াসিফ আলী মির্জার নিউ প্যালেসের সামনের বাঁধানো ঘাট থেকে নৌকা ভাড়া করলাম আমরা। এপারে মুর্শিদাবাদ, কোলাহল, গর্বিত হাজার দুয়ারী। ওপারে নিভৃত গ্রামের গহীনে নীরব-নিস্তব্ধ খোশবাগ। খোশবাগে শুয়ে আছেন বাংলা বিহার উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলা।

আমাদের মাঝির নাম প্রশান্ত হালদার। পুরুষানুক্রমে নৌকা চালানো ওদের পেশা। মূল মুর্শিদাবাদ বা লালবাগ থেকে দক্ষিণ দিকে ভাগীরথী নদীর ওপারে খোশবাগ। দূরত্ব মাইল দেড়েকের মতো। এর বেশির-ভাগটাই পানিপথ। যাওয়ার বাহন দু'টি, নৌকা এবং পদব্রজ। নৌকা থেকে নেমেও হাঁটতে হবে অনেকদূর। নদীপথে তবু নৌকার পথ আছে। কিন্তু নদীর তীর থেকে মাযার ভবনে যাওয়ার সরাসরি রাস্তা, রাস্তা না বলে মেঠোপথ বলাই শ্রেয়-কর্দমাক্ত। অবশ্য ঘুরপথে লালবাগ ঘাট থেকে মাযারে যাওয়ার রাস্তাটি কিছুটা ভালো। নৌকা এগিয়ে চলে। পানির তোড়ে দুলতে থাকে নৌকা। দুলতে থাকে আমাদের হৃদয়।

খোশবাগ ঘাটে পৌঁছে দেখি দুপুরের নদীতে গোসল করছে গ্রামের মানুষ। এগিয়ে আসে উৎসাহী কেউ কেউ, নবাবের কবরস্তানে যাবেন?

বলি, হ্যাঁ।

–'কিন্তু সামনে যে কাদা পানি' লোকগুলো অপরাধবোধে ভোগে। যেন রাস্তার দুর্গতির জন্য তারাই দায়ী। আমরা জুতা খুলে, প্যান্ট গুটিয়ে হাঁটতে থাকি। ৩০০ গজের মতো পথ। সামনে ঘন গাছপালার ভিতর থেকে উঁকি দেয় সমাধি ভবনের দেয়াল।

বাংলা বিহার উড়িষ্যার স্বাধীনতার সমাধিভূমিতে

খোশবাগ সম্পর্কে ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায় তার মুর্শিদাবাদ কাহিনীতে লিখেছেন, "এই স্নিগ্ধচ্ছায়া সমন্বিত শান্তিনিকেতন খোশবাগ মুর্শিদাবাদের মধ্যে একটি বৈরাগ্যোদ্দীপক স্থান। এখানে আসিলে আলীবর্দী ও সিরাজের অনেক কথা মনে উদয় হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর সেই মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধ, সেই আফগান-সমর, পলাশী রণক্ষেত্রে মুসলমান রাজলক্ষ্মীর সেই মর্মভেদী বিদায়-দৃশ্য সমস্ত চিত্র ধীরে ধীরে মানসপটে ফুটিয়া ওঠে।" কথাটা যে একরত্তি বাড়িয়ে বলা না, তা আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করলাম

www.pathagar.com

খোশেবাগের প্রাচীরবেষ্টিত সমাধিভূমির সামনে দাঁড়িয়ে।

খোশবাগের প্রতিষ্ঠাতা নবাব আলীবর্দী খান। মুর্শিদাবাদের কলকোলাহলের বাইরে বৃদ্ধ নবাব খুঁজেছিলেন নিভৃতি। খানিক বিশ্রাম। তাই এই গহীন গভীর গ্রামের গোপনে তার জন্য নির্মিত হলো খোশবাগ ১৭৪০ খ্রিষ্টাব্দে।

আনন্দ-উদ্যান। এখানে ছিলো হাজার রকম গোলাপের বাগান। নিখিল নাথ রায়ের ভাষায়, "বাংলার আদর্শ নবাব মহামহিমান্বিত আলীবর্দী খান মোহবৎজঙ্গ"– এর আনন্দ উদ্যান যে একদিন বাংলা বিহার উড়িষ্যার বেদনার উদ্যানে পরিণত হবে, পরিণত হবে স্বাধীনতার সমাধি ভবনে তা হয়তো কেউ কোন দিন ভাবেনি।

আলীবর্দী খানের জীবদ্দশায় এখানে তাঁর মাতাকে দাফন করা হয়। দাফন করা হয় নবাব আলীবর্দী খানকেও। তারপর একে একে খোশবাগের মাটিতে দাফন করা হয় নবাব সিরাজদ্দৌলাকে, ভ্রাতা মির্জা মেহেদীকে, পত্নী লুৎফুন্নিসাকে এবং আরো অনেককে।

প্রাচীরবেষ্টিত ৯ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত খোশবাগের প্রবেশপথ পূর্বদিকে। প্রবেশ তোরণ থেকে সুড়কির পথ চলে গেছে সোজা ভবনের দিকে। তিনটি চত্বরে বিভক্ত খোশবাগের প্রথম অংশ জেনানা কবর। জেনানা কবরস্তান উদ্যানের মধ্যস্থলে আলাদা করে প্রাচীরবেষ্টিত। এই প্রাচীর আসলে পর্দা করার জন্য। নবাবরা তাদের রমণীদের মৃত্যুর পর কবরকে পর্যন্ত পর্দায় রাখতেন। এই জেনানা কবরস্তানে গাইড আলাউদ্দীনের তথ্য মোতাবেক কবর আছে আলীবর্দী পত্নী শরফুন্নেসা বেগম, সিরাজমাতা আমিনা বেগম, খালা ঘষেটি বেগমের।

প্রবেশপথ থেকে জেনানা কবর অতিক্রম করলে দ্বিতীয় চত্বর। এই চত্বরের সামনেই মূল সমাধি ভবন। একতলা ভবনের বারোদুয়ারী এই সমাধি ভবনের একদম কেন্দ্রস্থলে শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর দ্বারা নির্মিত উঁচু কবরটি নবাব আলীবর্দীর। নবাব আলীবর্দীর পূর্বপাশেই সিরাজের কবর। তার পূর্বে ভাই মেহেদীর। সিরাজের কবরের সোজা পায়ের কবরটি পতিপ্রাণ লুৎফুন্নিসার। আলীবর্দীর কবরের পশ্চিমে শওকতজঙ্গ ও তার স্ত্রীর কবর। এই কবর ভবনের উত্তর পাশে বাইরে বাগানে একসাথে ১৭টি কবর। গাইড বললো, এই ১৭ জন নবাবপ্রেমিক আশরাফুদ্দৌলার নেতৃত্বে বিহার থেকে ছুটে এসেছিলেন নবাবের কবর জিয়ারত করার জন্য। কিন্তু তাদের আর বিহারে ফিরে যাওয়া হয়নি। নির্মমভাবে তাদের হত্যা করে মিরণ। দক্ষিণের বাগানের কাছে আরো ৩টি কবর। বলা হয় এর একটি কবর দানশা ফকিরের। মূল কবর ভবন অতিক্রম করলে তৃতীয় এবং শেষ চত্বর। এই চত্বরের শেষে তিন গম্বুজ বিশিষ্ট আলিবর্দী মসজিদ। ১৯১৫ সালে এ মসজিদ আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া অধিগ্রহণ করে। শুরু হয় দুর্গতি।

আমরা এসেছি তোমাকে দেখতে

প্রবেশ পথেই সঙ্গী হলো গাইড আলাউদ্দীন। আলাউদ্দীনের পিতা একসময় এই খোশবাগের তত্ত্বাবধায়ক ছিলো। ওর কথা শুনতে শুনতে জেনানা চত্বর অতিক্রম করে মূল কবর ভবনে প্রবেশ করি আমরা। অনেকগুলো কবর আধো আধো অন্ধকারে। ঘরে কোন বাতির ব্যবস্থা নেই। যদিও এই কবর ভবনের পাশ ঘেঁষেই এখানে ওখানে জ্বলছে বিদ্যুৎ তবুও বাংলার মানুষের এই পবিত্র ভবনে কেউ আলোর ব্যবস্থা করেনি। খুব পরিচ্ছন্ন নয় ঘরটি। একসময় ঘরটির সবগুলো দিক খোলা ছিলো। এখন খোলা আছে মাত্র দুই দিক।

www.pathagar.com

গাইড একটি সাদা ফলকযুক্ত কবর যা মেঝে থেকে মাত্র অর্ধহাত উঁচু তার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ কলে বললো "এইটা সিরাজদ্দৌলার করব।"

আমার ভিতরে কোথাও একটা বিদ্যুৎ বয়ে যায়। কোথাও যেন এক সাথে চিৎকার করে উঠে হাজার হাজার পাখি। রাজতন্ত্র কিংবা শাহীতন্ত্রের উপর প্রচন্ড অনীহা আমার। কিন্তু সিরাজ কি তথাকথিত অর্থে বাদশাহ ছিলেন নবাব ছিলেন? না-কি ছিলেন আমাদের স্বাধীনতার প্রথম শহীদ। মহান যোদ্ধা দেশমাতৃকার স্বাধীনতা রক্ষার প্রথম সৈনিক।

আমি কি করবো ঠাহর করতে পারি না। ক্যামেরা কলম আর আমার 'সিরাজদ্দৌলা' কবিতা কোনটা আগে হাতে তুলে নেব? কথা ছিলো সিরাজের শিয়রের কাছে বসে কবিতাটি পড়াবা। "কিন্তু এখন কোন কিছুই না করে শুধু তোমার প্রস্তুরীভূত অনাড়ম্বর কবরের দিকে তাকিয়ে আছি দ্যাখো। জাফরগঞ্জ প্রাসাদ তোমাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে ওরা এইখানে শুইয়ে রেখেছে। তুমি কি এখন অনন্ত বিশ্রামে? তোমার শাসনামলের একটি দিনও তোমাকে ওরা বিশ্রাম নিতে দেয়নি নবাব। সেই জন্য কি জীবনের সমস্ত ক্লান্তিকে ক্ষত-বিক্ষত অঙ্গে জড়িয়ে এইখানে ঘুমিয়ে আছো তুমি। তুমি সিরাজ দুঃখিনী বাংলার হতভাগ্য সন্তান আমাদের চেতনার কতবড় আকাশ তোমার নামে জ্বল জ্বল করে তুমি জানো? আর তুমি এইখানে এই নিভৃত গ্রামের পাখি ডাকা ছায়ার নীচে! তোমার নামে কোথাও তৈরী হয়নি কোন স্তম্ভ। তোমার মর্মর মূর্তি আমি দেখিনি কোথাও। সারা মুর্শিদাবাদের কোথাও তোমার সামান্য চিহ্নটুকুও কেউ রাখেনি। তবু তুমি আমাদের। আমাদের নায়ক।"

যেভাবে খোশবাগে এলেন তিনি

সিরাজের অসামান্য রূপ লাবণ্যময় দেহ উপর্যুপরি তরবারির আঘাতে টুকরো টুকরো করে ফেলেছিলো মোহাম্মদী বেগ। তারপর সেই ছিন্নভিন্ন দেহ পরদিন সকালে অর্থাৎ ৪ জুলাই হাতীর পিঠে চাপিয়ে বেরুলো আনন্দ মিছিল। নেতা মিরণ। চললো রাজপথ পরিক্রমণ। সেই ভয়ংকর মিছিল দেখে মুর্শিদাবাদের সাধারণ মানুষ শোকে বিস্ময়ে হাহাকার করে উঠলো। "তাহাদিগের আকুল আর্তনাদ মুসলমানের উচ্চ অবরোধ বেষ্টিত বেগম মহলে প্রবিষ্ট ও সিরাজ-জননী আমিনা বেগমের কর্ণগোচর হইল।" [সিরাজদ্দৌলা, পৃঃ ৪০৯)

"তখন তিনি পুত্রশোকে আত্মবিস্মৃত হইয়া, অবগুণ্ঠন উন্মোচন-পূর্বক দ্রুতপদে রাজপথ অভিমুখে ধাবিত হইলেন। যাহার অনাদৃত মুখমন্ডল দর্শনের সৌভাগ্য সবিতৃদেবের পক্ষেও সকল সময়ে ঘটিয়া উঠিত না, পুত্রের তাদৃশ শোচনীয় পরিণামের সংবাদ শ্রবণে তিনি আজ উন্মুক্ত রাজপথে সর্বসমক্ষে সমুপস্থিত! অনন্তর তিনি হস্তি পৃষ্ঠ হইতে তনয়ের মৃতদেহ নামাইয়া উহা পুনঃ পুন চুম্বন করিতে লাগিলেন এবং তাহার বক্ষস্থলে ধারণ-পূর্বক ছিন্নমূল ব্রততীর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। এই করুণ দৃশ্যে নগরবাসীগণের হৃদয় বিগলিত ও বদনমন্ডল অশ্রুধারায় প্লাবিত হইল।"

[মুর্শিদাবাদ কাহিনী : পৃঃ ৭০]

ধুলিবিলণ্ঠিত মাতা আমিনার পাগলিনী প্রায় আহাজারী দেখে, শববাহী হাতী চালকের নির্দেশ অমান্য করে, সহসা রাজপথে বসে পড়লো। কিন্তু অনড় অটল মিরণ। তার নির্দেশে বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি খাদিম হোসেন এলেন এগিয়ে। সিয়ারুল মুতাখখিরীনের লেখক সৈয়দ গোলাম হোসেন বলছেন, অতঃপর তার নির্দেশে তার অভদ্র দ্বাররক্ষীগণ কিল চড় ঘুষি মেরে নবাবের কন্যা, স্ত্রী ও সন্তানের মাংসপিন্ড বক্ষে

www.pathagar.com

ধারণ করা মূর্ছাপন্ন মা আমিনাকে জোর করে অন্ধরমহলে পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করলো।"

তারপর মিরণের উপযুক্ত অনুচরবৃন্দ সিরাজের দলিতমথিত লাশ, কবর দেয়ার কোন ব্যবস্থা না করে, বাজারের আবর্জনা স্তূপের মধ্যে ফেলে দিয়ে, তাদের কর্তব্য সম্পাদক করে ঘরে ফিরে গেলো। প্রচন্ড সিরাজদ্দৌলা বিদ্বেষী, নব্য ঐতিহাসিক মৃণাল চক্রবর্তীও তার 'সিরাজ-উদ-দৌলা' গ্রন্থে এই আচরণের জন্য ক্ষোভ চেপে রাখতে পারেননি।

সারাদিন সিরাজের লাশ পড়ে রইলো মুর্শিদাবাদের বাজারের সেই ময়লাস্তূপে। নবাবের মৃতদেহের উপর একটা সামান্য আচ্ছাদন দেয়ারও কেউ প্রয়োজন বোধ করলো না। ভয়ে কেউ এগিয়ে এলো না লাশ দাফনের জন্য। শুধু একজন মানুষ মীরজা জৈন-উল-আবেদীন' নামের একজন দয়ালু ওমরাহ, আরজি জানালেন মীরজাফরের কাছে, 'আপনার যা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিলো তা তো সম্পাদিত হয়েছে। দয়া করে মৃতদেহটি দাফনের অনুমতি আমাকে দিন।' সেদিন একমাত্র 'মীরজা জৈন-উল-আবেদীন ছাড়া আর কেউ মীরজাফর, জগৎশেঠ, মিরণ ও ক্লাইভের বিরাগভাজন হওয়ার ভয়ে এগিয়ে আসেননি। তারপর সন্ধ্যার অন্ধকারে ভাগীরথী যখন রূপার পাতের মতো বয়ে যাচ্ছে, আতংকিত মানুষ নিজ নিজ গৃহের মধ্যে খুঁজে বেড়াচ্ছে নিরাপত্তা। কাটাতে চাইছে শোক ও বিস্ময়ের ঘোর। সেই সময় এই মানুষটি অত্যন্ত যত্নের সাথে বুকে তুলে নিলেন হতভাগ্য সিরাজদ্দৌলার ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ। তারপর তাজিমের সাথে লাশ ধুয়ে-মুছে নৌকায় তুলে, ভাগীরথী পাড়ি দিয়ে চললেন খোশবাগে। খোশবাগে দাদু আলীবর্দী খানের কবরের পাশে সযত্নে মাটিতে শুইয়ে দিলেন সিরাজদ্দৌলাকে।

কোথাও সেদিন বিউগল বাজেনি। প্রাচীন কামানবাহী শকটে করে লাশ নিয়ে হয়নি শোকমিছিল। হয়নি ৩১ বার তোপধ্বনি। অতি সাধারণভাবে লোকচক্ষুর আড়ালে একজন মানুষ জৈন-উল-আবেদীন মাটি দিয়ে ঢেকে দিলেন সিরাজের লাশ।

খোশবাগ বাংলার ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডীকে বুকে নিয়ে সেই থেকে নীরব নিথর নিস্তব্ধ হয়ে রয়েছে। এই মৌনতা ভাঙ্গে সাধ্য কার? আমরা মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম সিরাজের কবরের পাশে।

যেখানে ছিলো গোলাপের বাগান সেখানে এখন জঙ্গল। সাপের আখড়া

খোশবাগ ছিলো আলীবর্দী খানের স্বপ্নের উদ্যান, আনন্দ উদ্যান। ছিলো গোলাপের বাগান। এখন সে সব কিছু নেই। পুরো বাউন্ডারীধারী ৯ একর এলাকাই এখন জঙ্গল। যেখানে ছিলো গোলাপের গাছ, সেখানে এখন গড়িয়েছে আগাছা, পরগাছা। লাগানো হয়েছে আকাশমনি, শিরিষ আর মেহগনি। কেবল প্রধান ফটক থেকে কবরস্থানে যাওয়ার পথটুকু ছাড়া সর্বত্র জঙ্গল। হিংস্র শ্বাপদের আখড়া। দিনের আলোয় ঘুরে বেড়ায় সাপ।

কাঠুরেদের পাশে শেষ স্বাধীন নবাব

প্রধান ফটক পেরিয়ে, জেনানা কবরগাহ ছাড়িয়ে, আমরা যখন মূল সমাধি ভবনে উঠতে যাব, তখন ডানে-বাঁয়ে তাকিয়ে দেখি কুঠার দিয়ে, করাত দিয়ে, বড় বড় গাছ কাটছে একদল লোক। সেই কুঠারের শব্দ চৌচির করে দিচ্ছে চারদিকের সৌম্যশান্ত প্রকৃতিকে। দেখি কয়েকটি গরুর গাড়ি। এইসব গাছ নিয়ে যাওয়ার জন্য। কাঠুরেদের

www.pathagar.com

কেউ কেউ মূল সমাধি ভবনের বারান্দায় বসে হাঁটুর ওপর লুঙ্গি তুলে বিড়ি টানছে। আমাদের দিকে ফিরেও তাকালো না। আমরা তাদের কাউকে কাউকে কাছে ডাকলাম। এলো না।

আলীবর্দী মসজিদ

আমরা সমাধি ভবনের পশ্চিমের চত্বরের সামনে মসজিদ দেখতে এগুলাম। আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া এই মসজিদটিকে অধিগ্রহণ করে ১৯১৫ সালে। তারা এটাকে আলীবর্দীর মসজিদ বলেন। ১৯১৫ সালের পর থেকে এ মসজিদের কোনরকম সংস্কার করা হয়নি। করা হয়নি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। মসজিদের দেয়ালে, ঘরের মেঝেতে ময়লা আর আগাছার স্তূপ। তিনটি দরোজা ছিলো নবাবী আমলের। সেগুলো নেই। সস্তা লোহার জাল এখন কপাটের জায়গায়। স্থানে স্থানে ফাটল ধরেছে স্থাপত্যে।

এই মসজিদের দেখাশুনা করার জন্য কিংবা আযান দেওয়ার জন্য কোনো মুয়াজ্জন নেই। নেই কোন ইমাম। এখানে নামাজ পড়া বন্ধ কত দিন থেকে কেউ বলতে পারে না। মসজিদের সামনেই বিরাট অজুর তালাব। সে তালাবে বোধ করি একটা ফোয়ারাও ছিলো। এখন কিছু নেই। তালাব পানিশূন্য।

সমাধি ভবন দেখছেন যারা

আমাদের গাইড আলাউদ্দিনকে বললাম, "আলাউদ্দীন এই খোশবাগ দেখাশুনা করে যারা, তাদের সাথে কথা বলতে চাই।"

আলাউদ্দিন বললো, "তাদের কাউকে তো দেখছি না।"

আমরা অপেক্ষা করছি। বেলা তখন চারটা-সাড়ে চারটার মতো। আকাশে মেঘ। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। সমাধি ভবনের ওপর, জঙ্গলাকীর্ণ খোশবাগের ওপর, কাঠুরেদের ওপর, প্রাচীন নিস্তব্ধতার ওপর ঝরছে বৃষ্টি। আমরা বারান্দায় বসে থাকি। আমাদের পাশে এসে বসে আরও দু'একজন লোক। আমি একসময় উঠে সমাধি ভবনের দৈর্ঘ্য প্রস্থ মাপতে শুরু করি। ভাবলাম, লেখার কাজে লাগবে। হা হা করে উঠে এলো মোটাগাবদা মতো একজন, না, না, মাপবেন না।

বললাম কেন

বললো, 'এটা সরকারের নিষেধ আছে।'

বললাম, সমস্ত মুর্শিদাবাদের প্রতিটি প্রান্ত দেখলাম, ঘুরলাম, ছবি নিলাম, কোথাও কোন নিষেধ পেলাম না। এখন এই বাড়ির দৈর্ঘ্য মাপতে নিষেধ করছেন আপনি!'

বললো, হ্যাঁ। এটার মাপ নিতে হলে দিল্লীর পারমিশন লাগবে!'

বললাম, 'ঠিক আছে, কিন্তু আপনি কে?'

বললো, আমরা এই এলাকা দেখাশুনা করি।'

-কিন্তু এতোক্ষণ তো আপনাদের খুঁজলাম, পরিচয় দিলেন না কেন?

-দেয়ার প্রয়োজন পড়েনি তাই দেইনি।

বললাম, 'তিনজন, হাবুল শেখ, মহাদেব মণ্ডল আর বজলার শেখ।'

বললাম, 'খুব খুশি হলাম আপনাদের সাথে পরিচিত হয়ে। তা আপনারা কি সরকারী কর্মচারী?

www.pathagar.com

মহাদেব মণ্ডল বললেন, 'জ্বী'

বললাম, 'আপনাদের কাজ কি এই খোশবাগ দেখাশুনা করা?

বললো, জ্বী

বললাম, তা ভাই, এই যে বিরাট বিরাট গাছগুলো কেটে নিচ্ছে এরা কারা?'

-'এরা ব্লক ডিপার্টমেন্টাল অফিসের লোক।'

-'এরা গাছ কাটছে কেন?'

-গাছগুলো তা ওদের।'

-এই সমাধি এলাকার তত্ত্বাবধায়ক আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া। তাদের কর্মচারী আপনারা। আর গাছের মালিক ব্লক ডিপার্টমেন্ট?'

মহাদেব মণ্ডল আর হাবুল শেখ এবার কিছুটা রেগে যায়। বলে, দেখুন আর্কিওলজিকাল সার্ভে শুধু এই কবর, সমাধি ভবন ও মসজিদটির মালিক। জমিগুলো ব্লক ডিপার্টমেন্টের। বাউন্ডারীর ভিতরের সব জমি ও গাছ ব্লক ডিপার্টমেন্টের।'

বললাম, সে কি কথা, এই খোশবাগ তো সংরক্ষিত এলাকা। এটার মালিক ব্লক বিভাগ কি করে হয়?'

মহাদেব মণ্ডল বললো, কি করে হয় জানি না। তবে হয়।'

কথা বলার মাঝখানে আমি আবার মাপ নেয়ার অনুমতি চাইলাম।

হাবুল শেখ বললো, আপনাকে তো মানা করেছি।

বললাম, কিন্তু আপনার যুক্তি তো খুব দুর্বল। এতো কিছু থাকতে ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কেবল এই ভবনের আয়তন নিতে দেবে না। এটা একটা হাস্যকর যুক্তি মনে হচ্ছে আমার।

হাবুল শেখের সঙ্গে আমাদের গাইড আলাউদ্দীনও এবার তর্ক শুরু করে দেয়। কিন্তু হাবুল ও মহাদেব অটল।

এর মধ্যে একজন কাঠুরেকে দেখি, বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের সমাধি ভবনের গায়ে সজোরে ঠুকে ঠুকে কুঠারের হাতল লাগাচ্ছে।

মহাদেব আর হাবুল মিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম সেদিকে।

রেগে যায় দু'জন, কেন কি হয়েছে তাতে?

বললাম, 'এটা স্থাপত্য বিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। আর আপনারা এই স্থাপত্যের কেয়ার-টেকার, কিচ্ছুই বলছেন না?'

-কি বললো?

-কাজটিতে বাধা দেবেন।

-আপনার কথায় তো হবে না।

-বললাম, 'তা বটে।'

কথা ঘুরিয়ে নেই। ভিন্ন প্রসঙ্গে। বললাম, 'আপনারা তিনজন কেয়ার-টেকার। আর সমাধি ভবনের সর্বত্র এমন জঙ্গল কেন? আর কয়দিন পর তো এই বাউন্ডারীর ভিতরে প্রবেশই করা যাবে না।'

বজলার শেখ বললো, 'গাছপালা ময়লা জঙ্গল সব কিছু ব্লক ডিপার্টমেন্টের। আমরা

www.pathagar.com

কি করবো?'

মহাদেব মণ্ডল বললো, 'আমাদের কোন অধিকার নেই ঝাড় জঙ্গল সাফ করার।'

-জঙ্গলের কথা বাদ দিলাম। কিন্তু মসজিদ ও সমাধি ভবনও তো ভগ্নপ্রায়। এগুলো ঠিক করুন।

মহাদেব বললেন, 'কিভাবে ঠিক করবো। আমরা কি এখানে থাকি নাকি?'

বললাম, 'এখানে থাকেন না কেন?'

মহাদেব মণ্ডল এক পাহাড় বিরক্তি নিয়ে বললো, 'বড্ড সাফ খোপ মশাই। তাছাড়া বাতির কোন ব্যবস্থা নেই। এ জায়গা বিকেলেই অন্ধকার হয়ে যায়।'

-বাতি নেই কেন? কাছেই তো বিদ্যুৎ?

কথা বললো বজলার শেখ, 'বিদ্যুৎ থাকলেই তো হবে না। এর জন্য দিল্লীর পারমিশন চাই।'

-তা পারমিশনের জন্য কখনো লিখেছেন?

-আমাদের অফিসিয়াল গোপন কথা আপনাকে বলবো কেন?

-ঠিক আছে, কিন্তু স্থাপত্যের গায়ে রাজনৈতিক দলের স্লোগান দেখলাম। এটা তো বন্ধ করতে পারতেন?

-আমাদের কি অতো ক্ষমতা আছে নাকি?

একজন নরেন রায়

অন্যান্যদের সাথে কথা বলতে বলতে বৃষ্টিতে কিছুটা ভিজে বারান্দায় উঠে এলেন নরেন রায়। খোশবাগের মালি। একমাত্র নরেন বললো, সে ব্লক ডিপার্টমেন্টের স্টাফ। মাইনে পায় মাসিক ১১ টাকা সংসার চলে গাইডগিরি করে। নরেন বাংলাদেশের সাবেক টিভি উপস্থাপক রেজাউর রহমানকে চেনে।

বললো, 'উনি এখানে এসে ঘুরানো ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলে নিয়েছিলেন বাবু।'

নরেনের কাছ থেকে জানা গেল শীতকালে প্রতিদিন গড়ে ১০০ জন, অন্যান্য সময় ১০/১২ জন পর্যটক বেড়াতে আসে এই খোশবাগে। নরেন মালির দায়িত্বে এখানে আছে প্রায় ১২ বছর ধরে।

নরেনকে বললাম, 'এখানে রাতে কেউ থাকে না?'

নরেন বললো, না। বিকেলের মধ্যে সবাই চলে যায়। পরদিন ৯/১০ টার সময় সবাই আসে।'

বললাম, বাংলাদেশে আমরা শুনেছি আপনি নাকি প্রতিদিন সকালে সিরাজের কবরে ফুল দেন।

নরেন বললো, সে কি মশাই। ফুল দেবো যে, পাব কোথায়? দেখছেন না সব জঙ্গল।'

বললাম, 'আপনি তো মালি, সাফ করতে পারেন না?'

জবাবে নরেন হো হো করে হাসলো।

সেই একজন

নরেনের কাছে জানতে চেয়েছিলাম বিশেষ কোন অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতার ঝুলি

www.pathagar.com

হাতড়ে নরেন বললো, "একজন মানুষের কথা বলতে পারি। প্রতি বছর ২ জুলাই আসেন। ৩ জুলাই সারাদিন নবাব সিরাজদ্দৌলার কবরের পাশে বসে কোরান পড়েন। নামাজ পড়েন। ৪ তারিখ সকালে তিনি চলে যান। ভদ্রলোক কারো সাথে তেমন কথা বলেন না। কিছু চান না। খাবার, পানি, বাতি সব সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। বয়স্ক এই মানুষটিকে ১২ বছর ধরে দেখছি আমি। কোত্থেকে যে আসেন কেউ জানে না।"

মিলিত পুণ্যভূমি

সরকারী উদাসীনতা কিংবা কর্তৃপক্ষীয় অবজ্ঞা যতো প্রখরই হোক। এই খোশবাগ সমাধি ভবন আজও বাংলার সাধারণ হিন্দু-মুসলমানের পুণ্যভূমি। দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ ছুটে আসেন এই সমাধিস্থলে। প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আলীবর্দী আর নবাব সিরাজদ্দৌলার কবরে মোমবাতি জ্বালিয়ে দেন দূরের গ্রামের লোকেরা। অশিক্ষিত ধর্মপ্রাণ হিন্দু-মুসলমানের চোখে নবাব আলীবর্দী খান আজ দরবেশ। তারা মানত করে এই মাজারে। দুধ, চিনি, পায়েস, গোস্ত নিয়ে আসে তারা। তারপর হাউমাউ করে কাঁদে। নিজের আবেদন জানায় স্রষ্টার কাছে।

সিরাজের কবরের উপর মরে পড়ে ছিলেন লুৎফা

নবাব সিরাজদ্দৌলার জীবনাবসান ঘটিয়েও সুস্থির হতে পারলেন না ষড়যন্ত্রকারীরা। বিশেষ করে ক্লাইভ চাইলেন সিরাজের বংশের সকলকে হত্যা করতে। তার ভয় ছিলো, এ না হলে একদিন প্রতিশোধ নেয়ার জন্য উঠে দাঁড়াবে এরা। সেদিন ইংরেজ বণিকদের পুনরায় পড়তে হবে পাততাড়ি গোটানোর হুমকির মুকে। না, কোন ঝুঁকি নেয়া চলবে না। অবশ্য ইংরেজ ঐতিহাসিকরা ক্লাইভের নিষ্কলংক চরিত্র নির্মাণে সর্বদা থেকেছেন গলদঘর্ম। ফলে দোষ যা কিছু ছিলো বর্তেছে তা গর্ধভ মীরজাফরের ঘাড়ে। তবে একথা ঠিক ক্লাইভের প্ররোচনায় সর্বদা উদ্দীশপ্ত হতো মিরন। জগৎশেঠ ও ক্লাইভ অনেক জটিল কাজ এই অপরিণামদর্শী কুটিল চরিত্রের যুবককে দিয়ে করিয়েছে।

উদ্দীশপ্ত মিরনের আদেশে বেগম শরফুন্নেসা আমিনা বেগম, লুৎফুন্নিসা এবং একদার ষড়যন্ত্রকারিণী ঘসেটি বেগমকে প্রেরণ করা হলো ঢাকার জিঞ্জিরা প্রাসাদে। ঢাকার নায়েবে নাজিম জসরত খান থাকলেন তার প্রহরায়। ইতিমধ্যে মিরনের মাথায় চাপলো নতুন ভূত, তিনি লুৎফুন্নিসা বেগমকে বিয়ে করার প্রস্তাব পাঠালেন। পতিপরায়ণা লোকার্ত লুৎফা জবাব দিলেন এই বলে, "যে নারী চিরকাল হাতির পিঠে চড়ে অভ্যস্ত তার কি কখনো গাধার পিঠে চড়তে ইচ্ছে করে?"- জবাব শুনে দপ করে জ্বলে উঠলেন মিরন। জসরত খানকে নির্দেশ পাঠালেন, সবাইকে হত্যা কর। জসরত খান চাইলেন নবাবের নির্দেশ। নবাব মিরজাফর বললেন, সবাইকে মুর্শিদাবাদ পাঠাও। পথিমধ্যে বুড়িগঙ্গায় নৌকা ডুবিয়ে হত্যা করা হলো ঘসেটি বেগম ও আমিনা বেগমকে। পরে তাদের লাশ বোধ করি খোশবাগে নিয়ে আসা হয়। শরফুন্নেসা বেগম সম্পর্কে ইতিহাস নীরব। বাকি রইলেন সিরাজ ভ্রাতা মিরজা মেহেদী আর লুৎফুন্নিসা এবং সিরাজকন্যা উম্মে জোহরা।

মিরজা মেহেদী

সিরাজদ্দৌলার মৃত্যুর সময় তার ভ্রাতা মিরজা মেহেদীর বয়স ছিলো মাত্র পনর বছর। মিরন তাকে পাথর চাপা দিয়ে আটকে রেখেছিলো জাফরাগঞ্জ প্রাসাদে। এই নিরপরাধ তরুণ ছিলেন অত্যন্ত সুদর্শন ও সিরাজের স্নেহধন্য।

www.pathagar.com

কোন কোন ইতিহাসকার লিখেছেন, মিরজা মেহেদীকে কারাগার থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন রায়দুর্লভ। তাতে নাকি মিরজাফর সন্দিগ্ধ হয়ে পড়ে মিরনকে আদেশ দেন মেহেদীকে হত্যার। এ তথ্য সঠিক না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ রায়দুর্লভের মধ্যে সিরাজ পরিবারের প্রতি কোন দুর্বলতা থাকতে পারে এ অবিশ্বাস্য। যা হোক ভবিষ্যতের প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যার উদ্যোগ নিলেন মিরন। অত্যন্ত নিষ্ঠুর এক পথ তিনি বেছে নিলেন এ ক্ষেত্রে। মিরজা মেহেদীর দুই পাশে দুইটি তক্তা বেঁধে, তারপর তাকে দুই পাশ থেকে প্রচণ্ড চাপ দিয়ে দিয়ে, নৃশংসভাবে প্রাণ সংহার করা হলো। এই নির্মম ঘটনায় নাকি মুর্শিদাবাদে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিলো।

মিরজা মেহেদীর থেতলানো লাশ এনে কবর দেয়া হলো সিরাজের কবরের পাশে। আমরা সেখানে দাঁড়িয়ে হতভাগ্য তরুণের জন্য মাগফেরাত কামনা করলাম।

বেগম লুৎফুন্নিসা

নবাব সিরাজদ্দৌলার কবরের দক্ষিণে পায়ের কাছে চিরকালের ঘুমে শায়িতা তার প্রিয়তমা মহিষী লুৎফুন্নিসা। সিরাজ তার তাপদগ্ধ হৃদয়ে সামান্য যেটুকু শান্তি লাভ করেছিলেন তা এই মহিয়সী রমণীর কাছে। সিরাজের সকল আনন্দে, সকল সংকটে এই রমণী ছায়ার মতো অনুসরণ করেছেন সকল সময়। পলাশী থেকে বিপন্ন-বিপদগ্রস্ত নবাব যখন ছুটে এসেছেন মুর্শিদাবাদে, সকল সাহায্যের হাত যখন তার জন্য বন্ধ, কিংকর্তব্যবিমূঢ় নিঃসঙ্গ নবাবের সেই বেদনাবিধুর সময়ে নির্দ্বিধায় সঙ্গী হয়েছেন বেগম লুৎফুন্নিসা। স্বামীর মৃত্যুর পর তার জীবনে নেমে এসেছে বর্বরোচিত নির্যাতন, এসেছে রঙিন হাতছানি। কিন্তু বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের এই সুযোগ্যা স্ত্রী অবলীলায় বেছে নিয়েছেন কষ্টের জীবন। আত্মসমর্পণ করেননি মিরনের বাহুপাশে। চার বছরের শিশুকন্যা উম্মে জোহরাকে নিয়ে তিনি বেছে নিয়েছেন ঢাকার লাঞ্ছিত-অপমানিত কারাজীবন।

তারপর শুধু একটাই আর্জি ছিলো তার। জীবনের বাকি দিনগুলি শুধু স্বামীর কবরের পাশে কাটাতে চাই। আর কিছু নয়। প্রার্থনার জবাব আসে না। স্বামীর কবর দর্শনের জন্য কাতর মহিলার অশ্রু আর অনুনয় ফাইলবন্দী রইলো অনেক বছর। তারপর অনুমতি মেলে। শোনা যায় সেও না কি ইংরেজদের জন্যে।

সিরাজের মৃত্যুর আট বছর পর প্রিয়তম স্বামীর সমাধিস্থলে বসবাসের অনুমতি পেলেন লুৎফা। সেই যে এলেন আর ফিরে যাননি খোশবাগ থেকে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত স্বামীর কবরের পাশেই পড়ে থেকেছেন প্রতিমূহূর্ত।

তাকে ছেড়ে একে একে সবাই চলে গেছেন পরপারে। চারিদিকে শত্রুর দাঁত ঘষ্টানির শব্দ, "সেই সময়ে তাঁর শোচনীয় অবস্থার কথা স্মরণ করিলে পাষাণও বিগলিত হয়। তাঁহার প্রিয়তম স্বামী ধরণীগর্ভে শায়িত; অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনও একে একে অনন্ত পথে যাত্রা করিয়াছেন; এই বিশাল বিশ্বে তিনি একাকিনী-একটি মাত্র বালিকা কন্যা অবলম্বন! এইরূপ অবস্থাতেও তিনি প্রতিদিন গিয়া স্বামীর সমাধি-বন্দনা করিতে বিস্মৃত হন নাই। স্বর্ণ-রৌপ্য নয় পুষ্পখচিত কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র দ্বারা সে সমাধি আচ্ছাদিত ছিলো; তিনি তথায় প্রতিনিয়ত দীপ প্রজ্বলিত করিয়া দিতেন এবং উদ্যানের সুগন্ধী কুসুম চয়ন করিয়া সেই অশ্রুজলসিক্ত কুসুমরাশি প্রিয়পতির সমাধির উপর ছড়াইয়া

www.pathagar.com

দিতেন। সে সময়ে বক্ষস্থলে করাঘাত করিতে করিতে তিনি ভূ-তল শায়িনী হইয়া পড়িতেন।"

[মুর্শিদাবাদ কাহিনী]

১৭৮২ খৃষ্টাব্দে ফার্স্টার নামে জনৈক ইংরেজ খোশবাগে লুৎফুন্নিসাকে সিরাজের জন্য শোক প্রকাশ করতে দেখেছিলেন। এভাবেই একদিন লুৎফুন্নিসাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল স্বামীর কবরের উপর।

লুৎফন্নিসার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে সেই স্মৃতি, সেই বেদনাবিদ্ধ দিনের কথা একে একে মনে পড়ছিলো। আর অবাক হচ্ছিলাম, এরকম সমাধিময় নির্জন, নিস্তব্ধ, খোশবাগে কিভাবে একটি শিশু কন্যাকে নিয়ে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর থেকেছেন লুৎফা! ১৭৬৫ সাল থেকে ১৭৮৬ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ২১ বছর কিভাবে কাটিয়েছেন এই স্থানে! প্রথম দিকে তো সামান্য খাবারের সংস্থানও ছিলো না। দিনের পর দিন চলছে অনাহার-অর্ধাহারে। পরে অবশ্য সামান্য ভাতার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলো জাহাঙ্গীরনগর কোষাগার।

লুৎফুন্নিসার কবরটিও অন্যান্য কবরের মত সাদামাটা। নিরাভরণ একটি কবরে শুয়ে আছেন তিনি। প্রায় বেশিরভাগ পর্যটককেই দেখলাম কবরটির কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়াতে।

পেছনে ফেলে আসি

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে খোশবাগে। প্রাচীন স্থাপত্যের গায়ে, জঙ্গলে, ধীরে ধীরে নেমে আসে আরো অনেক বেশি প্রাচীন সন্ধ্যা। কিন্তু বৃষ্টি থামে না। আমরা ঘনায়মান সন্ধ্যায় বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের সমাধি সংলগ্ন বারান্দায় বসে থাকি।

তাড়া দেন গাইড, 'আপনাদের নৌকা ঘাটে। তাড়াতাড়ি এখনই রওয়ানা হন। নইলে মাঝি চলে যাবে। বিপাকে পড়বেন।'

অগত্যা উঠে দাঁড়াতে হয়। গুঁড়ি ঘুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যেই সুড়কির পথে নামি। সমাধি ভবনের সামনে কাঠুরের তখন গাছ কাটছে। গাছ কাটার শব্দ অনুরণিত দূর-দূরান্তে। সমাধি ভবন চত্বর পেছনে রেখে জেনানা কবরস্থান পার হই। তারপর প্রবেশ তোরণে পৌঁছি।

তোরণ পেরিয়ে পথ। তারপর কর্দমাক্ত পিচ্ছিল মেঠোপথ। প্রায় অর্ধ মাইল ভাগিরথীর ঘাট। ঘাটে পৌঁছি ভিজে ভিজে। পেছনে তাকিয়ে কিছুই দেখি না। কেবল বৃষ্টি, ঘোলা কাঁচের মতো। ওপারে দূরে মুর্শিদাবাদ, হাজার দুয়ারী গর্বিত প্যালেস ঝলমল করছে আলোতে। এপারে অন্ধকারে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের সমাধিভূমি চমৎকার। খোশবাগ থেকে নৌকা ছাড়ে আমাদের। বিচ্ছিন্ন হয় সংযোগ। কিন্তু অন্তরে বাজে সিরাজের প্রিয় নাম।

www.pathagar.com

পলাশী ষড়যন্ত্রকারীদের পরিণাম

পলাশী ষড়যন্ত্রের যারা নেতৃত্ব দিয়েছিল; পরবর্তীকালে তাদের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ হয়েছিল। প্রায় সকলেরই মৃত্যু হয়েছিল মর্মান্তিকভাবে। কাউকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে, কেউ দীর্ঘদিন কুষ্ঠ রোগে ভুগে মারা গেছে, কাউকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মারা হয়েছে, কাউকে নদীতে ডুবিয়ে মারা হয়েছে, কেউ নিজের গলায় নিজেই ছুরি বসিয়েছে। অস্বাভাবিক পন্থায় এবং অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে আলিঙ্গন করতে হয়েছে তাদের মৃত্যুকে। তাদের সকলের ওপরেই পড়েছিল আল্লাহর লানত। আল্লাহর কঠিন শাস্তি থেকে তাদেরকে কেউ উদ্ধার করতে পারেনি। শুধু তা-ই নয়, মৃত্যুর পরেও এই উপমহাদেশের সকল মানুষ তথা বিশ্ববাসী যুগ যুগ তথা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাদের এই অপকর্মের প্রতি তীব্র নিন্দাবাদ প্রদান করে আসছে। আমরা নিম্নে এ সব ষড়যন্ত্রকারীরা কে কিভাবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন তা উল্লেখ করলাম।

মিরন

মিরন পলাশী ষড়যন্ত্রের প্রধানতম নায়ক ছিলেন। তার পুরো নাম মীর মহম্মদ সাদেক আলি খান। তিনি মীরজাফরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। আলিবর্দী খানের ভগ্নী শাহ খানম-এর গর্ভে তাঁর জন্ম হয়েছিল। এই সূত্রে মিরন ছিলেন আলিবর্দীর বোনপো। মিরন যে অত্যন্ত দুর্বৃত্ত, নৃশংস ও হীনচেতা ছিলো সে ব্যাপারে কারো কোন সন্দেহ নেই। সিরাজ হত্যাকাণ্ডের মূল নায়ক মিরন। আমিনা বেগম, ঘষেটি বেগম হত্যার নায়কও তিনি। লুৎফুন্নিসার লঞ্ছনার কারণও মিরন। মিরজা মেহেদীকেও নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিলেন মিরন। মীরজাফরের সকল অপকর্মের হোতা ছিলেন তিনি । মিরনের প্ররোচনাতেই মীরজাফর চলতেন।

www.pathagar.com

এই মিরনকে হত্যা করে ইংরেজদের নির্দেশে মেজর ওয়ালস। তবে তার এই মৃত্যু ঘটনাটি ধামাচাপা দেয়ার জন্যে ইংরেজরা মিথ্যা গল্প বানিয়েছিল। তারা বলেছে, মিরন বিহারে শাহজাদা আলি গওহারের (পরে বাদশাহ শাহ আলম) সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে পথের মধ্যে বজ্রাঘাতে নিহত হন। ইংরেজদের অর্থপুষ্ট মুতাক্ষরীনকার লিখেছেন, মিরনের আদেশে সিরাজের মাতা আমিনা ও মাতৃস্বসা ঘষেটি বেগম জলমগ্ন হওয়ায়, তাঁরা মৃত্যুকালে মিরনকে বজ্রাঘাতে প্রাণপরিত্যাগের জন্য অভিশম্পাত করিয়া যান। এই জন্য অনুমান করা হয় যে, মিরনের বজ্রাঘাতেই মৃত্যু হইয়াছিল।' ইংরেজরা বলেছে, বজ্রপাতের ফলে তাঁবুতে আগুন ধরে যায় এবং তাতেই তিনি নিহত হন। ফরাসী সেনাপতি লরিস্টনের Jean-Law ঘটনাকে অস্বীকার করেছেন। বরং এই মত পোষণ করেন যে, মিরনকে আততায়ীর দ্বারা হত্যা করা হয়েছিল। প্রচণ্ড ঝড় আর ঘন ঘন বজ্রপাতের সময় তার তাঁবুতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় এবং তাকে হত্যা করা হয়। এটা আর কিছুই নয় আসলে ঘটনাকে চাপা দেওয়ার একটা কৌশল মাত্র।' - (অক্সফোর্ড হিস্ট্রি অফ্ ইন্ডিয়া, ভিনসেন্ট এ, স্মিথ।)

নিখিলনাথ রায় তার 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, মিরনের মনে স্বাধীনতার ইচ্ছা বলবর্তী হওয়ার পুণ্যশ্লোক ব্রিটিশপুঙ্গবগণ মীর কাসেমের সাহায্যে তাঁহাকে না-কি কৌশল পূর্বক নিহত করিয়াছিলেন। পরে বজ্রাঘাতে মৃত্যু বলিয়া প্রকাশ করা হয়।'

ভিনসেন্ট এ, স্মিথ তার অক্সফোর্ড হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া ও Meadows Taylor তাঁর A students Manual of the History of India গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে পরিষ্কার বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে। তারা বলেছেন যে, মিরনের মৃত্যুর জন্য ইংরেজ এবং মীর কাসিম উভয়কেই সন্দেহ করা হয়। আসলেই মিরনকে হত্যা করা হয়েছিলো। মেজর ওয়ালস্ ছিলেন এই হত্যাকাণ্ডের নায়ক। মীরজাফর ইংরেজদের সাজানো গল্পটি বিশ্বাস করেননি। তিনি জানতেন, মিরনকে ইংরেজরা হত্যা করেছে। কিন্তু কাপুরুষ মীরজাফরের কাঁদা ছাড়া আর কিছু করার ছিলো না। এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে তিনি জানতেন তার নিজের নবাবী ও জীবনটাও চলে যেতে পারে।

মুহাম্মদী বেগ

মুহাম্মদী বেগম তজুলাই বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। নবাব সিরাজ এ সময় তার কাছে প্রাণ ভিক্ষা চান না। তিনি কেবল তার কাছ থেকে দু'রাকাত নামাজ পড়ার অনুমতি চেয়েছিলেন। কিন্তু কুখ্যাত মুহাম্মদী বেগ নবাব সিরাজকে সে সুযোগ প্রত্যাখ্যান করার পরপরই তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

পরবর্তী পর্যায়ে মুহাম্মদী বেগ মাথা গড়বড় অবস্থায় বিনা কারণে কূপে ঝাঁপিয়ে পড়ে মৃত্যুবরণ করেছিল। এই মুহাম্মদী বেগ সিরাজউদ্দৌলার পিতা ও মাতামহীর অন্নে প্রতিপালিত হয়। আলীবর্দীর বেগম একটি অনাথ কুমারীর সাথে তার বিয়ে দিয়েছিলেন।

মীরজাফর

পলাশী ষড়যন্ত্রের অন্যতম প্রধান নায়ক ছিলেন মীরজাফর আলি খান। তিনি পবিত্র কোরআন মাথায় রেখে নবাব সিরাজের সামনে তাঁর পাশে থাকবেন বলে

www.pathagar.com

অঙ্গীকার করার পর পরই বেঈমানী করেছিলেন। তিনি ছিলেন সকল ষড়যন্ত্রের মূলে।

মীরজাফর অত্যন্ত হীনাবস্থায় প্রথমত আলীবর্দী খাঁর সংসারে প্রতিপালিত হন। আলীবর্দী খান তাকে অত্যন্ত কাছে টেনে নিয়েছিলেন। পরে নবাব নিজে বৈমাত্রের ভাগিনী শাহ খানমের সাথে মীরজাফরের বিয়ে দেন। নবাব তার কার্যদক্ষতায় সন্তুষ্ট হয়ে তাকে সেনাপতি পদ প্রদান করেন। নিখিলনাথ রায় লিখেছেন, 'মীরজাফর মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধের সময়ে অসামান্য বীর্যবত্তা দেখাইয়া আপনার সুনাম প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু আলীবর্দীর ভ্রাতৃজামাতা আতাউল্লা খাঁর সহিত পরামর্শ করিয়া বঙ্গরাজ্য বিভাগ করিয়া লইবার ইচ্ছা করায়, আলীবর্দী খাঁর অনুরোধে তাঁহাকে পুনর্বার সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহার পর সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের নেতা হইয়া মীরজাফর ইংরেজদিগের সহিত যোগদান পূর্বক সিরাজের সর্বনাশ সাধনের পর মুর্শিদাবাদের মসনদে উপবিষ্ট হন।' মীরজাফর সম্পর্কে অনেকে বলেছেন, 'আর বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর? সর্বস্বীকৃতভাবে তিনি ছিলেন পুরোপুরিভাবেই একজন বিশ্বাসঘাতক। সকল দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি ছিলেন একজন মহাবোকা, রাজনীতি জ্ঞানবিহীন একজন সেনাপতিমাত্র।'

মীরজাফরের মৃত্যু হয় অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে। তিনি দুরারোগ্য কুষ্ঠব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। নিখিলনাথ রায় লিখেছেন, 'ক্রমে অন্তিম সময় উপস্থিত হইলে, হিজরী ১১৭৮ অব্দের ১৪ই শাবান (১৭৬৫ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে) বৃহস্পতিবার তিনি কুষ্ঠরোগে ৭৪ বৎসর বয়সে পরলোকগত হন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে নন্দকুমার কিরীটেশ্বরীর চরণামৃত আনাইয়া তাহার মুখে প্রদান করাইয়াছিলেন এবং তাহার তাহাই শেষ জলপান।'

জগৎশেঠ মহাতপচাঁদ এবং মহারাজা স্বরূপচাঁদ

পলাশী ষড়যন্ত্রের পিছনে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছিল জগৎশেঠ পরিবার, প্রথমত তারা ইংরেজদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং পরে মীরজাফর ও অন্যদের এতে যুক্ত করেন।

জগৎশেঠদের পূর্বপুরুষ মানিকচাঁদের সাথে মুর্শিদকুলী খাঁর বংশে ভালো সম্পর্ক ছিল। মানিকচাঁদের ১৭১৫ সালে বাদশাহ ফরখ শেরের কাছ থেকে শেঠ উপাধি লাভ করেন। ১৭২২ সালে মানিকচাঁদ পরলোকগমন করেন। তিনি অপুত্রদকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। ১৭৪৪ সালে ফতেচাঁদের মৃত্যু হয়। আনন্দচাঁদ, দয়াচাঁদ, মায়াচাঁদ নামে তিন ছেলে ছিল। পিতার জীবদ্দশাতেই আনন্দচাঁদ ও দয়াচাঁদের মৃত্যু ঘটে। তখন আনন্দচাঁদের পুত্র স্বরূপচাঁদ শেঠ পরিবারের উত্তরাধিকারী মনোনীত হন। নিখিলনাথ রায় লিখেছেন, 'বাদশাহের নিকট হইতে মহাতপচাঁদ জগৎশেঠ' ও স্বরূপচাঁদ 'মহারাজ' উপাধি লাভ করেন। এই সময়ে শেঠদিগের গদীতে অনবরত ১০ কোটি টাকার কারবার চলিত। জমিদার মহাজন ও অন্যান্য ব্যবসায়ী সকলেই অর্থের জন্য শেঠদিগের নিকট উপস্থিত হইতেন। ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতি বৈদেশিক বণিকগণ তাঁহাদের নিকট হইতে টাকা কর্জ লইতেন। ফতেচাঁদের মৃত্যুর পর নবাব আলীবর্দী খাঁ জগৎশেঠ মহাতপচাঁদকে যথেষ্ট সম্মান করতেন এবং ফতেচাঁদের ন্যায় তাঁহারও পরামর্শ গ্রহণ করিতে ত্রুটি করিতেন না।'

www.pathagar.com

আলীবর্দী খাঁর শাসনামলেই জগৎশেঠের সাথে ইংরেজদের সম্পর্ক অতি গভীর ছিল। নবাব সিরাজ ক্ষমতায় এলে এই গভীরতা আরো বৃদ্ধি পেলো এবং তা ষড়যন্ত্রে রূপ নিলো। পলাশী বিপর্যয়ের পর জগৎশেঠ রাজকোষ লুণ্ঠনে অংশ নেন।

১৭৬০ সালে মীরজাফর সিংহাসনচ্যুত হলে তাঁর জামাতা কাসেম আলি খাঁ (মীর কাসেম) ক্ষমতায় বসেন। এ সময় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ইংরেজদের সাথে তার বিরোধ বাধে। জগৎশেঠ ইংরেজদের পক্ষ অবলম্বন করেন এবং তিনি ইংরেজ ও মীরজাফরের কাছে মীর কাসেমের বিরুদ্ধে কয়েকটি পত্র প্রদান করেন। পত্রগুলো কৌশলে মীর কাসেমের হস্তগত হয়। এ জন্য মীর কাসেম জগৎশেঠ মহাতপচাঁদকে বন্দী করে মুঙ্গেলে পাঠাবার জন্যে বীরভূত্রের ফৌজদার মহম্মদ তকী খাঁর প্রতি আদেশ পাঠান। তকী খাঁ তাদেরকে হীরাঝিলের প্রাসাদে বন্দী করে রাখেন। পরে নবাবের সেনাপতি আর্মেনীয় মার্কার নবাবের আদেশে সসৈন্যে তাদেরকে নিয়ে উপস্থিত হলে তকী খাঁ তাদেরকে মার্কারের হস্তে সমর্পণ করেন। এ সময়ে মীর কাসেম মুঙ্গেলে ছিলেন। মার্কার তাদেরকে নিয়ে মুঙ্গেলে উপস্থিত হন। তাদেরকে সেখানে আটক রাখা হয়। ইংরেজ গভর্নর ২৪ এপ্রিল ১৭৬৩ নবাবকে লিখে পাঠালেন, 'আমি এই মাত্র আমিয়টের পত্রে অবগত হইলাম যে, মহম্মদ তকী খাঁ রজনীতে জগৎশেঠ ও স্বরূপচাঁদের বাটীতে প্রবেশ করিয়া, তাঁহাদিগকে বন্দী অবস্থায় হীরাঝিলে আনিয়ে রাখিয়াছে। এই ঘটনায় আমি অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইয়াছি। যখন আপনি শাসন কার্যের ভার গ্রহণ করেন, তখন আপনি, জগৎশেঠ ও আমি সমবেত হইয়া, এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলাম যে, শেঠেরা, বংশমর্যাদায় দেশের মধ্যে সর্বপ্রধান, অতএব শাসনকার্যের বন্দোবস্তে আপনাকে তাঁহাদিগের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে এবং তাঁহাদিগের কোনরূপ অনিষ্ট না করিতে আপনি স্বীকৃত হন। মুঙ্গেলে আপনার সহিত সাক্ষাৎকালে আমি শেঠদিগের কথা আপনাকে বলিয়াছিলাম এবং আপনিও তাঁহাদিগের কোন ক্ষতি করিবেন না বলিয়া আমাকে নিশ্চিত করেন। তাঁহাদিগের তৎপরোনাস্তি অবমাননা করা হইয়াছে। আপনার এ সুনামে কলঙ্ক পড়িয়াছে। ভূতপূর্ব কোন নাজিম তাঁহাদিগের এরূপ গৃহ হইতে আনয়ন করা অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে; ইহাতে তাহাদিগের প্রতি এরূপ ব্যবহার করেন নাই। সুতরাং আপনি সৈয়দ মহম্মদ খাঁ বাহাদুরকে (মুর্শিবাদের ফৌজদার) তাঁহাদিগের মুক্তির জন্য লিখিয়া পাঠাইবেন।'

মীর কাসেম ২ মে তার এক সুদীর্ঘ প্রত্যুত্তর লিখে পাঠান। তাতে তিনি লিখেন, 'শেঠেরা ইংরেজদিগের সহিত যোগ দিয়াছে বলিয়া আমি তাহাদিগকে আনিতে পাঠাই নাই।' যখন আমি শাসনভার গ্রহণ করি, তখন শেঠেরা আমায় সাহায্য করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হয়। কিন্তু তিন বৎসর তাহারা আমার কোনরূপ সাহায্য করে নাই এবং আপনাদিগের কারবারও সুন্দররূপে নির্বাহ করে নাই। আমি যখনই তাহাদিগের আহবান করিয়াছি, তখনই তাহারা আমার আদেশ অমান্য করিয়াছে এবং আমাকে তাহাদের শত্রু ও রাজ্য হইতে বিতাড়িত মনে করিয়াছে। এক্ষণে আমার কার্যনির্বাহের জন্য তাহাদিগের বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে বলিয়া, আমি তাহাদিগকে আহবান করিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় যে, আপনারা প্রতিদিন সিপাহী পাঠাইয়া আমার আমীন ও অন্যান্য কর্মচারীদিগকে ধৃত করিয়া অযথা অত্যাচারের সহিত তাহাদিগকে বন্দী করিয়া রাখিতেছেন। আপনাদের ঐরূপ ব্যবহারে সন্ধিভঙ্গ হয় না, অথচ আমার অধীন

www.pathagar.com

লোকদিগকে নিজের প্রয়োজনের জন্য আহবান করিলে, অমনি সন্দিভঙ্গ হইয়া যায়। আমি তাহাদিগকে সরকারের ও তাহাদের নিজের কার্যনির্বাহের জন্য মুঙ্গেলে আনয়ন করিয়াছি, তাহাদিগকে এখানে আনিবার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই।'

নিখিলনাথ রায় লিখেছেন "ইহার পর ক্রমে ইংরেজদিগের সহিত মীর কাসেমের বিবাদ গুরুতর হইয়া উঠিলে, নবাব কাটোয়া গিরিয়া, উধুয়ানালা প্রভৃতি স্থানে পরাজিত হইয়া মুঙ্গেলে জগৎশেঠ ও অন্যান্য বন্দী কর্মচারী এবং রাজা ও জমিদারদিগের বিনাশ সাধন করেন। জগৎশেঠ মহাতপচাঁদকে অত্যুচ্ছ দুর্গশিখর হইতে গঙ্গারগর্ভে নিক্ষেপ করা হয়। মহারাজ স্বরূপচাঁদও ঐ সাথে ইহজীবনের লীলা শেষ করিতে বাধ্য। মুতাক্ষরীণের অনুবাদক লিখেছেন, 'চুনী নামক জগৎশেঠের জনৈক ভৃত্য প্রভুর সহিত একত্রবদ্ধ হইয়া জলমগ্ন হইতে, অথবা তাঁহার পূর্বে প্রাণ বিসর্জন করিবার জন্য অশেষ প্রকার অনুনয় বিনয় করিতে থাকে। কিন্তু তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করা হয় নাই। অবশেষে সে নিজেই দুর্গশিখর হইতে পতিত হয়। জগৎশেঠ তাহাকে নিরস্ত হইবার জন্য অতিশয় অনুনয় বিনয় করিয়াছিলেন; কিন্তু সে তাঁহার কথায় মনোযোগ দেন নাই।' জানা যায় অনুবাদক বাবুরাম নামে চুনীর জনৈক আত্মীয়ের কাছ থেকে এই সংবাদ অবগত হন। (Seir Mutagherin, Vo. 11. P. 268).)

রবার্ট ক্লাইভ

নবাব সিরাজবিরোধী ষড়যন্ত্রের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন রবার্ট ক্লাইভ। ক্লাইভ খুব অল্প বয়সে ভারতে আসেন। প্রথমে তিনি একটি ইংরেজ বাণিজ্য কেন্দ্রে গুদামের দায়িত্বে নিযুক্ত হন। এই কাজটি ছিল অত্যন্ত পরিশ্রমের ও বিরক্তিকর। এই কাজটিতে ক্লাইভ মোটেও সন্তুষ্ট ছিলেন না। এ সময় জীবনের প্রতি তার বিতৃষ্ণা ও হতাশা জন্মে। তিনি আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেন। তিনি রিভলবার দিয়ে নিজের কপালের দিকে লক্ষ্য করে পর পর তিনটি গুলী ছোঁড়েন। কিন্তু গুলী থাকা অবস্থাতেই গুলী রিভলবার থেকে বের হয়নি। পরে তিনি ভাবলেন ঈশ্বর হয়ত তাকে দিয়ে বড় কোন কাজ সম্পাদন করবেন বলেই এভাবে তিনি তাঁকে বাঁচালেন। পরবর্তীতে দ্রুত তিনি ক্ষমতার শিখরে উঠতে শুরু করেন। পরিশেষে পলাশী ষড়যন্ত্রে নেতৃত্ব দিয়ে তিনি কোটি টাকার মালিক হন। ইংরেজরা তাকে 'প্লাসি হিরো' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তিনি দেশে ফিরে গিয়ে একদিন বিনা কারণে বাথরুমে ঢুকে নিজের গলায় নিজের হাতেই ক্ষুর চালিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ইয়ার লতিফ খান

পলাশী ষড়যন্ত্রের শুরুতে ষড়যন্ত্রকারীরা ইয়ার লতিফ খানকে ক্ষমতার মসনদে বসাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরে এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে এক্ষেত্রে মীরজাফরের নাম উচ্চারিত হয়। ইয়ার লতিফ খান ছিলেন নবাব সিরাজের একজন সেনাপতি। তিনি এই ষড়যন্ত্রের সাথে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন এবং যুদ্ধের মাঠে তার বাহিনী মীরজাফর, রায় দুর্লভের বাহিনীর ন্যায় ছবির মতো দাঁড়িয়েছিলো। তার সম্পর্কে জানা যায়, তিনি যুদ্ধের পর অকস্মাৎ নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যান। অনেকের ধারণা, তাকে কে বা কারা গোপনে হত্যা করেছিল। (মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা, আসকার ইবনে শাইখ, পরিশিষ্ট)।

www.pathagar.com

মহারাজা নন্দকুমার

মহারাজা নন্দকুমার এই ষড়যন্ত্রের নেপথ্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। মুর্শিদাবাদ কাহিনী গ্রন্থে নিখিলনাথ রায় নন্দকুমারের অনেক বিবেচনার পর সিরাজের ভবিষ্যৎ বাস্তবিকই ঘোরতর অন্ধকার দেখিয়া, ইংরেজদিগের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের ইচ্ছা করিলেন। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ বলিয়া থাকেন যে, ইংরেজরা সেই সময়ে আমীরচাঁদকে দিয়া নন্দকুমারকে ১২ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। পলাশী ষড়যন্ত্রের পর নন্দকুমারকে মীরজাফর স্বীয় দেওয়ান নিযুক্ত করে সব সময় তাকে নিজ কাছে রাখতেন। মীরজাফর তার শেষ জীবনে যাবতীয় কাজকর্ম নন্দকুমারের পরামর্শানুসারে করতেন। তার অন্তিম শয্যায় নন্দকুমারই তার মুখে কিরীটেশ্বরীর চরণামৃত তুলে দিয়েছিলেন।

তহবিল তছরূপ ও অন্যান্য অভিযোগের বিচারে নন্দকুমারের ফাঁসিকাষ্ঠে মৃত্যু হয়েছিল। বিচার সম্পর্কে নিখিলনাথ রায় লিখেছেন, 'প্রধান বিচারপতি জুরীদিগকে চার্জ বুঝাইয়া দেওয়ার পূর্বে মহারাজের কৌঁসলি ফ্যারার সাহেব জুরীদিগকে লক্ষ্য করিয়া কিছু বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ইংল্যান্ডীয় আইনে গুরুতর অপরাধীদিগের কৌঁসলি আইন সংক্রান্ত কোন কথা ব্যতীত আর কিছু বলিতে পারেন না বলিয়া তাঁহার আবেদন অগ্রাহ্য করা হয়।... অতঃপর জুরীরা প্রায় একঘন্টা পরামর্শ করিয়া, মহারাজ নন্দকুমারকে দোষী বলিয়াই প্রকাশ করিলেন। তজ্জন্য তৎকালের নিয়মানুসারে ১৬ই জুন মহারাজ নন্দকুমারের প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করা হয়। প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত, মহারাজ নন্দকুমারকে কারাগারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। কারাগারের একটি দ্বিতল গৃহ তাঁহার আবাসস্থানরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছিল। সে গৃহে আর কেহ থাকিত না; তথায় মহারাজ বন্ধুবান্ধবগণের সহিত কথোপকথনে ও শাস্ত্রালাপে মৃত্যু সময় পর্যন্ত অতিবাহিত করিয়াছিলেন।।

রায় দুর্লভ

রায় দুর্লভ ছিলেন নবাবের একজন সেনাপতি। তিনিও মীরজাফরদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। যুদ্ধকালে তিনি এবং তার বাহিনী মীরজাফরদের সাথে যুক্ত হয়ে নীরবে দাঁড়িয়েছিলেন। যুদ্ধের পরে তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন এবং ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে সেখানেই তার মৃত্যু ঘটে।

উমিচাঁদ

ক্লাইভ কর্তৃক উমিচাঁদ প্রতারিত হয়েছিলেন। ইয়ার লতিফ খান ছিলেন উমিচাঁদের মনোনীত প্রার্থী। কিন্তু যখন অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীর এ ক্ষেত্রে মীরজাফরের নাম ঘোষণা করলেন, তখন উমিচাঁদ বেঁকে বসলেন এবং বললেন, আপনাদের প্রস্তাব মানতে পারি এক শর্তে, তা হলো যুদ্ধের পর নবাবের রাজকোষের ৫ ভাগ সম্পদ আমাকে দিতে হবে। ক্লাইভ তার প্রস্তাব মানলেন বটে কিন্তু যুদ্ধের পরে তাকে তা দেয়া হয়নি। যদিও এ ব্যাপারে একটি মিথ্যা চুক্তি হয়েছিল। ওয়াটস রমণী সেজে মীরজাফরের বাড়িতে গিয়ে লাল ও সাদা কাগজে দু'টি চুক্তিতে তার সই করান। লাল কাগজের চুক্তিতে বলা হয়েছে, নবাবের কোষাগারের পাঁচ শতাংশ উমিচাঁদের প্রাপ্য হবে। এটি ছিল নিছক

www.pathagar.com

প্রবঞ্চনামাত্র। যাতে করে উর্মিচাঁদের মুখ বন্ধ থাকে। যুদ্ধের পর ক্লাইভ তাকে সরাসরি বলেন, আপনাকে কিছু দিতে পারবো না। এ কথা শুনে তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন এবং স্মৃতিভ্রংশ উন্মাদ অবস্থায় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতেই তার মৃত্যু ঘটে।

রাজা রাজবল্লভ

ষড়যন্ত্রকারী রাজা রাজবল্লভের মৃত্যুও মর্মান্তিকভাবে ঘটেছিল। জানা যায়, রাজা রাজবল্লভের কীর্তিনাশ করেই পদ্মা হয় কীর্তিনাশা।

দানিশ শাহ বা দানা শাহ

দানিশ শাহ সম্পর্কে বিতর্ক রয়েছে। অনেকে বলেছেন, এই দানেশ শাহ নবাব সিরাজকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় লিখেছেন, সে দানশাহ ফাকর মোটেই জীবিত ছিলেন না। আসকার ইবনে শাইখ তাঁর 'মুসলিম আমলে বাংলার শাসন কর্তা' গ্রন্থে লিখেছেন' বিষাক্ত সর্প দংশনে দানিশ শাহর মৃত্যু ঘটেছিল।

ওয়াটস্

ওয়াটস এই ষড়যন্ত্রের নেপথ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিলেন। তিনি রমণী সেজে মীরজাফরের বাড়িতে গিয়ে চুক্তিতে মীরজাফরের স্বাক্ষর এনেছিল। যুদ্ধের পর কোম্পানীর কাজ থেকে বরখাস্ত হয়ে মনের দুঃখে ও অনুশোচনায় বিলাতেই অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

স্ক্রাফটন

ষড়যন্ত্রের পিছনে স্ক্রাফটনও বিশেষভাবে কাজ করেছিলেন। জানা যায়, বাংলার বিপুল সম্পদ লুণ্ঠন করে বিলেতে যাওয়ার জাহাজডুবিতে তার অকালমৃত্যু ঘটে।

ওয়াটসন

ষড়যন্ত্রকারী ওয়াটসন ক্রমাগত ভগ্নস্বাস্থ্য হলে কোন ওষুধেই ফল না পেয়ে কলকাতাতেই করুণ মৃত্যুর মুখোমুখি হন।

মীর কাসেম

মীরজাফরের ভাই রাজমহলের ফৌজদার মীর দাউদের নির্দেশে মীর কাসেম নবাব সিরাজের খবর পেয়ে ভগবানগোলার ঘাট থেকে বেঁধে এনেছিলেন মুর্শিদাবাদে। পরে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তিনি নবাব হন এবং এ সময় ইংরেজদের সাথে তার বিরোধ বাধে ও কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত হন। পরে ইংরেজদের ভয়ে হীনবেশে পালিয়ে যান এবং রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ান।। অবশেষে অজ্ঞাতনামা হয়ে দিল্লীতে তার করুণ মৃত্যু ঘটে। মৃতের শিয়রে পড়ে থাকা একটা পোটলায় পাওয়া যায় নবাব মীর কাসেম হিসেবে ব্যবহৃত চাপকান। এ থেকেই জানা যায় মৃত ব্যক্তি বাংলার ভূর্তপূর্ব নবাব মীর কাসেম আলী খান।

এই ভাবেই বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীরা পলাশী যুদ্ধের কিছুকালের মধ্যেই বিভিন্ন পন্থায় মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হন। পলাশী ষড়যন্ত্রকারীদের ওপরে আল্লাহর গজব নাজিল হয়েছিল বলেই অনেকের ধারণা। আসলে এই সব ঘটনা থেকেই আমাদের অনেক কিছু শেখার বিষয় রয়েছে।

(লেখাটি ডঃ মুহাম্মদ ফজলুল হক রচিত 'বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ' প্রকাশিতব্য গ্রন্থ থেকে

www.pathagar.com

আর কোন পলাশী নয়

পলাশী ট্রাজেডীর ২৪০তম বার্ষিকী স্মরণ জাতীয় কমিটি আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে পঠিত ঘোষণাপত্র-

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ
আসসালামু আলাইকুম।

পলাশী ট্রাজেডীর ২৪০তম বার্ষিকী স্মরণ জাতীয় কমিটির আমন্ত্রণে আজ এই মধ্যাহ্ন ভোজে অংশ নেয়ার জন্য প্রথমেই আমাদের সকলের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ।

লক্ষ শহীদের রক্ত ভেজা আমাদের প্রাণ প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ আজ সার্বিক অর্থেই এক সংকটকাল অতিক্রম করছে। এই সংকটের স্বরূপ ১৭৫৭ সালের ২৩ জুনের আগে যেমন ছিলো আজ ১৯৯৭ সালেও প্রায় একই অবস্থায় বিরাজমান। ক্ষেত্রবিশেষে আমাদের সচেতনতা ও সতর্কতার অভাবে তা নানা শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত হয়ে আরও শক্তভাবে আঁকড়ে ধরেছে জাতির হৃদপিন্ড। দেশী-বিদেশী চক্রান্তে সেদিন যে বিষ ঢেলে দেয়া হয়েছিলো বাংলাদেশের জমিনে-সেই বিষের দাহে আজও জ্বলছে আমাদের জাতীয় ইতিহাস। সঙ্গত কারণেই পলাশী বিপর্যয়ের তাৎপর্য ও গুরুত্ব অপরিসীম। সেজন্যই পলাশীর ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন আজ সর্বাধিক।

প্রত্যেক জাতির জীবনে দু'টি দিক থাকে। তার শৌর্য, বীর্য, অহংকার প্রকাশের প্রতাপ একদিকে। অন্যদিকে তার বেদনা, ব্যর্থতা ও লজ্জা। প্রথমটিকে স্মরণ করতে হয় জাতিকে আত্মবিশ্বাসে বলিয়ান হয়ে বিশ্বের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার জন্য। হীনতা, দীনতা, নীচুতা ও ক্ষুদ্রতা থেকে জাতির আত্মাকে রক্ষা করে তার ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ধর্মকে অবলম্বন করে, ভবিষ্যৎ যাত্রাকে নিষ্কন্টক ও অনির্বাণ করে তুলবার জন্য।

আর ব্যর্থতা ও লজ্জার দিক নিয়ে বার বার পর্যালোচনা করতে হয় এই কারণে যে,

www.pathagar.com

যাতে একই ভুলের ঘুরপাকে বার বার পর্যুদস্ত হতে না হয়। যাতে দেশ, জাতি ও স্বাধীনতার শত্রুরা জাতির অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে ধ্বংস করতে না পারে। বিভ্রান্ত করতে না পারে। বিপথগামী করতে না পারে। জাতীয় ঐক্য ও সংহতিতে যাতে কেউ ফাটল ধরাতে না পারে। বিভেদ ও বিভক্তি রেখার জটিল কুটিল কুৎসিত পথে যাতে একটি জাতিকে দেশী-বিদেশী কেউ পরিচালিত করতে না পারে।

আপনারা অবগত আছেন, ১২০৪ খৃষ্টাব্দে বীর যোদ্ধা মালিক উল গাজী ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বঙ্গ বিজয় আমাদের ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা। সেই ঘটনাটিকে বাংলাদেশের পবিত্র মাটিতে প্রথমবারের মতো আমরাই সাড়ম্বরে উদযাপন করি। এর মাধ্যমে আমরা চেয়েছিলাম একদিকে ইতিহাস ও ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করে, বর্তমানের সকল আবিলতা ও আবর্জনা সরিয়ে জাতির সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ যাত্রাকে নির্ভয় ও নিশ্চিত করতে। অন্যদিকে ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাথে আধুনিকতার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে বর্তমান বংশধরদের আত্মবিস্মৃতি ও অবিমৃশ্যকারিতা থেকে রক্ষা করতে। ইতোমধ্যেই বিশেষজ্ঞগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন আগ্রাসনবাদ, আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক কর্মীদের এই প্রবল প্রাণ প্রবাহের মাধ্যমে জাতি একটি নতুন মাত্রা অর্জন করেছে।

সেই ধারাবাহিকতায় এসেছে পলাশী বিপর্যয়ের ২৪০তম বার্ষিকী স্মরণ প্রসঙ্গ। আমাদের ইতিহাসে পলাশীর চাইতে কলংকজনক, ন্যক্কারজনক, নিন্দিত, ঘৃণিত ঘটনা আর কখনোই কাটেনি। পলাশী প্রান্তর শুধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার সমাধি ভূমি নয়, পলাশী আমাদের ইতিহাস, জাতিসত্তা, সংস্কৃতিরও সমাধি ভূমি। সে জন্যই পলাশী আমাদের জাতীয় জীবনে রেখে গেছে গভীর ক্ষ এবং এমন এক ক্ষত যে ক্ষত, থেকে আজও অবিরল ধারায় রক্তপাত হচ্ছে।

সেই সময়কার বাংলাদেশের কথা স্মরণ করুন। বিদেশী বণিকদের সাথে হাত মিলিয়েছে দেশী বণিক শ্রেণী। তাদের প্রধান সহায় হয়ে উঠেছে উচ্চাভিলাষী আমির-ওমরাহরা। ফলে ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা, চক্রান্ত, মোনাফেকী, কপটতা, নীচুতা, লোভ-লালসা ও অবিমৃশ্যকারিতায় আকীর্ণ তার আকাশ হিংস্র ফিসফিসানিতে ভারী হয়ে উঠেছে তার বাতাস। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে জর্জরিত, ক্ষতবিক্ষত তার প্রতিটি অঙ্গ। বণিক, বেনিয়া, আমির, ওমরাহ, রাজা-মহারাজা বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, লেখক, ঐতিহাসিকদের প্রায় সকলেই ক্লাইভ, জগৎশেঠ, উমিচাঁদের কাছে বিক্রয় করেছে আত্ম। দলে ভিড়েছে মীরজাফরের। হারিয়ে ফেলেছে সকল নৈতিকতা, পরিণত হয়েছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাসনা চরিতার্থ করার ঘুঁটিতে।

আর মাত্র একজন মানুষ নবাব সিরাজদ্দৌলা একা রুখে দাঁড়িয়েছেন সকল সর্বনাশের বিরুদ্ধে। তার সাথে কয়েকজন মাত্র দেশপ্রেমিক। তারা না পারছেন কাউকে বিশ্বাস করতে, না পারছেন কাউকে পরিত্যাগ করতে। ভিতরে বাইরে এ রকম ষড়যন্ত্রে বিদীর্ণ বাংলাদেশ যখন পলাশীতে দাঁড়ালো, তখন অনির্বাণ ভাবেই পরাজয়ের কালিমায় মলিন হয়ে উঠলো আমাদের এই সবুজ সহজ দেশটি।

আমরা বলেছি ১৭৫৭ সালের বাংলাদেশ এবং ১৯৯৭ সালের বাংলাদেশের মধ্যে বেশ কিছু সামঞ্জস্য আমরা প্রত্যক্ষ করছি। সেদিনের মতো আজও দেশের ভিতরে-বাইরে চলছে নানা ষড়যন্ত্র। ইতিহাসের যে কোন সময়ের চাইতে এই ষড়যন্ত্র এখন

www.pathagar.com

ব্যাপক আকার নিয়েছে। বাংলাদেশের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে ঘরে-বাইরে চলছে নিরন্তর অপচেষ্টা। এই অপচেষ্টার লক্ষ্য বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধর্ম, সংস্কৃতি ও সামাজিক মূল্যবোধকে গলা টিপে হত্যা করা। এই দেশ ও জাতির অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে ধ্বংস করে দেয়া। যাতে বাংলাদেশ নিজেই সিকিমের ভাগ্য বরণ করতে বাধ্য হয়। আর যদি তা না করা যায়, তাহলে বাংলাদেশকে আর একটি পলাশীতে ঠেলে দেয়া অথবা বসনিয়ার পরিণত করা।

এ ক্ষেত্রে আধিপত্যবাদের তল্পিবাহকরা শুধু যে রাজনৈতিক অঙ্গনে কাজ করছে কিংবা সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সীমাবদ্ধ তা নয়। তারা শিকড় কেটে দিচ্ছে অর্থনীতির। শিল্পের। ইতিহাসের। ছড়িয়ে দিচ্ছে সন্ত্রাস। উপড়ে নিচ্ছে আমাদের নৈতিকতা ও মূল্যবোধ। এ জন্যই আধিপত্যবাদের কাছে যারা আত্মসমর্পণ করেছে তাদেরকে বরেণ্য ব্যক্তি" হিসেবে উপস্থাপন করার জন্য নেয়া হয়েছে নানা ব্যবস্থা। আর যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে আপোষহীন তাদের ভাগ্যে নেমে আসছে বহুবিধ লাঞ্ছনা। এমন কি তাদের প্রাণে মেরে ফেলারও চেষ্টা চলছে।

আর একটি প্রসঙ্গ, পলাশী বিপর্যয়ের পরে সারা বাংলাদেশ যখন শোকে মুহ্যমান তখন, উপমহাদেশে মাত্র একটি শহরে, ইংরেজদের পক্ষে বিজয় মিছিল বের হয়েছিল- সে শহরটির নাম কলকাতা। ১৮৫৭ সালে সিপাহীযুদ্ধে সারা উপমহাদেশ যখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে মরণপণ লড়ছে, তখন এই একটি মাত্র শহর ও তার বুদ্ধিজীবীরা সমস্ত নৈতিকতা ও দেশপ্রেমের মাথা খেয়ে নির্লজ্জ দালালীতে মেতে উঠেছিল। কলকাতার সংবাদপত্রগুলো বিরামহীনভাবে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে করেছে বিষোদগার। করেছে উৎসব। এই শহর আমাদের ফকির বিদ্রোহ, ওহাবী আন্দোলন ও ফারায়েজী আন্দোলনের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দান করেছে। আমরা যখন মহান ভাষা আন্দোলনে বুকের রক্ত দিচ্ছি তখন এই শহরের ভদ্রলোকেরা 'হিন্দি হিন্দি' করে বিশ্বভারতীয় হয়ে ওঠতে চেয়েছে।

অর্থাৎ যা কিছু আমাদের অস্তিত্ব, আবেগ ও অর্জন-তার সবকিছুর বিরুদ্ধে সর্বদা কলকাতা থেকেছে সোচ্চার। মেতেছে ষড়যন্ত্রে। আজ এই মুহূর্তে দেশের অভ্যন্তরে যে "খ্যাতি ভিখারী" বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এরাও কলকাতারই সৃষ্টি। কলকাতা চায় বলেই আমাদের জমিনে জন্ম হয় একজন দাউদ হায়দারের, একজন তসলিমা নাসরীনের। কলকাতা চায় বলেই আমাদের কবির চৌধুরী, আনিসুজ্জামান বলেন, '৪৭-এর ভারত বিভাগ ছিলো ভুল। কলকাতা চায় বলেই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন শিক্ষক লেখেন, বাংলাদেশে সেনাবাহিনীর দরকার নেই, বলেন আরও অনেক কিছু।

এবং ওপারের স্বার্থেই জন্ম হয়েছে শান্তিবাহিনীর, বঙ্গ সেনার। ওপারের জন্যই চাই ট্রানজিট। উপ-আঞ্চলিক জোট। পত্রিকা বন্ধের আবদার। বিদ্যুৎ আমদানী। সংস্কৃতি আমদানী। ওপারের কারণেই নিরন্তর চেষ্টা চলছে ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত হানার। কুদরতে খোদা শিক্ষা কমিশন বাস্তবায়নের। এবং পাঠ্য পুস্তকে ইতিহাস বিকৃতির ঢালাও ব্যবস্থা। অন্তঃসারশূন্য পানি চুক্তি। ধর্ষণ, গণপিটুনি ও গুপ্ত হত্যা, চলছে বুদ্ধিজীবী ক্রয়-বিক্রয়। বন্যার স্রোতের মতো ঢুকছে ফেনসিডিল। ঢুকছে বিকৃত গ্রন্থ। ঢুকছে মগজ ধোলাইকৃত শিক্ষার্থী। শিক্ষাঙ্গনগুলোকে পরিকল্পিতভাবে পরিণত করা

www.pathagar.com

হয়েছে রণক্ষেত্রে। টেলিভিশন নাটক, একাডেমীগুলো কোনটাই আজ আর সন্দেহের উর্ধ্বে নয়।

পলাশীর প্রেক্ষাপটের স্বার্থে বর্তমানের এই মিলের কারণেই পলাশী স্মরণের প্রয়োজনীয়তা অন্য যে কোন সময়ের চাইতে আজ সর্বাধিক। সেই ভুলের পর্যালোচনা না করলে দ্বিতীয় ভুলের ফাঁদে আমাদের জীবন ও জাতীয় অস্তিত্ব আজ সত্যিকার অর্থেই বিপন্ন হতে পারে। এ জন্যই ইতিহাসের এই ক্রান্তিকালে কোন দেশপ্রেমিক নাগরিক ঘরে বসে থাকতে পারে না। থাকা উচিৎ নয়। আমাদের তরুণ সমাজকে জানাতে হবে সঠিক তথ্য ও ইতিহাস। পরিষ্কার করে চেনাতে হবে শত্রু-মিত্র। আধিপত্যবাদের তল্পিবহনকারী রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের সৃষ্ট করুশা ও কুয়াশা ও কাঁকরের দিগন্ত ভেদ করে তাদেরকে দিতে হবে সত্য মুক্তি স্বাধীন জীবনের সন্ধান। সকল হীনতা, দীনতা, হতাশা ও ভীতির করালগ্রাস থেকে জাতিকে উদ্ধার করে শোনাতে হবে আশার বাণী। তার সন্ত্রস্ত রক্তে-মাংসে দিতে যথার্ত চেতনা। সেই লক্ষ্য- উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়েই এবার ব্যাপকভাবে পলাশী দিবস স্মরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা। আমাদের মূল বক্তব্য একটাই-যাতে এ মাটিতে আর কোন দিন আর কোন পলাশীর জন্ম না হয়। সে ব্যাপারে সকলকে সচেতন করে জাতীয় কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে চাই,

সত্য মুক্তি স্বাধীন জীবন লক্ষ্য শুধু যাদের
খোদার রাহায় প্রাণ দিতে আজ ডাক পড়েছে তাদের
দেশের পায়ে প্রাণ দিতে আজ ডাক পড়েছে তাদের
সত্য মুক্তি স্বাধীন জীবন লক্ষ্য শুধু যাদের

প্রিস সাংবাদিক বন্ধুগণ

যে পটভূমিকা উপস্থাপন করলাম, তাতে হয়তো এবারের পলাশী দিবস স্মরণের অনিবার্যতা প্রতিভাত হয়েছে। সে আলোকেই আমাদের কর্মসূচীগুলো দেখার অনুরোধ জানাই আপনাদের।

আমাদের পলাশী দিবস কর্মসূচী দুই পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্ব সকাল ৯ টায়। জাতীয় প্রেসক্লাব চত্বর থেকে শুরু হবে পলাশী শোক র‍্যালী "আর কোন পলাশী নয়"। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ এতে অংশ নেবেন। র‍্যালিতে প্রতিফলিত হবে বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম এবং দেশপ্রেমের গৌরব। রাজধানীর প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করবে এই র‍্যালী।

বিকেল ৩টায় জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে শুরু হবে আলোচনা সভা। দেশের খ্যাতিমান ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গ এতে অংশ নেবেন। এই আলোচনা সভার দরোজা সকলের জন্য উন্মুক্ত। আলোচ্য বিষয় "পলাশীর প্রেক্ষাপট এবং আজকের বাংলাদেশ।"

উদযাপন বার্ষিকীকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য আমরা একটা সুশোভন সংকলন প্রকাশের পদক্ষেপ নিয়েছি। প্রচারের জন্য পোস্টার ও স্টিকার ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে সারা দেশে।

আমাদের একটি বড় প্রত্যাশা, আমাদের এই কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী সকল দেশপ্রেমিক সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গ ও সাংস্কৃতিক

www.pathagar.com

সংগঠনসমূহকে একটি পতাকার নীচে একত্রিত করা। কারণ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন মোকাবেলায় আজ আমরা যদি ব্যর্থ হই তাহলে বাংলাদেশের অস্তিত্ব টলে উঠবে।

আর আমাদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার ছিদ্রপথে প্রশস্ত হতে থাকবে আর একটি পলাশীর প্রস্তুতি। তাহলেও ভবিষ্যৎ পলাশীতে যাতে আমাদের বিজয় অনিবার্য হয়, সেজন্য আজ চাই ঐক্য, চাই সংহতি। মনে রাখতে হবে, আমাদের ঐক্য মানেই হলো আমাদের বিজয়। আর দেশ প্রেম হলো ঈমানের অঙ্গ। পলাশী দিবস স্মরণের মাধ্যমে সেই ঈমান নতুন শক্তিতে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠুক।

১৮ জুন ১৯৯৭
ইয়াংকিং চাইনিজ রেস্টুরেন্ট
কলাবাগান, ঢাকা

আবদুল হাই শিকদার
সদস্য সচিব

www.pathagar.com

পলাশীর শোকর‍্যালী

দেশবাসীর নতুন অভিজ্ঞতা

২৩ জুন। ঐতিহাসিক পলাশী দিবস। আজ থেকে ২৪০ বছর পূর্বে ১৭৫৭ সালে এই দিনে রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, ঘষেটি বেগম আর রাজনৈতিক যাত্রামঞ্চের ভাঁড় মীরজাফরের ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা ও ক্ষমতা লিপ্সার ষড়যন্ত্রে পলাশীর প্রান্তরে লর্ড ক্লাইভের সেনাবাহিনীর কাছে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার ভাগ্যহত শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার চরম ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে। প্রায় দু'শ' বছরের জন্য আমাদের স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়ে যায়। দিনটি শোকের, বেদনার ও আত্মোপলব্ধির। তাই, দিবসটি পালনের জন্য বিভিন্ন সংগঠন দিনব্যাপী বিস্তারিত কর্মসূচী পালন করে। কর্মসূচীর মধ্যে ছিলো চিত্র প্রদর্শনী, স্মরণিকা প্রকাশ, শোকর‍্যালী ও আলোচনা সভা।

'পলাশী ট্রাজেডীর ২৪০ তম বার্ষিকী স্মরণ জাতীয় কমিটি' দিবসটি যথাযথভাবে পালনের জন্য দিনব্যাপী বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করে। কর্মসূচীর মধ্যে ছিলো সকালে প্রেসক্লাব চত্বর থেকে শোকর‍্যালী বের করা এবং বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে "পলাশী ট্রাজেডীর প্রেক্ষাপট ও আজকের বাংলাদেশ" শীর্ষক আলোচনা সভা।

সকাল সাড়ে ন'টায় রাজধানী ঢাকার প্রত্যন্ত এলাকা থেকে সিরাজভক্ত ও দেশপ্রেমিক আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা শোকের প্রতীক কালো গেঞ্জী পরে এবং কালো পতাকা হাতে নিয়ে দলে দলে জাতীয় প্রেসক্লাব চত্বরে জড়ো হতে শুরু করে। কিন্তু সরকারী দলের অনির্ধারিত জনসভার জন্য সেখানে মঞ্চ তৈরী হওয়ায় পুলিশ জনতাকে সচিবালয়ের উত্তর পাশে তোপখানা রোডে ঠেলে দেয়। সকাল পৌনে দশটায় প্রেসক্লাবের সামনে উপস্থিত

www.pathagar.com

হয় রাজাশূন্য রাজহাতী। মাহুতের গায়ে কালো গেঞ্জি। হাতে বিরাট কালো পতাকা। পলাশী বিপর্যয়ের পর দেশপ্রেমিক নবাব সিরাজদ্দৌলাকে হত্যা করে তার খণ্ড-বিখণ্ড লাশ নিয়ে এই হাতীর পিঠেই আনন্দ মিছিল বের করা হয়েছিলো। আজ সে হাতীই বহন করছে শোকের পতাকা।

শোকের পতাকাবাহী হাতী প্রেসক্লাবের সামনে আসার সামান্য পরেই পল্টনের মোড় দিয়ে আসামীর কাঠগড়া সাজানো ১৩টি রিকশাভ্যানে করে পর্যায়ক্রমে আসতে থাকে প্রতীকী লর্ড ক্লাইভ, ওয়াটস, মানিক চাঁদ, রায়দুর্লভ, ঘষেটি বেগম, আমীর চাঁদ, রাজবল্লভ, উমিচাঁদ, কৃষ্ণচাঁদ, মীরজাফর, জগৎশেঠ, নবকুমার, ইয়ার লতিফ প্রমুখ বিশ্বাসঘাতকবৃন্দ। শিল্পীর রঙতুলির স্পর্শে তারা দর্শকের চোখে কল্পনার জগৎ ছেড়ে বাস্তবতার রূপ নিয়ে ফুটে ওঠে। এদের কেউ কেউ ছিলেন শিকল পরা। আবার কাউকে পেছন থেকে প্রতীকী জুতোর আঘাত করা হচ্ছিলো।

সকাল দশটায় শোকর‍্যালী শুরু হয়। র‍্যালী শুরুর পূর্বে জাতীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। বক্তারা হলেন, কবি আল মাহমুদ, বিশিষ্ট সাংবাদিক গিয়াস কামাল চৌধুরী, শফিউল আলম প্রধান, ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি আমানুল্লাহ কবির, আঞ্জুমান আরা বেগম, আক্তার হোসেন, কমিটির সদস্য সচিব কবি আবদুল হাই শিকদার, সাংবাদিক মাসুদ মজুমদার, কবি মতিউর রহমান মল্লিক।

তারা বলেন, পলাশীর বিপর্যয় নিছক দুর্ঘটনা নয়। পৃথিবীর ইতিহাসের বাঁক ঘুরানোর ট্রাজেডী। এর স্মৃতিবিজড়িত ২৩ জুন আমাদের জাতিসত্তার সাথে সম্পৃক্ত এমন একটি দিবসে আমরা প্রেরণা পাই শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করার। পলাশী আমাদের স্বাধীনতার শত্রু-মিত্র চিহ্নিত করে দিয়েছে, স্বরূপ উদঘাটন করেছে বিশ্বাসঘাতকদের। সিরাজদ্দৌলা ও স্বাধীনতা একার্থবোধক। অন্যদিকে মীরজাফর, জগৎশেঠ ষড়যন্ত্রের প্রতীক, তারা পলাশীর পুনরাবৃত্তি রোধে সতর্ক ও ঐক্যবদ্ধ থাকতে জাতির প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলেনঃ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সংস্কৃতিসহ সর্বক্ষেত্রে বাইরের আগ্রাসন এবং ভেতরের চক্রান্তের প্রেক্ষাপটে আশংকা হচ্ছে, জাতি আর একটি পলাশীর মুখোমুখি। স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব নস্যাতের যে কোন অপপ্রয়াস প্রতিরোধে আজ দেশপ্রেমিক শক্তিকে বলিষ্ঠভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

বক্তৃতাশেষে মাইকে ধ্বনিত হয় "নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার", "বাংলাদেশ জিন্দাবাদ" "আর কোন পলাশী নয়-দেশপ্রেমিকদের আনবো বিজয়", "সারা বাংলা ঘেরাও করো-মীরজাফরদের খতম করো", "সিরাজের বাংলায়-মীরজাফরের ঠাঁই নেই"। সাথে সাথে গর্জে ওঠে র‍্যালীতে আসা জনসমুদ্র। যাত্রা শুরু হয় শোকর‍্যালীর। জাতীয় প্রেসক্লাব থেকে এই র‍্যালী শুরুর কথা থাকলেও সেখানে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের অনির্ধারিত জনসভার মঞ্চ তৈরি করতে থাকায় সচিবালয়ের উত্তর পাশের তোপখানা রোড থেকে র‍্যালী শুরু হয়। হাজার হাজার শোকার্ত মানুষ, "সত্য মুক্তি স্বাধীন জীবন লক্ষ্য শুধু যাদের, খোদার রাহায় প্রাণ দিতে আজ ডাক পড়েছে তাদের, দেশের পায়ে প্রাণ দিতে আজ ডাক পড়েছে তাদের, সত্য মুক্তি-স্বাধীন জীবন লক্ষ্য শুধু

www.pathagar.com

যাদের।"–জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের এই কবিতাংশ খচিত কালো গেঞ্জি পরে র‍্যালীতে অংশ নেয়।

র‍্যালীর অগ্রভাগে ছিলো কালো পোশাকের আরোহী সম্বলিত অর্ধশত মোটর সাইকেল। এর পেছনে ছিলো তিনটি জাতীয় পতাকা। জাতীয় পতাকার পেছনে ছিলো পলাশী দিবসের ব্যানার ও কালো পতাকা। এদের পেছনে ছিলো নবাবহীন নবাবের হাতী। হাতীর পেছনে ছিলো একটি পিকআপ। এতে ছিলেন জাতীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ। কবি আল মাহমুদ, গিয়াস কামাল চৌধুরী, আমানুল্লাহ কবির, কবি আবদুল হাই শিকদার, হাফিজ উদ্দিন, মাসুদ মজুমদার, মতিউর রহমান মল্লিক, খন্দকার আবদুল মোমেন। নেতৃবৃন্দের পেছনে ছিলো প্রতীকী জাতীয় বেইমানদের সুসজ্জিত রিকশা ভ্যান। এর আগে-পরে ছিলো মাইক।

জাতীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ পিকআপে বসে প্রায় তিন কিলোমিটার লম্বা র‍্যালী পরিচালনা করছিলেন আর মাইকে আত্মোপলব্ধিমূলক বক্তব্য রাখছিলেন। এ সময় কবি আল মাহমুদ বলেন, খুব কৌশলে আরেকটি পলাশীর আয়োজন চলছে, জাতির স্বাধীনতা রক্ষার প্রত্যয়ে সকল দেশপ্রেমিককে এগিয়ে আসতে হবে।

গিয়াস কামাল চৌধুরী বলেন; দেশের স্বাধীনতা, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বিকিয়ে দেয়ার জন্য নব্য ঘষেটি বেগমরা তৎপর হয়ে উঠেছে। দেশকে বিক্রি করে দেয়ার নতুন ষড়যন্ত্র চলছে। এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে যেন আরেকটি পলাশী না ঘটে।

আমানুল্লাহ কবীর বলেন, বর্তমান সরকারের অর্থমন্ত্রীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে শেয়ার বাজার লুণ্ঠিত হয়েছে। যারা শেয়ার বাজারের পুঁজি লুণ্ঠন করেছে আমরা তাদের বিচার চাই। আজ সরকার ভারতকে ট্রানজিট, উপ-আঞ্চলিক জোট, করিডোর, চট্টগ্রাম বন্দর ভাড়া দিয়ে দেশ বিক্রি করতে যাচ্ছে, পার্বত্য চট্টগ্রামের ৬০ ভাগ জনগোষ্ঠীকে বাইরে রেখে চুক্তি স্বাক্ষর করার প্রস্তুতি নিয়েছে। জনাব আমানুল্লাহ কবীর বলেন, জেলহাজতে যখন আমার ভাই পুলিশী নির্যাতনে মারা যায় তখন প্রধানমন্ত্রী বলেন, উত্তেজিত হবার কিছুই নেই। তাহলে প্রশ্ন, আপনি যদি আপনার পিতার হত্যার বিচারের দাবীতে উত্তেজিত হন তাহলে আমার ভাইয়ের হত্যার বিচারের দাবীতে উত্তেজিত হবো না কেন?

জনাব আবদুল হাই শিকদার বলেন, আজ দুঃখের দিন নয়, শপথ নেবার দিন। পলাশীর ব্যর্থতা থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে, শোককে শক্তিতে পরিণত করে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করতে হবে।

জনাব শফিউল আলম প্রধান বলেন, সে দিনের ন্যায় আজও ষড়যন্ত্র চলছে, হিন্দুস্তানের পোষ্য বিশ্বাসঘাতক মীরজাফররা আবারও সক্রিয় হয়ে উঠেছে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব নস্যাৎ করে দিতে। তিনি হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন, বাংলার মাটি আর দেশপ্রেমিকদের রক্তে রঞ্জিত হবে না। বিশ্বাসঘাতকদের রক্তে রঞ্জিত হবে।

www.pathagar.com

আজ ক্ষমতাসীন হিন্দুস্থানের দালাল সরকার পলাশী দিবস পালন করতে বাধা দিচ্ছে। তাদের পান্থপথে জনসভা ছিলো। কিন্তু পলাশী দিবস পালনে বাধা দিতে তা প্রেসক্লাবের সামনে নিয়ে এসেছে।

হাজার হাজার মানুষের অংশগ্রহণকারী শোকার্ত র‍্যালীটি পল্টন মোড়, জিরো পয়েন্ট, বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ গেট, গুলিস্তান পুলিশ বক্স, টিকাটুলী, শাপলা চত্বর, দৈনিক বাংলা, ফকিরাপুল, নয়া পল্টন, বিজয় নগর ও পুরানা পল্টন হয়ে সচিবালয়ের উত্তর পাশে গিয়ে শেষ হয়। শোকর‍্যালী রাজপথ প্রদক্ষিণকালে নেতৃবৃন্দ মাইকে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। র‍্যালীতে অংশগ্রহণকারীরা গগনবিদারী স্লোগান তোলে। র‍্যালী দেখার জন্য অফিস-আদালতের লোকজন ও অন্যান্যরা রাস্তায় নেমে আসে। মহিলারা জানালায় জড়ো হয়। তারা সকলেই স্বাধীনতার চেতনায় দীপ্ত এই মিছিলকে হাত নেড়ে স্বাগত জানায়। স্বল্প সময়ের জন্য হলেও অনেকেই শূন্য হাতী দেখে নিজের অজান্তেই চলে যান ২৪০ বছর পূর্বে। কল্পনায় দেখতে থাকেন পলাশী, মুর্শিদাবাদ আর ভগবানগোলা। বন্দী শিবির। উপলব্ধি করতে চান সিরাজের দেশপ্রেম। সাময়িকভাবে হলেও তারা নতুন করে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হন।

মহানগর প্রদক্ষিণের পর সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা ও মোনাজাতের মাধ্যমে শোকর‍্যালীর সমাপ্তি ঘটে। বক্তব্য রাখেন গিয়াস কামাল চৌধুরী, আমানুল্লাহ কবির, রাজনীতিবিদ শফিউল আলম প্রধান, আবদুল হাই শিকদার, হাফিজ উদ্দিন প্রমুখ। মোনাজাত পরিচালনা করেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক। জাতীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ বলেন, পলাশী ট্রাজেডী আমাদের জাতিসত্তার সাথে জড়িয়ে থাকা সে দিন, যে দিনটিকে সামনে রেখে হৃদয়ের অবিরত রক্তক্ষরণের মাঝেও আমরা শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করার প্রেরণা পাই। পলাশী শত্রু-মিত্র চিহ্নিত করার সুযোগ দিয়েছিলো বলেই আজ খল চরিত্রের এনজিও, পঞ্চম বাহিনীর অপতৎপরতা, বেনিয়াচক্রের অশুভ ছায়াপাত, বিদেশী শক্তির কূটচাল ও আধিপত্যকামীদের প্রতিটি পদক্ষেপে আমরা টের পেয়ে যাই যে, আরেকটি পলাশী ট্রাজেডী ধেয়ে আসছে। দেশের সামগ্রিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট প্রমাণ করছে-আমরা আর একটি পলাশীর মুখোমুখি হচ্ছি। এমন পরিস্থিতিতে স্বাধীনতা ও বিশ্বাসঘাতকতাকে পরিমাপ করার জন্য পলাশী আমাদের জাগ্রত রাখবে, সম্বিত ফিরিয়ে দেবে। নেতৃবৃন্দ দেশবাসীকে আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রশ্নে যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান এবং বিকেলের আলোচনা সভা স্থগিত ঘোষণা করেন। বিকেলে এর কারণ ব্যাখ্যার জন্য জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সাংবাদিক সম্মেলন

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন কমিটির উপদেষ্টামন্ডলীর অন্যতম সদস্য সাংবাদিক গিয়াস কামাল চৌধুরী, আমানুল্লাহ কবির, আবদুল হাই শিকদার, মাসুদ মজুমদার ও মতিউর রহমান মল্লিক প্রমুখ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জনাব মাহবুবুল হক, খন্দকার আবদুল মোমেন, জনাব আরকান উল্লাহ হারুনী প্রমুখ।

www.pathagar.com

গিয়াস কামাল চৌধুরী বলেন, ১৮ জুন স্থানীয় একটি হোটেলে সাংবাদিক সম্মেলনে আমরা ২৩ জুন, পলাশী দিবসের কর্মসূচী ঘোষণা করি। তাতে বলা হয়, এ দিন সকালে প্রেসক্লাব চত্বর থেকে শোকর‍্যালী বের হবে এবং বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। এর আগে সরকারী দল একই দিনে পান্থপথে তাদের ক্ষমতা গ্রহণের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এক জনসভা করার ঘোষণা দেয়। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে সরকারী দল তাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে অগণতান্ত্রিক পন্থায়, স্বৈরাচারী কায়দায় মাত্র দু'দিন পূর্বে প্রেসক্লাবের সামনে জনসভা করার ঘোষণা দেন। যেহেতু আমাদের কাজ সৃষ্টিধর্মী এবং আমরা দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ ও সচেতন করতে চাই সেহেতু আমরা আমাদের প্রস্তাবিত আলোচনা সভার তারিখ পরিবর্তন করেছি। পরবর্তীতে সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে পরবর্তী সময়সূচী জানানো হবে। আমরা কোন অনাকাঙ্ক্ষিত কাজের সাথে জড়িয়ে যেতে চাই না। তবে সরকারি দল আমাদেরকে সেদিকেই ঠেলে দিতে চাচ্ছে। কিন্তু সে ধরনের পরিস্থিতি এড়ানোর জন্যই আমরা আমাদের আলোচনা সভার সময়সূচী পরিবর্তন করেছি।

জনাব আমানুল্লাহ কবির বলেন, পলাশী দিবস নিয়ে কারো কোন দ্বিমত থাকার কথা নয়। আজকের যে সব ঘটনা ঘটে গেলো, আমাদের নির্ধারিত স্থানের পাশে সরকারী দল জনসভার আয়োজন করে মূলত পলাশী দিবসকে বিতর্কিত করেছে। তাছাড়া আমাদের লোকজন পোস্টার লাগাতে গেলে বাধা দেয়া হয়। পোস্টার ছিঁড়ে ফেলে। কোন কোন জায়গায় কথা কাটাকাটিও হয়। টেলিফোনে হুমকি দেয়। শোক র‍্যালীতে আমাদের লোকজনকে আসতে বাধা দেয়। এমতাবস্থায় একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটার আশংকা রয়েছে। তাই, আমাদের আলোচনা সভা পিছিয়ে দেয়া হয়েছে।

জনাব আবদুল হাই শিকদার বলেন, শাসক দল আমাদের এ দিবস পালনকে ভালোভাবে নিতে পারেনি। এই প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য হলো আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে দেশবাসীকে অবহিত করা। কিন্তু তাতে সরকারী দলের গাত্রদাহের কোন কারণ থাকতে পারে না। এ সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে আমরা সরকারকে জানিয়ে দিতে চাই, আমরা নিয়মতান্ত্রিকতা ও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। তবে, কেউ যদি এর বিপরীত কিছু আমাদের উপর চাপিয়ে দিতে চায়, তবে তাও আমরা মোকাবেলা করবো।

জনাব মাসুদ মজুমদার বলেন, এটা আমাদের প্রতিবাদ। প্রতিবাদস্বরূপ আমরা আলোচনা সভা প্রত্যাহার করলাম। পুলিশ আমাদেরকে প্রেসক্লাব চত্বর থেকে র‍্যালী বের করতে দেয়নি। আমাদের এই প্রোগ্রাম কোন রাজনৈতিক প্রোগ্রাম ছিলো না। দলমত-নির্বিশেষে সর্বস্তরের জনতা এতে শরিক হয়েছে।

– শিকদার আবদুর রব

www.pathagar.com

'পলাশী ট্রাজেডীর প্রেক্ষাপট ও আজকের বাংলাদেশ' শীর্ষক আলোচনা সভার বিবরণ

৩ জুন নবাব সিরাজদ্দৌলার শাহাদাৎ দিবস। আজ থেকে ২৪০ বছর পূর্বে, এ দিনে মীর মীরণের নির্দেশে মুহাম্মদী বেগ তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে। এ উপলক্ষে পলাশী ট্রাজেডীর ২৪০তম বার্ষিকী স্মরণ জাতীয় কমিটি জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে "পলাশী ট্রাজেডীর প্রেক্ষাপট ও আজকের বাংলাদেশ" শীর্ষক এক আলোচনা সভার আয়োজন করে।

বিশিষ্ট সাংবাদিক ও জাতীয় প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি গিয়াস কামাল চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, কবি আল মাহমুদ, অধ্যাপক আবদুল গফুর, মাওলানা মুহীউদ্দিন খান, ডঃ এস.এম. লুৎফর রহমান, আবুল আসাদ, খান আতাউর রহমান, ওবায়দুল হক সরকার, ডঃ মঈনুদ্দিন হোসেন, ডঃ নজরুল ইসলাম, এরশাদ মজুমদার, ডঃ রেজওয়ান সিদ্দিকী, মাসুদ মজুমদার, অধ্যাপক খন্দকার আবদুল মোমেন, কবি মতিউর রহমান মল্লিক, কাইয়ুম খান মিলন। স্বাগত ভাষণ দেন কমিটির সদস্য সচিব কবি আবদুল হাই শিকদার। প্রস্তাব পাঠ করেন খালেদ রকিব। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন হাসনাত আবদুল কাদির। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপন করেন আলম মাসুদ।

স্বাগত ভাষণ

জাতি আজ পরিষ্কারভাবে দু'ভাগে বিভক্ত

——— কবি আবদুল হাই শিকদার

কবি আব্দুল হাই শিকদার তার স্বাগত ভাষণে বলেন, আলোচনা সভাটি হবার কথা ছিলো ২৩শে জুন বিকেল ৪টায়। নির্ধারিত দিনের সাতদিন পূর্বে একটি সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে আমরা এর ঘোষণা দেই যা বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় আসে। এর ২/১ দিন পর দেশের একটি রাজনৈতিক দল একই দিন পান্থপথে তাদের জনসভা আহ্বান করে। এ খবরও পত্রিকায় ছাপা হয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, আমাদের অনুষ্ঠানকে বিভ্রান্ত

www.pathagar.com

করার জন্য, বানচাল করার জন্য হঠাৎ করে খুব দ্রুত এবং হাস্যকর যুক্তি দেখিয়ে তারা তাদের জনসভা প্রেসক্লাবে নিয়ে আসে। যেহেতু দেশের প্রধান মন্ত্রী বক্তব্য রাখবেন সেহেতু সমস্ত পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিলো এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার মারাত্মক কড়াকড়ির কারণে বাধ্য হয়ে প্রতিবাদস্বরূপ সেদিন আমরা আমাদের আলোচনা অনুষ্ঠান স্থগিত ঘোষণা করি। সেই স্থগিতকৃত আলোচনা অনুষ্ঠানেই আজকে আপনারা এসেছেন।

ইতোমধ্যে আরো অনেকগুলো দুঃখজনক ঘটনা ঘটে গেছে পত্রিকার পাতায়। বাংলাদেশ এবং পলাশী, সিরাজদ্দৌলা এবং দেশপ্রেম পরস্পরের পরিপূরক। পলাশীর দিন যেমন আমাদের বেদনার দিন, লজ্জার দিন তেমনি একথাও সত্য যে, সেদিন আমরা সকলেই পরাজয় বরণ করে নেইনি। সেদিন মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য মুষ্টিমেয় ক'জন হলেও মীর মর্দান, মোহন লাল অনেকেই পলাশীর প্রান্তরে মরণপণ যুদ্ধ করে শাহাদাৎ বরণ করেছিলেন। আজকে পলাশীর প্রান্তরে দেশমাতৃকার জন্য যারা জীবন উৎসর্গ করে দিলেন, তাদের প্রতি আমরা আমাদের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং উপনিবেশবাদ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম লড়াকু শহীদ সিরাজদ্দৌলার পবিত্র স্মৃতির প্রতি জানাই আমাদের গভীর শ্রদ্ধা। ইতিহাসের দুঃখজনক ঘটনা, আজকের এই দিনে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতীক, সার্বভৌমত্বের প্রতীক, সম্মিলনের প্রতীক, সমৃদ্ধির প্রতীক, সৌহার্দ্যের প্রতীক, নবাব সিরাজদ্দৌলা ক্লাইভের প্ররোচনায় মীরণের আদেশে নবাবের অন্নে পালিত মুহম্মদী বেগের হাতে ২ জুলাই গভীর রাতে নির্মমভাবে নিহত হয় এবং ৩ জুলাই মুর্শিদাবাদ শহরে মীরণ, মুহম্মদী বেগ এবং খান-এ-মুর্শেদ এর নেতৃত্বে বেরিয়েছিলো বিজয় মিছিল সিরাজের খন্ড-বিখন্ড এবং দলিত মথিত লাশ নিয়ে। সে মিছিল দেখে অক্ষয় কুমার মৈত্রের মত ঐতিহাসিক বলেছেন, সেদিন পলাশীতে একটি মর্সিয়ার অবতারণা ঘটেছিলো, হাহাকার করেছিলো বাংলার মানুষ, কিন্তু ষড়যন্ত্রকারী, চক্রান্তকারীরা বাংলাদেশের মানুষের সেই চেতনাকে স্তব্ধ করার জন্য সিরাজের মৃতদেহ নিয়ে যে মিছিল বের করেছিলো তা শেষে সিরাজের লাশ বাজারের ময়লার উপর ফেলে গিয়েছিলো। সেদিন পলাশীর মুর্শিদাবাদে প্রায় ৫০ লাখ লোক বাস করতো কিন্তু তাদের মধ্য থেকে একজন লোকও এগিয়ে এলো না সিরাজের লাশের সৎকার করার জন্য। মাত্র একজন মানুষ, মীর্জা জয়নুল আবেদীন, শোকে মুহ্যমান মুর্শিদাবাদে সন্ধ্যা নেমে আসলে মীরজাফরের কাছে গিয়ে হাজির হলেন, এবং বিনীতভাবে বললেন, আপনার যা অভিলাষ ছিলো তা তো চরিতার্থ হয়েছে। আপনি যা চেয়েছিলেন, তাতো পেয়েছেন। এখন তো সিরাজের লাশ ময়লার স্তূপের উপর পড়ে আছে। মানুষ হিসেবে, মুসলমান হিসেবে তার দাফন করা আমাদের ফরজের মধ্যে পড়ে। আমি আপনার কাছে লাশটি প্রার্থনা করছি। মীরজাফর তার পরামর্শদাতা ক্লাইভ, জগৎশেঠ, রাজ বল্লভ, ইয়ার লতিফ সকলের সাথে পরামর্শে বসলেন। সিরাজের লাশ মীর্জা জয়নুল আবেদিনকে দেয়া হবে কিনা সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য। পরামর্শ সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, লাশ তাকে দেয়া যাবে। তবে মুর্শিদাবাদ শহরে তা দাফন করা যাবে না। লাশ শহরের বাইরে নিয়ে যেতে হবে। মীর্জা জয়নুল আবেদীন

www.pathagar.com

রাজী হলেন। তিনি একা সিরাজের খন্ড বিখন্ড লাশকে একত্রিত করে ভাগীরথীর পানিতে রাতের অন্ধকারে গোসল করালেন। তারপর একা মানুষ সিরাজের লাশকে নিয়ে নদী পার হয়ে ভাগীরথীর ওপারে খোশবাগে গেলেন যেখানে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার আর এক নবাব আলীবর্দী খান শুয়ে আছেন। তার সমাধি গৃহের বারান্দায় অত্যন্ত অনাদরে, অবহেলায় মীর্জা জয়নুল একা কবর খুঁড়ে, একা জানাজা পড়ে সিরাজের লাশ দাফন করেন। সেদিন কোন বিউগল বাজেনি, ৩১ বার তোপধ্বনির কথা ইতিহাস থেকে জানা যায় না। কিন্তু আজকে এই সমাবেশ প্রমাণ করছে, বাংলাদেশ প্রমাণ করছে যে, আমরা সেই মহান শহীদ, মহান দেশপ্রেমিকের শ্রদ্ধার প্রতি কর্তব্যবিমুখ হইনি। আমরা আজও সেই মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। একই সঙ্গে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি মীর্জা জয়নুল আবেদিনের প্রতিও।

সুধীমন্ডলী,

যে বক্তব্য দেয়ার কথা ছিলো তা সংগত কারণেই সংক্ষিপ্ত করতে হচ্ছে। কিন্তু একটি ব্যাপার যা আমরা লক্ষ্য করছি তাহলো পলাশী বিপর্যয়ের ২৪০তম বার্ষিকী পালন করতে গিয়ে দেখা গেলো যে, জাতি আজ পরিষ্কার দু'ভাগে বিভক্ত। আমরা যেটা চেয়েছিলাম তাহলো দেশের মাঝে ঘাপটি মেরে থাকা জগৎশেঠ, মীরজাফর, ক্লাইভদের অনুসারীরা কে কোথায় আছে তা খুঁজে বের করা এবং দেশকে রক্ষার জন্য যারা জীবন উৎসর্গ করেন এমন লোকদের একটি মঞ্চে সমবেত হওয়া দরকার। সে কাজটি সম্পাদিত হয়েছে। জাতীয় সংসদের মতো মহান জায়গায় দাঁড়িয়ে একজন সংসদ সদস্য বলেছেন, সিরাজদ্দৌলা অবাংগালী ছিলেন, তিনি লুটেরা ছিলেন। শোষণ করে, নির্যাতন করে তিনি আমাদেরকে চালিয়েছেন। তাকে আমাদের দেশের মানুষ স্মরণ করবে কেন? আর একজন ঐতিহাসিক যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক (অবশ্য তাকে শিক্ষক বলতে আমাদের লজ্জা করে কারণ তার মত অবিমৃশ্যকারী, কান্ডজ্ঞানহীন এর বক্তব্য প্রলাপের মতোই লেগেছে এবং আমরা তা কমই শুনেছি।) বলেছেন, মুর্শিদাবাদ এবং পলাশী তো ভারতের মধ্যে পড়েছে। আজ যারা বাংলাদেশে পলাশী দিবস পালন করছে তারা ভুল করছে। ইতিহাস থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করেনি। আমরা আমাদের এসব বন্ধুদের বিনয় অথচ দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই, বাংলাদেশকে রক্ষার জন্য যারা যেখানেই প্রাণ দিক না কেন তারা সবাই আমাদের সহযোদ্ধা। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাতারে তারা থাকবেন। অবাঙ্গালী হওয়া যদি সিরাজদ্দৌলার অপরাধ হয় যদিও সে জন্মসূত্রে বাংলাদেশী, তারপরও যদি তাকে অবাঙ্গালী বলে দূর করে দেয়া হয়, তাহলে প্রশ্ন উঠবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষের বাড়ী কোথায় ছিলো, প্রশ্ন উঠবে আমাদের মহান জাতীয় নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কোথা থেকে এসেছিলেন। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের পূর্ব পুরুষরা কোথার বাসিন্দা ছিলেন। তারা এসেছিলেন পাটনা থেকে। কিন্তু নজরুল ইসলাম তো জন্মসূত্রে বাংগালী। প্রশ্ন উঠতে পারে আরো অনেকের ব্যাপারে। আমাদের ক্রিকেটের যে জাতীয় টীম যা কিছুদিন পূর্বে বিজয় ছিনিয়ে আনলো সে টিমের দলনেতা, ক্যাপ্টেন আকরাম খাঁ, তার বাবাওতো অবাঙ্গালী। এ সব ছল চাতুরি

www.pathagar.com

সাবধান না হলে সামনে আরো পলাশী আসবে

অধ্যাপক আবদুল গফুর

অধ্যাপক আব্দুল গফুর বলেন, পলাশীর ঘটনার পূর্বে আমরা দেখি এদেশে একটি ইংরেজ বেনিয়া সম্প্রদায় ছিলো যারা ক্ষমতা দখলের পাঁয়তারা করছে। আরো দেখি জগৎশেঠের নেতৃত্বে আর একটি সম্প্রদায় মুসলিম শাসনের অবসান ঘটানোর চেষ্টায় লিপ্ত। এর বাইরে মীরজাফরের নেতৃত্বে অন্য একটি সম্প্রদায়কে দেখি সিংহাসনের লোভে নবাবের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। এর বিপক্ষে এবং বাংলার স্বাধীনতার পক্ষে ছিলেন নবাব সিরাজদ্দৌলা। আজকে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি সিরাজদ্দৌলার উত্তরসুরি বাংলাদেশের বার কোটি মানুষ দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষায় দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ কিন্তু তারা অসহায়। কিছুদিন আগে দেশে যে পরিবর্তন ঘটেছে (যার ফলে আজকে সিরাজদ্দৌলার নাম নিলে কারো কারো গাত্রদাহ শুরু হয়) তা কিভাবে হয়েছে? এর মূলেও ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ক্লাইভদের সহযোগীদের উত্তরসুরি, জগৎশেঠদের উত্তরসূরি। আধিপত্যবাদী শক্তি সেখানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলো। তাই পলাশীর পূর্ব প্রেক্ষাপট আর আজকের প্রেক্ষাপটের মধ্যে একটা সাদৃশ্য রয়েছে। মীরজাফরের উত্তরসুরিরা আজকে আবার বাংলার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মেতেছে। এদের বিপক্ষে আছে স্বাধীনতাকামী বারো কোটি মানুষ। কিন্তু আজকে আমরা পলাশী সম্পর্কে কথা বলি। শোক প্রকাশ করি। তাই ১৭৫৭ সনে যা ঘটেছিলো তা ১৯৯৬ সনে ঘটার কথা ছিলো না। গণতন্ত্রের যুগে আমরা এতবড় একটা ভুল করলাম যার জন্য সিরাজকে আজ অবাঙ্গালী বলে, লুটেরা বলে গালিগালাজ দেয়া হচ্ছে। এটা কেমন করে হলো। আমরা সাবধান না হলে সামনে আরো পলাশী আসবে। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা দলীয় রাজনীতি করতে গিয়ে পরস্পরের বিরোধিতা করি এটা পরিহার করতে হবে। ইসলামপন্থী ও জাতীয়তাবাদীরা এক না হওয়া পর্যন্ত পলাশী বার বার আসবে। বিশ্বাসঘাতকরা সামনে আসবে। তাতে জাতির দুর্ভাগ্য বাড়তেই থাকবে।

আমরা তা বুঝতে পারিনি

মাওলানা মুহীউদ্দিন খান

মাওলানা মুহীউদ্দিন খান বলেন, বৃটিশ বেনিয়ারা যে সকল সম্পদ আমাদের দেশ থেকে লুণ্ঠন করে নিয়ে গেছে তা ফেরৎ দেয়ার দাবীকে আমি যৌক্তিক মনে করি। এই দাবীকে ন্যায়সংগত ভাবে তুলে ধরা প্রয়োজন। এডমন বার্ক'-এর বইতে এ সম্পর্কে যথাযথ তথ্য দেয়া আছে।

আর একটি কথা হলো, বেনিয়াদের এদেশে আসার পিছনে একমাত্র বাণিজ্যই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো না। তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো ১০৯৫ সনে যে ক্রুসেড শুরু হয় তার

www.pathagar.com

সফল বাস্তবায়নের জন্য ভারতে মুসলিম শাসনের অবসান। এক্ষেত্রে তারা সফল হয়েছিলো। কিন্তু আমরা তা বুঝতে পারিনি।

আর একটি কথা হলো ইহুদীরা ইস্রাইলের পশ্চিম তীরের খলিল শহরে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে কেন্দ্র করে যে ঘটনা ঘটিয়েছে এবং আমাদের শিক্ষামন্ত্রীর উপস্থিতিতে জনৈক আলী আজগর মহানবী (সঃ) সম্পর্কে যে বক্তব্য দিয়েছেন তার মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে এটাও আমাদেরকে বুঝতে হবে।

আগে বাঙালী শব্দের অর্থ বুঝুন

ডঃ এস এম লুৎফর রহমান

ডঃ এস এম লুৎফর রহমান বলেন, ২৪০ বছর পর আজ সিরাজের মৃত্যুদিবস পালনের গভীর ও খুবই তাৎপর্যপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। আমরা কি আজকে শুধু একজন নবাবের শাহাদৎ বার্ষিকী পালন করছি? শুধু কি তার শাহাদৎ বরণের মধ্যেই একটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটে গেছে? আমার তা মনে হয় না। আমার মনে হয়, নবাব সিরাজদ্দৌলা বাংলার ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, প্রথম ব্যক্তি। কারণ তিনি ছিলেন একটি যুগের, একটি সময়ের ও একটি ঘটনার প্রতিভূ। বাংলাদেশে মুসলিম রাজশক্তির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যত ঘটনা ঘটেছে তার মধ্যে তার শাহাদৎ বরণ সম্পূর্ণ একটি ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা। কারণ তাঁর শাহাদৎ বরণের মধ্য দিয়েই সে ঘটনা শেষ হয়ে যায়নি। সিরাজ যখন মসনদে বসেন তখনও এ ঘটনার শুরু হয়নি। এর সূত্রপাত ঘটে ১৭০৭ সনে বা তারও কিছু পূর্ব থেকে। ১৭০৭ সনে মুর্শিদকুলি খান ঢাকা থেকে রাজধানী মুর্শিদাবাদে সরিয়ে নেন। সাথে নিয়ে যান জগৎশেঠকে যার পরিবার পরবর্তীতে কিং মেকারে পরিণত হয়। মুর্শিদকুলির সময় থেকে এখানে উচ্চ বর্ণের হিন্দু বিত্তবান হতে থাকে যারা পরবর্তীতে আমাদের স্বাধীনতা হরণের কলকাঠি নাড়ায়। তাতে সিরাজদ্দৌলার পতন, তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র সেই ১৭০৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত অব্যাহত আছে। এটা কি খুব তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা নয় যে ১৭০৭ সালে ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে চলে গেলো রাজধানী। ১৭২৭ সালে মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যু হয়। ১৭৫৭ সালে পলাশীর ট্রাজেডী ঘটলো। ১৮৫৭ সালে সংঘটিত হলো সিপাহী বিপ্লব। ১৯৯৬ সালের ২৩ জুন দেশে আর একটি ঘটনা ঘটলো। '৯৭ সালের ২৩ জুন ঘটলো সংসদে আরো একটি নতুন ঘটনা। এসব ঘটনার মধ্যে কি পূর্বাপর একটি মিল লক্ষ্য করা যায় না? আর যায় বলেই সিরাজের পতন কোন ব্যক্তিবিশেষের পতন ছিলো না। তার তাৎপর্য ছিলো অনেক রক্ত, অনেক বৃহৎ। ১৭০৭ সালের পর থেকে যে সমস্ত হিন্দু পুরোহিতদের জন্ম হয় তারাই মুর্শিদকুলি খাঁর পর পরই মুর্শিদাবাদের কিং মেকারে পরিণত হয়। তাদের আর্থিক শক্তির প্রতি ঐতিহাসিকগণ আমাদের দৃষ্টিবদ্ধ করেছেন বার বার। এ সময়ের অবস্থাকে বুঝতে হলে বুঝতে হবে জগৎশেঠের অর্থের শক্তিকে।

www.pathagar.com

করে দেয়া হবে। এটা আমাদের বুদ্ধিজীবীরা বুঝেন না। সেদিন নিউইয়র্কে একদেশীয় লোক বললেন, আমাদেরকে ভারতের হাত-পা ধরে থাকতে হবে। তা না হলে তারা আমাদেরকে নিয়ে নিবে। কিন্তু ক্যাস্ট্রের কিভাবে আমেরিকার সমালোচনা করেও স্বাধীনভাবে টিকে আছে তা বুঝাবার মতো সময় আমার ছিলো না। পানামায় আমেরিকার সামরিক হস্তক্ষেপকেও নিরাপত্তা পরিষদ মেনে নেয়নি।

বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় যুদ্ধ করে খোলাখুলি ভাবে ভারত আমাদরকে নিয়ে যেতে পারবে না। তবে আমরা যদি দিয়ে দেই তাতে বাধা দেবার কেউ নেই। দু'দেশ এমন চুক্তিও করতে পারে যে, একে অন্যের অংশ হয়ে যাবে।

চুক্তি একটি উচ্চ আইনের বিষয়। সেখানে প্রয়োগকৃত শব্দের সাহিত্যিক অর্থ বিবেচ্য নয়। সুতরাং বাণিজ্য বা অন্য কোন চুক্তি করতে গিয়ে সেখানে এমন কোন কিছু লেখা হয়ে যেতে পারে যা না বুঝে আমরা সহজেই চলে আসতে পারি। যার আইনগত ভিত্তি হতে পারে আমরা তাদেরকে দিয়ে দিয়েছি। এমন কিছু দিয়ে দিয়েছি যা দিতে চাইনি। সিরাজ বা আলীবর্দীর আমলে এমন চুক্তি হয়েছিলো। এসব কারণে আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদিত লিগাল ডিভিশন থাকে, ভারত, আমেরিকা, জাতিসংঘ সকলেরই তা আছে। কেবল নেই আমাদের। আমরা আমলা নির্ভর। যারা আন্তর্জাতিক আইনের সূক্ষ্মতা জানেন না তারাই আমাদের সব ধরনের চুক্তি করে আসছে। ভারত সরকারের কেউই লিগাল ডিভিশনের অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত কোন চুক্তিতে সই করেন না। অথচ আমরা বিষয়টি নিয়ে মাথা ঘামাই না। যেহেতু যে কোন চুক্তি বাধ্যতামূলক। অতএব আমাদের চুক্তিসমূহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পরীক্ষিত হওয়া প্রয়োজন।

সিরাজ স্বাধীনতার প্রতীক

ডঃ নজরুল ইসলাম

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ নজরুল ইসলাম বলেন, ১৭৫৭ সনের ২৩ শে জুন পলাশীর আম বাগানে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়। বাংলা বিহার উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলাকে প্রকৃত যুদ্ধে নয়, যুদ্ধের অভিনয়ে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে হত্যা করে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বৃটিশ বেনিয়াদের হাতে তুলে দেয়া হয়। পলাশীর বেদনাদায়ক রাজনৈতিক পটভূমির পরিচালক কে বা কারা ছিলো। বাংলা বিহার উড়িষ্যার তথা ভারত উপ-মহাদেশের গলায় পরাধীনতার শিকল কে বা কারা পরিয়েছিলো ইতিহাস তাদেরকে খুঁজে বের করছে। কুটিলতা, বিশ্বাসঘাতকতা, ষড়যন্ত্র, উৎকোচের মাধ্যমে, মিথ্যা ও কাল্পনিক অভিযোগের ভিত্তিতে প্রতিশোধ গ্রহণের হিংস্রনীতি অবলম্বন করে যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র প্রয়োগ না করেই ক্লাইভ ও তার দোসররা সিরাজকে পরাজিত ও নিহত করে এদেশে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিলো। ইতিহাসের বহু বিখ্যাত যুদ্ধের চেয়ে পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল অনেক

www.pathagar.com

ভয়াবহ ও ব্যাপক ছিলো। পলাশীর প্রান্তরে সিরাজের পরাজয় কেবল এক ব্যক্তির নয়, তা ছিলো গোটা ভারত উপমহাদেশের পরাজয়। এই পরাজয় ভারতে উন্মুক্ত করে দেয় বৃটিশ উপনিবেশের পথ। এই পরাজয় ইউরোপের কাছে এশিয়ার পরাজয়।

পলাশীর প্রান্তরে এদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বৃটিশদের হাতে চলে যাবার পর এদেশের ইতিহাস হলো বৃটিশদের হত্যা, লুণ্ঠন, আর প্রবঞ্চনার ইতিহাস। এ কাজে ইন্ধন ও সাহায্য-সহযোগিতা করেছে কোম্পানীর ও সরকারের অনুগ্রহপুষ্ট দেশীয় বাবুদের দল। তারা মনে করতো, তারা স্বাধীনতা হারায় নি। তাদের প্রভু বদল হয়েছে মাত্র। সুতরাং নতুন প্রভুদের সেবা ও মনস্তুষ্টির মাধ্যমে অন্তরে বাহিরে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিতে হবে।

দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার ফল লাভ করেছে পূর্ণ মাত্রায়। আর তাহলো এই যে, দেশের জমিদারী জোতদারী আসল মালিকদের কাছ থেকে নিয়ে তাদেরকে দেয়া হয়েছে চিরকালের জন্য। উত্তরাধিকার সূত্রে ভোগের জন্য সিরাজকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য মীরজাফরের সাথে যে শর্ত হয় তা পূরণ করতে গিয়ে বাংলার রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়ে।

মীরজাফর ক্ষমতা গ্রহণের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ব্যাপক ক্ষমতার মালিক হয়ে পড়ে। তারা যাকে ইচ্ছে ক্ষমতায় বসাতো আবার যাকে ইচ্ছে ক্ষমতা থেকে সরাতে পারতো। ১৭৫৭ সন থেকে ১৭৬৫ সন পর্যন্ত কোম্পানী ও তাদের লোকজনদের পকেটে প্রায় ৬৩ লাখ টাকা যায়। পলাশীর বিপর্যয়ের পর বিপুল অর্থ সাগর পারে পাচার হয়ে যায়। এর কোন হিসেব নেই। ১৭৫ থেকে ১৭৮০ সন নাগাদ মাত্র ২৩ বছরে বাংলা থেকে ইংল্যান্ডে চালান হয়ে যায় ৩ কোটি ৮০ লাখ পাউন্ড।

কোম্পানীর শোষনেণর নতুন নতুন পন্থা বের হতে থাকে। দ্বৈত শাসন, কৃষি কাজ, কুটির শিল্প ধ্বংস করে দেয়া, কৃষকদের নীল চাষে বাধ্য করা, কুটির শিল্প, তাঁত শিল্প বন্ধ করে দেয়ার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড ভেঙে দেয়া হয়। ফলে দেখা যায় '৭৬-এর মনন্তর। এতে বাংলার এক তৃতীয়াংশ মানুষ প্রাণ হারায়। কিন্তু তাতেও রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে কোন অনুকম্পা প্রদর্শিত হয়নি। বরং আরো বেশী রাজস্ব আদায় করা হয়েছে। আর তা আদায় করেছিলো কলকাতার হিন্দু জমিদার ও ব্যবসায়ী শ্রেণী। আধিপত্যমূলক মিত্রতার অধীনে গ্রাস করা হয় মুসলিম দেশীয় রাজ্য গুলো। ঐতিহাসিকদের মতে, যে বাংলায় এসে ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারেনি সে পাগল ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু সেই বাংলা ইংরেজ ও তার দোসররা শ্মশানে পরিণত করে ফেলে।

সিরাজদ্দৌলা বাংলার মানুষের স্বাধীনতার প্রতীক আজ ২৪০ বছর পর জাতি আবার নতুন করে স্মরণ করছে সে বিয়োগান্ত ঘটনাগুলো। আমরা কি বিদেশীদের হাত থেকে আমাদের স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে পেরেছি। দেশকে শোষণের হাত থেকে কি

www.pathagar.com

দিয়ে যারা দেশপ্রেমিককে শ্রদ্ধা করতে দেন না, আমাদের তা থেকে বিরত রাখতে চান তারা আসলেই দেশের স্বার্থে কাজ করছেন না। সিরাজদ্দৌলাকে লুটেরা বলছে কারা? বলেছে ইংরেজরা, তাদের ভাড়া করা ঐতিহাসিকরা এবং মীরজাফরের উত্তরসুরি বুদ্ধিজীবীরা। তাদের কাছে সিরাজদ্দৌলা লুটেরা ছিলেন। কিন্তু সিরাজদ্দৌলা লুণ্ঠন করে সম্পদগুলো কোথায় নিয়ে গিয়েছিলেন? ক্লাইভের মতো সাত সমুদ্র তের নদীর ওপারে? না মীরজাফরের মতো সম্পদ লুণ্ঠন করতে গিয়ে দেশের স্বাধীনতা বিকিয়ে দিয়েছিলেন? সিরাজ তা করেননি। সিরাজ যা করেছেন সে সম্পর্কে ইংরেজ ঐতিহাসিক বলেছেন যে, সেদিন পলাশীর মাঠে মাত্র একজন মানুষ সকল সর্বনাশের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন সে লোকটি কখনো তার দেশকে বিক্রি করেননি। তিনি তার প্রভুর সাথে কখনো বেঈমানী করেননি। সে মানুষটির নাম সিরাজদ্দৌলা।

বন্ধুরা আমার, সিরাজদ্দৌলার সময় পরিবেশ যেমনি কলুষিত হয়েছিলো এবং পলাশীর বিপর্যয়ের পূর্বে বাংলায় যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিলো তা আজও এদেশে বিদ্যমান। সেদিন বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে চক্রান্ত হয়েছে দেশের বাইরে, দেশের ভেতরে। আজও তাই হচ্ছে। আজও দেশের বুদ্ধিজীবীরা শয়তানের কাছে আত্মা বিক্রি করে দিয়েছে যেমনটি দিয়েছিলো সেদিন ক্লাইভ ও মীরজাফরের কাছে। পলাশীর বিপর্যয়ের পর বাংলাদেশের মানচিত্রে যে শহরটির নাম কলকাতা যা আমরা হারিয়েছি সেদিন সে শহরে বিজয় মিছিল হয়েছিলো। সারা দেশের কোটি কোটি মানুষ কাঁদছেন বেদনায়। আর কলকাতায় আনন্দ উল্লাস হচ্ছে। সেই শহরে বসে আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের চক্রান্তের তরবারীগুলো শানানো হচ্ছে। বঙ্গভূমি লেলিয়ে দেয়া হয়েছে আমাদের হৃদপিন্ডের দিকে। লেলিয়ে দেয়া হচ্ছে শান্তিবাহিনীকে আমার স্বাধীনতার দিকে, আমার বুকের রক্ত, আমার হৃদপিন্ড, আমার বাংলাদেশকে কেড়ে নেয়ার জন্য। এখন চাচ্ছে বাংলাদেশের বুকের উপর দিয়ে করিডোর। এই করিডোরের অর্থ কি? উত্তর ভারতে যে স্বাধীনতা সংগ্রাম চলছে, একটি মুক্তিকামী মানুষ হিসেবে যারা মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন হয়েছে, সে দেশের মানুষকি অন্য আরেকটি দেশের স্বাধীনতা দমনের জন্য জায়গা দিতে পারি। তার ট্যাংক চলাচলের জন্য জায়গা দিতে পারি। অথচ তা দেয়ার কথা আমরা বলছি।

পানি চুক্তির নামে বাংলাদেশের একটি অংশকে শুকিয়ে মরুভূমি বানানো হচ্ছে। কারবালার মাতম শোনা যাচ্ছে আজকের পদ্মার বুকে। বাংলাদেশকে যারা বন্ধু মনে করে, বাংলাদেশকে যাদের বন্ধুত্বের দাবী করে তারা যদি আমাদের বন্ধু হয় তাহলে কেন পার্বত্য বাংলাদেশে প্রতিদিন হত্যাকান্ড ঘটে। কেন বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা কোলকাতায় গিয়ে বলে যে, বাংলাদেশে সেনাবাহিনীর প্রয়োজন নেই। কেন তারা সেখানে গিয়ে বলেন, ৪৭-এর পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতে হবে। ৪৭-এর পূর্বাবস্থায় যদি ফিরে যেতে হয় তাহলে আমার স্বাধীন বাংলার অস্তিত্ব কোথায় থাকবে? আমার পতাকার কি হবে? আমার লক্ষ লক্ষ শহীদের কি হবে। এর জবাব আমার বন্ধুদের জানা নেই। কিন্তু তারা এটা করতে চান, চক্রান্ত হচ্ছে নানা ভাবে। তারা আমাদের চলচ্চিত্রকে ধ্বংস করার জন্য মুক্তবাজারের ফাঁদ দিয়ে প্রতিদিন শত শত ভারতীয়

www.pathagar.com

অভিনেতা-অভিনেত্রী আমদানী করছে। বাংলাদেশের বইয়ের বাজার ভারতীয় উপনিবেশে পরিণত হয়েছে। আমার ছেলে-মেয়েরা আমার দেশে বসে আমাকে ঘৃণা করার শিক্ষা পাচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর হাজার হাজার ছেলে-মেয়ে ভারতে পড়ার জন্য চলে যাচ্ছে এবং যাতে তারা চলে যায় সে জন্য আমাদের শিক্ষাঙ্গনকে ধ্বংস করার জন্য কুরুক্ষেত্র বানিয়ে রাখা হয়েছে। মেডিকেল কলেজ, বুয়েট, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে রণক্ষেত্রে পরিণত করা হয়েছে। প্রতি বছর ২৫ হাজার বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীকে ভারতে লেখা পড়া করার জন্য সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে। শিল্প ধ্বংস করার জন্য ভারতীয় শাড়ী আসছে। এখন কৃষি ধ্বংস করার জন্য আসছে পিঁয়াজ, মরিচ। কোথাও কোন সুস্থ নিঃশ্বাস ফেলার জন্য বাংলাদেশের মুক্ত হৃদয়গুলো সুযোগ পাচ্ছে না। এই দুর্বিষহ দুঃসহ অবস্থা ১৭৫৭ সালের পলাশীর বিপর্যয়ের পূর্বকথা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সেদিন এবং আজকেও গুপ্তহত্যা চলছে। সেদিনও গোপনে গোপনে দেশপ্রেমিকদের হত্যা করা হতো। আর আজকেও গুপ্তহত্যা ঢাকার রাস্তায় রাস্তায় দেখতে পাচ্ছি। মানুষকে বিভিন্নভাবে ছেলে ধরার নাম করে গণপিটুনী দেয়া হচ্ছে। সর্বদিকেই চক্রান্ত হচ্ছে। সব মিলিয়ে বিষাক্ত জার্ম-এর মধ্যে বাংলাদেশকে নিক্ষেপ করা হয়েছে। ঠিক যেমন হিটলারের গ্যাস চেম্বারে মানুষকে তিলে তিলে হত্যা করা হয়েছিলো তেমনি আমাদেরকে স্লো পয়জন দিয়ে আমাদেরকে মগজ ধোলাই করা হচ্ছে। আমাদের বিবেককে বিক্রি করতে বাধ্য করা হচ্ছে। যারা দেশের জন্য, স্বাধীনতার জন্য কথা বলছেন তাদের জন্য নেমে আসছে নানা লাঞ্ছনা। যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলো তাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শিবিরে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। আর যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়নি তাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের হিরো হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। এই গভীর চক্রান্ত সম্পর্কে জাতিকে সচেতন করার বোধ আমাদের বিবেককে তাড়া দিয়েছিলো। আমাদের বিবেককে পীড়ন করেছিলো, আমাদেরকে মানসিক কষ্ট দিয়েছে। তা না করলে মানুষ জানবে কি করে যে তার স্বাধীনতা, তার ভবিষ্যত আজ বিপর্যস্ত। সে দায়িত্ব আমরা সবিনয়ে সম্পাদিত করেছি। একটি ঐতিহাসিক র‍্যালী হয়েছে ঢাকার রাজপথে। আমরা র‍্যালী শুরু করলে ঢাকাবাসী আমাদের সাথে যোগ দেয়। সেজন্য তাদেরকে মোবারকবাদ। আমরা ষড়যন্ত্রকারীদেরকে র‍্যালীতে দেখিয়েছি যে দেশবাসী বিশ্বাসঘাতকদের চিনে রাখে। কারণ বিশ্বাসঘাতকরা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। এদের শিকড় এখন কেটে না দিতে পারলে দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হবে। আমরা একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করেছি। আমাদের আরো কিছু প্রোগ্রাম আছে। আজকের অনুষ্ঠান তার অংশ। যদি বাংলাদেশ সত্য হয়, যদি আমাদের চেতনার মধ্যে কোন পাপ না থাকে তাহলে সফল আমরা হবোই। আসুন, আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ হই দেশের স্বার্থে, স্বাধীনতার স্বার্থে। দেশ বাঁচলে আমরা বাঁচবো দেশ না বাঁচলে আমরা কেউ বাঁচবো না।

www.pathagar.com

মীরজাফরের বাড়ীর নাম নিমক হারামের দেউড়ী

ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী

লোক সাহিত্যিক ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী বলেন, আমরা বিশ্বাস করছি আজ সিরাজদ্দৌলাসহ পলাশীর সকল শহীদদের আত্মা আমাদের জন্য দোয়া বর্ষণ করছে। কিছুদিন পূর্বে আমি মুর্শিদাবাদে গিয়েছিলাম। মনে হলো ধন্য মুর্শিদাবাদ। কারণ সেতো সিরাজেরই মুর্শিদাবাদ আমি হাজার দুয়ারী দেখলাম। কিন্তু তাতে তার কোন ঐতিহ্য দেখতে পেলাম না। দেখলাম ইমামবাড়া, খুবই করুণ অবস্থায় আছে ইমামবাড়া। মনে খুবই কষ্ট পেলাম। না ডাকতেই কিছু গাইড এসে বললো, হিন্দুদের মন্দির ভেঙ্গে এই ইমামবাড়া তৈরী করা হয়েছে। সাথে সাথে প্রশ্ন জাগলো প্রায় এক মাইল জায়গা নিয়ে তৈরী ইমামবাড়ার জন্য কতটি মন্দির ভাংতে হয়েছিলো। গাইড রেগে গেলো। আমার সাথের লোকেরা বললো এরা বিজেপির লোক। এদের সাথে তর্ক করবেন না। সেখানে এখন মীরজাফর এবং ক্লাইভদেরকে বড় করে দেখানোর চেষ্টা চলছে।

আমরা পরের দিন খোশবাগে গেলাম নবাব আলীবর্দী খান আর নবাব সিরাজদ্দৌলার মাজার দেখতে। কিন্তু মাজারের করুণ অবস্থা দেখে আমরা কেউই চোখের পানি রাখতে পারলাম না। তবে একথা সত্য যে, সেখানকার লোকেরা এখনো মীরজাফর, ঘষেটি বেগমদেরকে ঘৃণার চোখে দেখে। ইংরেজরা যে ইতিহাস লিখেছে তা পশ্চিম বঙ্গের কেউই বিশ্বাস করে না।

তিন মাস আগে আমার কাছে পি.এইচ.ডি'র একটা থিসিস আসে নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি থেকে। নাম বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও স্বাধীনতা সাহিত্য। এখানে দেখলাম সিরাজদ্দৌলার চরিত্রকে অত্যন্ত উন্নত করে দেখানো হয়েছে এবং যারা তার সম্পর্কে কুৎসিত কথা বলেছেন তাদেরকে চরম ভাষায় আক্রমণ করা হয়েছে। অতএব সিরাজদ্দৌলা যে বিশ্বাস ঘাতক ছিলেন না তা আজ শত শত বই থেকে প্রমাণিত। সিরাজ লুটেরা, বিশ্বাসঘাতক হলে সুভাস বসু, হলওয়েল মনুমেন্ট ভাংতে গিয়েছিলেন কেন? তিনি কি নেতা ছিলেন না? চিত্তরঞ্জন কেন ধিক্কার জানালেন? আমাদের মহান পিতা শের-এ-বাংলা একে ফজলুল হক কেন তার কথা বার বার বলতেন? এবার পশ্চিম বঙ্গের সিপিএম সরকার কলকাতায় সিরাজদ্দৌলা দিবস পালন করবে। মুর্শিদাবাদেও পালিত হবে। একথা সত্য হলে যারা সিরাজকে নিয়ে কটূক্তি করছেন আমার মনে হয় তাদের লজ্জিত হওয়া উচিৎ। সিরাজকে যে জায়গায় হত্যা করা হয়েছিলো তা আমি দেখতে গিয়েছিলাম। আগে সেখানে ঘর ছিলো। এখন তাও নেই। মানুষ জায়গাটি দেখতে আসে। যাবার সময় মাটি নিয়ে যায়। সঙ্গে রাখলে নাকি রোগ-শোক ভালো হয়। আর মীরজাফরের বাড়ীর নাম হলো নিমক হারামের দেউড়ী। সেখানে একটি কাঠও নেই। কেউ সেখানে থাকেও না। তার কবরটি দেখতে গেলাম।

www.pathagar.com

এক বৃদ্ধ বললেন, মীরজাফরের কবরে প্রস্রাব করা হয়। আমি কথাগুলো এজন্য বললাম যে, যারা সিরাজকে অহেতুক কথা বলেন তাদেরও তো অবস্থা একদিন এমন হতে পারে। শেষ করার আগে আমি সিরাজের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

ষড়যন্ত্রকারীদের বুকে কাঁপন ধরিয়েছি

কবি আল মাহমুদ

কবি আল মাহমুদ বলেন, আপনারা জানেন আজকের এ আলোচনা সভাটি গত ২৩ জুন বিকেল চারটায় হবার কথা ছিলো। কিন্তু যারা পলাশী দিবস পালনে তটস্থ, পালানোর পথ খুঁজে পাচ্ছিল না তারা এদিন একটা বিরোধ, একটা সংঘর্ষ বাঁধানোর চেষ্টা করেছিলো। আমরা তা এড়ানোর জন্য আলোচনা সভার সময় পরিবর্তন করি। পলাশী দিবস পালনের পরিকল্পনা যখন হয় তখন আমরা কল্পনাও করতে পারিনি যে, এত গুরুত্বের সাথে এবং গভীর তাৎপর্য নিয়ে দিবসটি পালিত হবে। আসলে আমরা বঙ্গ বিজয় ও পলাশী দিবসকে সার্থকভাবে পালন করতে পেরেছি। এই মহানগরীর প্রতিটি মানুষের তাদের অন্তরের চাপা পড়া স্বাধীনতার উল্লাস সমুদ্রের গর্জনের মতো বেরিয়ে এসেছে। বলতে পারেন এখানে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যত সাংস্কৃতিক ষড়যন্ত্র কর্মকান্ড হয়েছে তা এক ফুৎকারে নিভে গেছে। মানুষের হৃদয় স্পর্শ করতে পারলাম না। শুধু নাচলাম আর গাইলাম। হিসেব দিলাম না এর নাম সংস্কৃতি নয়। সংস্কৃতি হলো তাই যা বার বার ফিরে আসে এবং একটা নিরন্তর পানির মতো বুকের ভেতর দিয়ে উড়াল দেয়ার বার বার সুযোগ করে দেয়। আমরা সেগুলোই করছি। আমরা এবার একটি ঐতিহাসিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি করে স্বাধীনতা নস্যাতের ষড়যন্ত্রকারীদের বুকে কাঁপন ধরিয়েছি। তার প্রতিক্রিয়াও লক্ষ্য করা গেছে। আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী সংসদে দাঁড়িয়ে বলেছেন সিরাজ অবাঙ্গালী ছিলেন। তাহলে সিদ্দিকীটা আসলো কোত্থেকে? আপনি কি আব্দুল লতিফ ভারতী। আসলে এভাবে আমরা তাদেরকে ধরিয়ে দিচ্ছি। অনেক রাজনীতিকের আসল চেহারা শোকর‍্যালীর পর ফুটে উঠেছে। আমরা মীরজাফর, জগৎ শেঠ, রায় দুর্লভদেরকে চিনিয়ে দিয়েছি। তাদের চেহারা জনগণকে দেখিয়ে দিয়েছি। তাই আজ আর লুকানোর পথ নেই। অনেকে মুক্তিযোদ্ধা না হয়েও মুক্তিযোদ্ধা সেজেছে। এখন আমরা তাদেরকে জনসমক্ষে তুলে ধরবো। যেদিন আমরা মেজর জলিলের মৃত্যু দিবস পালন করবো সেদিন তাদের মুখোশ তুলে ধরা হবে। তারা ইতিহাস তুলে ধরার কথা বলে। আমরা পাল্টা ইতিহাস তুলে ধরলাম মাত্র। তাতেই ভূমিকম্প হয়ে গেলো। আমরা অর্থাৎ এদেশের মানুষ স্বাধীনতা চাচ্ছি। পৃথিবীর কোন ক্ষমতাই আমাদেরকে পরাধীন করতে পারবে না। আমাদের কোন পরাজয় নেই।

www.pathagar.com

তাদের আর্থিক ক্ষমতা ছিলো ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের আর্থিক ক্ষমতার তুল্য। জগৎশেঠের প্রতিনিধির মাধ্যমে বাংলার রাজস্ব জমা হতো দিল্লীতে। আর সে থেকেই তারা কিং মেকার হয়ে উঠে। সুজাউদ্দৌলা তার পুত্র সরফরাজ খানকে সাহায্য করার জন্য যে তিনজনকে নিয়ে একটি কমিটি করেন তার দুজনই ছিলো এই পরিবারের। মাত্র একজন ছিলেন মুসলমান। তারাই ডেকে এনেছিলেন সরফরাজ খানের পরিবর্তে আলীবর্দী খানকে। আলীবর্দী খানের যোগ্য শাসনে তারা কিছুকাল নিষ্ক্রিয় থাকলেও অন্যদিকে তারা হাত বাড়িয়েছিলো আর যে হাত হলো ইংরেজদের। যে নন্দ কুমারের কথা আমরা শুনি, বা যে রাজা মহেন্দ্রের কথা আমরা শুনি তার সাথে ইংরেজদের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৩৫ সালে। ১৭৫০ সালে ক্লাইভের সাথে গভীর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা হয় জগৎশেঠের। এরপরে হয় মীরজাফরের সাথে ১৪ দফা চুক্তি। তাতে বলা হয় কলকাতার দক্ষিণাংশে মুররা (মুসলমানরা) কোন কিছু নির্মাণ করতে পারবে না। অর্থাৎ যুদ্ধটা হয়েছিলো মুসলমানদের বিরুদ্ধে। আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে মীরজাফর ছিলেন সেদিন জগৎশেঠদের দলে। পলাশীর যুদ্ধ হয়েছিলো মুসলিম রাজশক্তির বিরুদ্ধে। মুসলিম রাজশক্তির বিরুদ্ধে ১৭২৭ সালের পর থেকে যে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিলো তা আজো অব্যাহত রয়েছে। সে কারণে আমি বলতে চাই মীরজাফরদের উত্তরাধিকারীরা জগৎশেঠদের সাথে নিয়ে এখনো সক্রিয় রয়েছে। তাই সংসদে দাঁড়িয়ে কেউ যদি বলে, সিরাজ কি বাঙালী ছিলো। তা আপনারা যেভাবে বুঝতে চেষ্টা করেন, আমি সেভাবে করি না। কারণ তিনি সাধারণ লোক নন, তিনি একজন রাজনীতিক। তাই রাজনীতি দিয়েই তাকে বুঝতে হবে। তারা বাঙালী বলতে বুঝাতে চান হিন্দুকে। আর সে কারণে বাঙালী হবার অর্থ হিন্দু হওয়া। সে জন্যই কপালে টিপ, অগ্নিপূজা, আর সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালাতে নির্দেশ দেন, তার চর্চা করেন। আর আপনারা যদি তাকে সাহিত্যিক অর্থে বুঝাতে চান তাহলে ঠিক হবে না। কারণ তারাও তা বুঝাতে চাননি। আমাদেরকে বুঝতে হবে, ১৯৯৭ সালে দাঁড়িয়ে ১৭৫৭ সালকে। আর ভারত ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর ভূমিকায় নেমেছে কিনা। যদি তা বুঝতে পারি তাহলেই আজকে আমরা যে ছবি দেখছি তার মর্ম উপলব্ধি করতে পারবো।

আমাদের একটা আনন্দ পাবার কারণ আছে, আর তা হলো সংসদে জনৈক সাংসদের সেই মন্তব্য। আর তা এই কারণে যে ৩/৪ বছর ধরে আমরা সিরাজদ্দৌলার যে মৃত্যুদিবস পালন করছি তার বার্তা তাদের কাছে চলে গেছে। আর এটাই আমাদের সার্থকতা। আর শক্তভাবে এই বার্তা পাঠানোর জন্য আমি উদ্যোক্তাদেরকে অনুরোধ করছি। আমি আরো আবেদন জানাবো শিখা চিরন্তনের নামে আমাদেরকে অগ্নিদেবতার কাছে নিয়ে যাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। তার পাল্টা স্বরূপ আগামী ২৩ জুন থেকে ৩ জুলাই পর্যন্ত সিরাজদ্দৌলার মুকুট নিয়ে টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত সফর করতে পারি তার ব্যবস্থা করতে। আমরা এই মুকুট হাতে নিয়ে দেখিয়ে দিতে চাই, আমাদের এই মাতৃভূমিকে, বাংলাদেশকে বাঙালীর হাতেই রাখবো। এই বাঙালী মানে হচ্ছে আমরা

www.pathagar.com

যারা বাঙালী তারা। যে বাংলা সৃষ্টি করেছে মুসলমান নবাবরা। সে বাংলার বাঙালী আমরা। সে বাঙালীর কথা আমাদের দেশের চাকমারা জানে অথচ আমাদের দেশের মুসলমানরা জানে না। আপনারা পার্বত্য চট্টগ্রামে গিয়ে চাকমাদের যদি বলেন, তুমি বাঙালী হও, তা হলে সে ভাববে আমাকে মুসলমান হতে বলছে। সে জন্যই শেখ সাহেব তাদেরকে বাঙালী হতে বললে তারা বললেন, আমরা তো হিন্দু, আমরা কেন বাঙালী হবো? তাই সিদ্দিকী সাহেবকে বলতে চাই, আগে বাঙালী শব্দের অর্থ বুঝুন এবং কোথায় সত্য আছে তা দেখুন। বাঙালী মানে হিন্দু নয় মুসলমান তা বুঝে তার পর প্রশ্ন করুন যে সিরাজ বাঙালী না অন্য কিছু।

ঐতিহাসিকরা তার চরিত্রকে কলংকিত করেছে

——————— খান আতাউর রহমান

বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা খান আতাউর রহমান বলেন, নবাব সিরাজদ্দৌলাকে কলংকিত হিসেবে চিত্রিত করেছেন কিছু ঐতিহাসিক। যেমন ডঃ আর সি মজুমদার। তবে আর একজন হিন্দুই সিরাজদ্দৌলার চরিত্রকে মহিমান্বিত করেছেন। তিনি হলেন অক্ষয় মৈত্র। আমি উভয়ের লেখা বই-ই খুব মনোযোগের সাথে পড়েছি। আমি অনেক ইংরেজ ঐতিহাসিকদের লেখা বইও পড়েছি। কিন্তু তাতে সিরাজকে মদ্যপ বা নারী-লিপ্সু হিসেবে দেখানো হয়নি। এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, ক্ষমতা লাভের পর সিরাজ মদ পান করেননি। অবৈধ নারী সংস্পর্শে যাননি। তিনি তার নানার এ সম্পর্কিত নির্দেশ আমৃত্যু মেনে চলেছেন। অথচ ঐতিহাসিকরা তার চরিত্রকে চরমভাবে কলংকিত করেছে। সিরাজ ব্যক্তিগত জীবনে খুবই দয়ালু ছিলেন। আহাররত অবস্থায় তিনি খবর পেলেন, সওকত জঙ্গ মারা গেছেন মোহন লালের হাতে। বিদ্রোহ দমনের সময়। তিনি আর ভাত খেতে পারলেন না। না খেয়ে উঠে গেলেন। এটাইতো মানবতাবোধ।

মোহন ছিলেন হিন্দু মহারাজা, সিরাজ তার সাথে মিলে একত্রে ১৬/১৭ বছর বয়সে যুদ্ধ করেছেন মারাঠা বর্গীদের বিরুদ্ধে। তারা আমাদের ধন সম্পদ লুণ্ঠন করতো। নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করতো। তারা আজ আমাদের প্রতিবেশী দেশের বীর। তাদের সমর্থক হয়েছেন আমাদের প্রতিবেশী দেশের গুরুদেব। সুতরাং এই যে বিপরীত ইতিহাস লেখা এ ব্যাপারে আমাদের সচেতন থাকতে হবে। আমরা কি তা আছি। আমরা অবচেতন মনে রয়ে গেছি। এটাকে জাগাতে হবে। বিষয়টি উপলব্ধি করতে হবে। সিরাজের মতো হতে হবে। তিনি যখন মুর্শিদাবাদ থেকে পালিয়ে যান তখন তার মা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথায় থাক, কেমন থাক জানবো কি করে? উত্তরে বললেন, মা, তুমি যেখানে দেখবে একজন রাখাল হাতের লাঠি নিয়ে বৃটিশের বন্দুকধারী সৈন্যের সাথে লড়াই করছে সেখানেই আমি থাকবো। এই যে বার্তা আমরা

www.pathagar.com

তার কাছ থেকে পেয়েছি তাতে প্রত্যেক লোকের মাঝেই সিরাজের আত্মা লুকিয়ে আছে। তা ঘুমিয়ে আছে। তাকে জাগ্রত করতে হবে। জাগ্রত করতে হবে এই ভাবে যে, আমি সিরাজের বংশধর। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের লোক। এই চেতনায় থাকলে আস্তে আস্তে আমরা সচেতন হবো। সবাই বলবো আমরা বাংলাদেশী মানুষ। অন্য কোন দেশ আমাদের দখল করতে পারবে না।

আমাদের মানুষ আজও জাগেনি

আবুল আসাদ

সাংবাদিক আবুল আসাদ বলেন, ২৩ তারিখ এই অনুষ্ঠানটি না হবার জন্য আবদুল হাই শিকদার তার উদ্বোধনী ভাষণে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আমি বিষয়টিকে অন্যভাবে দেখি। আসলে ২৩ জুন পলাশীতে মীরজাফর বা ক্লাইভের জয় হয়েছিলো। কিন্তু বাংলার পরাজয় সম্পূর্ণ হয়নি। পলাশীর যুদ্ধ পূর্ণতা লাভ করেনি। যে দিন সিরাজ শহীদ হলো কেবল সেদিনই বাংলার পরাজয় ঘটে। পলাশীর যুদ্ধের সমাপ্তি সেদিনই ঘটেছিলো। অতএব আমার মনে হয়, ২৩ জুনের আলোচনা সভায় যারা বাধা দিয়েছিলেন তারা কিছুটা হলেও উপকার করেছেন। সিরাজের শাহাদাতের এই আলোচনাটি আমার কাছে বেশী যুক্তিসংগত বলে মনে হচ্ছে। তাই আমাদের ক্ষোভের কিছুই নেই।

কিছুদিন আগে আমাদের এক বুদ্ধিজীবী বলেন, ভারতের সাথে আমাদের সেনা বাহিনী ছ' ঘন্টাও টিকতে পারবে না। অতএব আমাদের সেনাবাহিনীর দরকার নেই। কিন্তু সে কেন বলে না যে ভারতের সাথে ছ' বছর আমাদের সেনাবাহিনী টিকে থাকতে পারে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। তার দাবীতো এটাই হওয়া উচিত ছিলো যে, আমাদের সেনাবাহিনী আরো বড় করে গড়ে তোলা হোক। কিন্তু তা না বলে বললেন, সেনাবাহিনী বাতিল করা হোক। তাই প্রশ্ন, তিনি কোন দেশকে ভালবাসেন? আমাদের দুঃখের বিষয় আমাদের মানুষ আজও জাগেনি। তারা বুঝতে পারছে না যে কোথায় কি ঘটছে। তথাকথিত বুদ্ধিজীবী তাদের কাছে সম্মান সর্বদা পান। কিন্তু তারা বুঝতে পারছেন না যে এরা নতুন মীরজাফর, জগৎ শেঠ। তা না হলে তো তারা আমাদের সেনাবাহিনী কমানোর কথা বলতে পারেন না। এটা আমাদের খুবই বেদনার কথা। তাই তাদেরকে জাগতে হবে। তা না হলে জাতির উপর যে কালো থাবা বসেছে তা থেকে রেহাই পাবার কোন উপায় নেই। জাতিসংঘও আমাদের রক্ষা করতে পারবে না। কারণ সে কেবল সবলের পক্ষ অবলম্বন করে। এ পর্যন্ত সে কোন দুর্বলকে গ্যারান্টি দেয়নি। কাশ্মীর তার প্রমাণ। সেখানে আজও মানুষ মরছে। স্বাধীনতাকামীরা নিহত হচ্ছে। কিন্তু জাতিসংঘ তার কোন ফয়সালা আজও করেনি। যে জাতিসংঘ একটি প্রতিশ্রুতি পালন করতে পারে না, সে জাতিসংঘ আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে না। অতএব আমাদের শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করতে হবে। আমাদের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা আমাদেরকেই করতে হবে।

www.pathagar.com

সিরাজ স্বাধীনতার সঞ্জীবনী শক্তি

ওবায়দুল হক সরকার

অভিনেতা ওবায়দুল হক সরকার বলেন, মৃত সিরাজ জীবিত সিরাজের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী। সিরাজের ভূমিকায় অভিনয় করতে গিয়ে আমি এটা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করি। আমি যতবারই সিরাজের ভূমিকায় অভিনয় করেছি ততবারই জনগণের আকুল উচ্ছ্বাস দেখেছি। প্রথম দিকে গোটা সিরাজকেই কুৎসিত অবস্থায় পেয়েছিলাম ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সহ আরো অনেকের লেখায়। গিরিশ ঘোষ সিরাজদ্দৌলা নাটক লিখেছেন স্বদেশী আন্দোলনকে দানা বাঁধাতে। স্বদেশী আন্দোলনে প্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্য সিরাজকে স্বদেশী হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন। নাটকে কাজও হয়েছিলো। স্বদেশী আন্দোলন দানা বেধে উঠলে এক সময় বৃটিশরা নাটকটির অভিনয় নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এরপর সচিন সেনগুপ্ত লিখলেন। তাও দেখলাম। তাতে বলা হয় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এটাই প্রতীক ছিলো। পাকিস্তান সৃষ্টির পরে কবি সিকান্দার আবু জাফরও সিরাজদ্দৌলা নাটক লিখলেন। নিজস্ব ভঙ্গীতে। সিরাজদ্দৌলা এমন একটা পরশ পাথর ছিলো যে, পাথরের স্পর্শে এসে আমাদের চলচিত্র অঙ্গন চাঙ্গা হয়ে উঠলো। তিনি যে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের কত বড় সঞ্জীবনী শক্তি তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আমরা বিষয়টা নিয়ে মাথা ঘামাই না

ডঃ মঈনুদ্দীন হোসেন

আন্তর্জাতিক আইনবিদ ডঃ মঈনুদ্দীন হোসেন বলেন, জাতিসংঘ সনদের আর্টিকেল দুই এর সেকশন চার-এ যুদ্ধের মাধ্যমে কোন দেশ দখলকে বেআইনী করা হয়েছে। অর্থাৎ জাতিসংঘ গঠন করার পূর্বে বিশ্বে যে রীতি নীতি ছিলো আজ তা নেই। জাতিসংঘ সনদ এর প্রতিটি সদস্য দেশের উপর বাধ্যতামূলক। সকল দেশের আইনের উর্ধ্বে। তাই ক্লাইভরা যেভাবে এদেশ দখল করেছিলেন তা এখন আর করা সম্ভব নয়। আগে এর বিধান ছিলো। এখন তা সম্পূর্ণ অবৈধ। বিদেশে বসে যখন আমরা দেশীয় বুদ্ধিজীবীদের সাথে কথা বলি তখন মনে হয় বিশ্ব ব্যবস্থায় পরিবর্তন তাদের মাথায় ঢুকছে না।

বর্তমানে একদেশ আরেক দেশকে জয় করতে পারবে না। এর চেয়ে বড় অপরাধ আর বিশ্বে নেই। জাতিসংঘ তা কোন মতে মেনে নেবে না। আর সেজন্যই কিউবা বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ আমেরিকার কাছে বসেই তাকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে যাচ্ছে। অথচ সামান্য সময়ের মধ্যে আমেরিকা কিউবাকে দখল করে নিতে পারে। কিন্তু তা সম্পূর্ণ অবৈধ হবে বলেই সে তা করছে না। করলে তাকে জাতিসংঘ থেকে বের

www.pathagar.com

রক্ষা করতে পেরেছি? পেরেছি কি মীরজাফরদেরকে বাংলা থেকে উৎখাত করতে? না পারলে আমাদের স্বাধীনতার কি হবে!

ওপারে পলাশী এপারে আমরা। আমাদের পূর্ব পুরুষদের হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রমে গড়ে উঠা কলকাতা আমরা পাইনি। গঙ্গায় বাঁধ দিয়ে আমাদেরকে শুকিয়ে মারা হচ্ছে। আজ আমাদের দেশের উপর শকুনের ছায়া। অথচ এসব প্রতিরোধ করার শক্তি আমরা হারিয়ে ফেলেছি। ট্রানজিট, করিডোর, এশিয়ান হাইওয়ে প্রভৃতির মাধ্যমে আমাদের দেশকে ক্ষত বিক্ষত করার চেষ্টা চলছে। চোরাকারবারের মাধ্যমে আমাদের অর্থনীতিকে ধ্বংস করা হচ্ছে। আগ্রাসনের পথকে সুগম করা হচ্ছে। এসবকে মোকাবেলা করে আমাদেরকে পলাশীর পুনরাবৃত্তি রোধ করতে হবে। তা না হলে জাতি আমাদেরকে ক্ষমা করবে না।

খুঁজে বের করতে হবে সিরাজ কে নমরুদ কে?

এরশাদ মজুমদার

সাংবাদিক এরশাদ মজুমদার বলেন, সিরাজদ্দৌলা ছিলেন বাংলার মজনু। তার মৃত্যুর পর কেউই লাইলী লাইলী বলে অর্থাৎ বাংলার স্বাধীনতার জন্য চিৎকার করেনি। আজ সবে চল্লিশ বছর পর আমরা বাংলার মজনুকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, যে কেবল বলবে হায় বাংলা হায় বাংলা। কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ আমাদের সংসদে দাঁড়িয়ে জনৈক সাংসদ বলেছেন, সিরাজ কি বাংগালী ছিলেন? যিনি এই প্রশ্ন করেছেন তার পূর্ব পুরুষ বক্সারের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে এখানে পালিয়ে এসেছিলেন। অর্থাৎ তারা বিশ্বাসঘাতকতা করে বক্সারের যুদ্ধ থেকে পালিয়ে এসেছিলেন। ভালো করে খোঁজ নিলে এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে। বক্সারের যুদ্ধ থেকে যত লোক বাংলায় পালিয়ে এসেছে, বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে (তার মধ্যে আমাদের পরিবারও আছে) আত্মগোপন করেছিলেন। এমনি আত্মগোপনের জন্য পাটনা থেকে পালিয়ে বর্ধমানে এসে পীর ফকিরী বেশে বসতি স্থাপন করেছিলেন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের পূর্ব পুরুষগণ ১৭৬২ সনে। তারা তখন আসল পরিচয় দেননি। তার পূর্ব পুরুষ ছিলেন পাটনার কাজী উল কুজাত। অর্থাৎ প্রধান বিচারপতি আর নীলরতন ঠাকুর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পূর্ব পুরুষ উড়িষ্যার দেওয়ানীতে আমীনগিরির চাকুরী পেয়ে দু' পয়সা কামিয়েছেন।

বর্তমানে সিরাজের উপর ফরাসী ওলন্দাজ, বৃটেনে, নেদারল্যান্ডে, পাকিস্তানে এখনো আলোচনা হয়, গবেষণা হয়। পৃথিবীতে কিছু কিছু লোক থাকে হিরো। কিছু কিছু লোক থাকে নমরূদ, ফেরাউন। তাদেরকেও মানুষ স্মরণ করে। আবার সিরাজদ্দৌলাকেও স্মরণ করে। আপনাকে কিন্তু খুঁজে বের করতে হবে সিরাজ কে। আর নমরুদ কে। স্বদেশের জন্য যুদ্ধ করে পরাজিত হয়ে রাক্ষস হিসেবে খ্যাতি পেয়েছেন

www.pathagar.com

রাবণ। আর দেবতা হয়েছে রাম। আর সে কথা মেনে নিয়েই আমাদের ভাইরা রামায়ণ পাঠ করেন। তাহলে রাজাকার কারা? যারা রামের পক্ষে বক্তব্য রেখে রামায়ণ লিখেছে। রামকে তারা হিরো বানিয়েছে। রাম কে? রাম হলেন সে-ই যিনি রাবণের বাড়ি থেকে সীতা ফিরে আসবার পর তার সতীত্ব পরীক্ষার জন্য অগ্নি পরীক্ষার কথা বলেছিলেন। অথচ তিনি জানেন না আজকে আমরা যারা রাবণ হয়ে যাচ্ছি তারা এদেশের শতকরা ৯০ ভাগ। আমাদের কাছে সিরাজ দেশপ্রেমিক।

ইংরেজ ঐতিহাসিকদের মতে, পলাশীর যুদ্ধে একটি মাত্র হিরো। আর তিনি হলেন নবাব সিরাজ। কারণ তিনি তার দেশের জন্য ২৩ বছর বয়সে নিজেকে উৎসর্গ করেন। ১৯৮৬ সনে যখন আমি প্রথম পলাশী দিবস পালনের আয়োজন করি তখন মানুষ আমাকে পাগল বলতে শুরু করে। আবার কেউ কেউ বলেন, শেখ মুজিবকে ডুবানোর ভালোই ব্যবস্থা করেছেন। আসলে দেশপ্রেমিকদের মধ্যে যদি রাক্ষসের ভূত ঢোকে তখন আর দেশপ্রেমিক খুঁজে পাওয়া যায় না। অনুষ্ঠানের আয়োজকদের অনুরোধ করবো Battle of Palashi নামে একটি ছবি তৈরী করতে।

মাদ্রাজে ক্লাইভ কিছু করতে পারেনি। সে ছিলো দুষ্ট। উকিল বাপ তার উৎপাত থেকে বাঁচার জন্য বন্ধুর মাধ্যমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীতে চাকুরী দেন। এসে উঠেন মাদ্রাজে। প্রথমেই তিনি তার ক্যাপ্টেনের গায়ে হাত তুলেন। অতএব সেখানে থেকে তাকে বাংলায় পাঠানো হলো। সেখানে সে বাংলার ক্ষমতা কুক্ষিগত করলো। সম্পদ আত্মসাৎ করলো। সে অপরাধেও বৃটেন পার্লামেন্ট তার লর্ড খেতাব কেড়ে নিলো। যখন তার বিরুদ্ধে বিল পাশ হয় তখন তিনি কাকুতি-মিনতি করে জানালেন যে, সবকিছু কেড়ে নেয়া হোক শুধু লর্ডশীপটা ছাড়া। তারা বললেন, এমন একজন চোরের সাথে আমরা সম্পর্ক রাখতে চাই না। আজ যারা সে ক্লাইভ প্রেমে মত্ত তারাই রাবণকে রাক্ষস বলে, জিয়াউর রহমানকে রাক্ষস বলে, কাজী নজরুল ইসলামকে রাক্ষস বলে। আর বলে কবিগুরু তোমার চরণতলে দেহ আমায় ঠাঁই। অথচ ইসলামে বিশ্বাসী ব্যক্তির কারো কাছে মাথা নোয়ানোর বিধান নেই। যদি সত্যিই অন্তরে বিশ্বাস করেন আপনি মুসলমান তাহলে আপনি কারো কাছে মাথা নোয়াতে পারেন না। আপনি মুসলিম হলে অশিক্ষিত হতে পারেন না। জালেম হতে পারেন না। আপনি প্রকৃত মুসলমান হলে আল্লাহর রহমত আপনার উপর আছে। ভয়ের কোন কারণ নেই। এখানে যারা উপস্থিত আছেন তাদের কাছে আমার অনুরোধ, যদি ধমনীতে ইসলাম থেকে থাকে তবে তা রক্ষার প্রথম দায়িত্ব আপনাদের। সিরাজই একমাত্র ব্যক্তি যে নিজ দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছে। অথচ আপোষ করলে অনেক সুযোগ-সুবিধা পেতেন।

www.pathagar.com

সিরাজের মৃত্যুর প্রয়োজন ছিল

ডঃ রেজওয়ান সিদ্দিকী

ডঃ রেজওয়ান সিদ্দিকী তার আলোচনায় বলেন, যারা এই আলোচনা সভার আয়োজন করেছেন তারা জাতির ক্রান্তিকালে একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছেন। তাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। পলাশীর ট্রাজেডী ও তার পূর্বাপর অবস্থা এবং আজকের বাংলাদেশ, সত্যি সত্যিই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এদেশকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে তুলে দেয়ার জন্য এক শ্রেণীর লোক (মীরজাফর থেকে শুরু করে আরো অনেকে) ষড়যন্ত্র করেছিলো। আজকে ঠিক একই অবস্থা বাংলাদেশেও বিরাজমান। উপনিবেশবাদী ভারতীয় নতুন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এদেশে আওয়ামী লীগের শাসন চক্রান্তের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। কথা ঘুরিয়ে বলার দরকার নেই। আসুন, কোদালকে কোদাল বলি। কারণ আজকে যে শোষণের প্রেক্ষাপট, যার কারণে সিরাজকে হত্যা করা হলো, তার উদ্দেশ্য ছিলো অর্থনৈতিক সুবিধা লাভ। বাংলা বিহার উড়িষ্যায় দখল প্রতিষ্ঠা করা। এসব করার সাথে সাথেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী লাভবান হয়নি। লাভবান হয়েছিলো মীরজাফররা। আজকে যারা নবাব হয়েছে বাংলাদেশের, তারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মীরজাফর। কারণ, আপনারা দেখেছেন, শোকব্যালীর পর একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা নির্লজ্জভাবে ভারতের পদলেহনের জন্য, মীরজাফরকে হিরো বানানোর জন্য এমন সব কাজ করেছে, একজন অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ হিসেবে প্রত্যেকেই লজ্জিত হবে যেভাবে তারা সিরাজকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছে এদেশে। তাদের মতে, মিত্র ছিলো মীরজাফর, রায়দুর্লভ অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীরা। সিরাজ ছিলো ভিলেন, হিরো ছিলো তারা। ধিক্ এদেরকে এবং এদের সম্পর্ক সতর্ক থাকার সত্যি সত্যি সময় এসেছে। আপনারা লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের বাজার কিভাবে অন্যের হাতে তুলে দেয়ার চেষ্টা চলছে।

আমাদের কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, সিরাজের মৃত্যুর প্রয়োজন ছিলো ঐতিহাসিকতার প্রয়োজনে। সামন্ত প্রথা বিলোপের তাগিদে। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা বিকাশের লক্ষ্যে। আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা বিকাশের খাতিরে। কিন্তু এটা মিথ্যে কথা। যারা একথা বলেন, তারা হয় অশিক্ষিত, না হয় ভণ্ড, নতুবা মিথ্যুক, কারণ। বিশ্বের সবচেয়ে অর্থনৈতিকভাবে শ্রেষ্ঠ জাপানে রাজতন্ত্র বিদ্যমান। অর্থনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, আধিপত্য বিস্তারের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ বৃটেন, সেখানেও রাজতন্ত্র আছে। থাইল্যান্ডে রাজতন্ত্র আছে। এ রাজতন্ত্র শোষণের রাজতন্ত্র নয়। যে দেশ পরাভূত হয়েছে, যে দেশ উপনিবেশ শাসনে দলিত, লাঞ্ছিত হয়েছে সে দেশেই আজকের এই অধম পা-চাটা কুকুরের মত বুদ্ধিজীবীর জন্ম হয়েছে। এরা আগেও ছিলো, এখনো আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। থাইল্যান্ডের দিক তাকান '৭০ সালে এদের কি ছিলো? মাথাপিছু আয় ছিলো ১৬৫ ডলার। আজকে তা ২২'শ ২৪'শতে দাঁড়িয়েছে। রাজতন্ত্র দূর করতে হয়নি। এ উন্নতি নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের যে আত্মমর্যাদাবোধ, আমি সে

www.pathagar.com

স্বাধীন মানুষ, আমি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছি। মানুষ যখন পরাজিত হয় তখনই এই পা-চাটা কুকুরের জন্ম হয়, যা আজ আপনারা বাংলাদেশে দেখছেন। এত বড় একটা মুক্তিযুদ্ধের পর স্বাধীন দেশে দাঁড়িয়ে যারা সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে কুৎসা ছড়ায়, যারা তাকে শোষক লুটেরা বলে তারা আমাদের স্বাধীনতার শত্রু। এদেরকে চিহ্নিত করে এখান থেকে আমাদের আন্দোলন করা দরকার। আমি রাজতন্ত্রের মধ্যযুগীয় কাঠামোর সমর্থক নই। কিন্তু একবার পরাজিত হলে তখন প্রভুর পা-চাটা মানসিকতার জন্ম নেয়। আজকের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ভারতের পা-চাটার মানসিকতার জন্ম হয়েছে। এ মানসিকতা ভয়ংকর। এর বিরুদ্ধে আমাদেরকে এক সঙ্গে প্রতিবাদ করতে হবে, প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। যুদ্ধে যা হয়, যুদ্ধের নিয়মে স্বাধীনতাকামীরাই জয়লাভ করে। এরা সমূলেই উৎপাটিত হবে ইনশাআল্লাহ।

পলাশী রাজনৈতিক ভাগ্য বিপর্যয়ের দিন

মাসুদ মজুমদার

সাংবাদিক মাসুদ মজুমদার বলেন, আমরা যারা এ কর্মসূচী হাতে নিয়েছিলাম তারা জানতাম পলাশী একটি রাজনৈতিক বিষয়। এর মাধ্যমে রাজনৈতিক বিপর্যয় ঘটেছিলো। তারপরও আমরা কোন রাজনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করিনি। যারা মঞ্চে আছেন তাদের কাউকেই দেশবাসী রাজনীতিবিদ মনে করেন না। আমরা কিছু সাংস্কৃতিক কর্মী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সাংস্কৃতিক কর্মসূচীর মাধ্যমে ইতিহাসের সন্তানটিকে স্মরণ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সুষ্ঠুভাবে তা হলো না। আমরা একটি তীর ছুঁড়লাম। একটি ইতিবাচক ক্রিয়া করলাম। এবার আপনারা প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করুন। দেশবাসী জানুক কারা প্রতিক্রিয়াশীল। আর এটাই আমাদের প্রয়োজন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে আমাকে যারা সে ইতিহাস পড়িয়েছেন তারা কেন তা এখন ঘুরিয়ে দিচ্ছেন। এ প্রশ্নের জবাব অবশ্যই পেতে হবে।

আমরা এবার সাংস্কৃতিক কর্মীরা অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের এই মঞ্চে তুলে এনেছি। এরশাদ মুজমদার একে সফল বলেছেন। তিনি যখন এটা করেছিলেন তখন তাকে পাগল বলেছে। আমরা যখন করছি তখন লুটেরা অবাঙ্গালী বলা হচ্ছে। এদেশের রাজনৈতিক ব্যক্তিদের কাছে আমাদের আকুতি থাকবে আগামী দিনের কর্মসূচী আপনারা গ্রহণ করুন। পলাশী কোন সাংস্কৃতিক কর্মসূচীর দিন নয়। এদিন হলো রাজনৈতিক ভাগ্য বিপর্যয়ের দিন। তাই আগামী দিনে এদেশের প্রতিটি রাজনৈতিক দলের কাছে অনুরোধ থাকবে, আপনারা রাজনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করুন। আজকে যে কাফেলা আমরা রাজপথে নামিয়ে দিয়েছি তাকে যদি আপনারা অব্যহত না রাখেন তাহলে আপনারা বিশ্বাসঘাতকের দলে নাম লিখাবেন। আপনারা মীরজাফরের দল হিসেবে চিহ্নিত হবেন। আগামী দিনে প্রমাণিত হয়ে যাবে কারা এ জাতির সন্তান, স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ সৈনিক সিরাজের দল। আর কারা মীরজাফর ও গাদ্দারের দল।

www.pathagar.com

তারা যেনো মীরজাফরের পরিণতি মনে রাখে

কবি মতিউর রহমান মল্লিক

কবি মতিউর রহমান মল্লিক বলেন, মাওঃ মুহাম্মদ আলী খুব সুন্দর করে বলেছেন, আসলে হোসাইনের মৃত্যু হয়নি, মৃত্যু হয়েছে এজিদের। আজকের যে দিনটিতে আমরা এখানে আলোচনায় একত্রিত হয়েছি যে দিনটি ছিলো এমন একটি দিন যে দিনে মুহাম্মদী বেগ সিরাজদ্দৌলাকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে। সিরাজদ্দৌলা শেষ বারের মতো কাকুত-মিনতি করে বলেছে, আমাকে শেষ বারের মত দু'রাকআত নামাজ পড়তে দাও। যে মুহাম্মদী বেগকে লালন পালন করেছিলেন নবাব পরিবার। সেই মুহাম্মদী বেগ সিরাজদ্দৌলাকে দু'রাকআত নামাজ পড়তে দেয়নি। যারা সাম্রাজ্যবাদীদের দালালী করে, যারা ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে হাত মেলায় তারা মুসলমান হলেও আর এক মুসলমানকে শাহাদাতের পূর্বে নামাজও পড়তে দেয় না।

ডঃ ইকবাল বলেছেন, জ্ঞানের উৎস তিনটি, যথাঃ প্রকৃতি, ইতিহাস ও অহী বা আল্লাহর কিতাব। যারা সত্যিকার অর্থে জ্ঞান অন্বেষণ করতে চায় তাদের প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত। তাতে সত্য বেরিয়ে আসবে। আপনি আমাদের প্রকৃতির দিকে যদি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন তবে দেখবেন আমাদের নদী গুলোকে নিষ্প্রাণ করার জন্য ষড়যন্ত্র করছে কারা। আমাদের এই সবুজ শ্যামল দেশ মরুভূমিতে পরিণত করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে কারা। বইপত্রের দিকে না তাকিয়ে কেবল প্রকৃতির দিকে তাকালেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আমাদের শত্রু কারা। কারা আমাদের নদীগুলো ধ্বংস করে দিতে চায়। আর জ্ঞানের উৎস যদি ইতিহাস হয়, তাহলে সঠিক ইতিহাস উদ্ধারের কথা যারা বলেন, ঠিক তারাই সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে কথা বলার জন্য যখন আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করি তখন বাঁধার সৃষ্টি করে। আমার এক শিক্ষক চমৎকার এক ছড়া লিখেছেন। ছড়াটি হলোঃ

ষোলকলা নকলের
ভ্যাজালের বাজারে
আসলের ভাগে দেখি
কাঁচ কলা বাজারে
ভালবাসা মায়াজাল
তাও খাদে ভরা যে
গলাবাজি বোল চালে
পড়ে নাকো ধরা সে।

সংসদে আজ গলাবাজি হচ্ছে। সর্বকালের সর্ব যুগের সত্যকে দাবিয়ে দেয়ার জন্য চিৎকার করা হচ্ছে। আজ সে চিৎকারের কোন জবাব আসছে না। তার অর্থটা কি? তার অর্থ হলো আসলের ভাগে দেখি কাঁচকলা বাজারে। আসল যে বিষয় সে বিষয়ের প্রতি মানুষের দৃষ্টি, মানুষের মনন, মানুষের মন, দূরে সরিয়ে রাখার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা শুরু

www.pathagar.com

হয়েছে। আর জ্ঞান অর্জনের সর্বপ্রধান উৎস হচ্ছে অহী। সেই অহির সাথে সেই বার্তা বাহকের সাথে আজকে কি ব্যবহার করা হচ্ছে। ফিলিস্তিনে শুকুরের ছবি তুলে ধরা হয়েছে এবং শুকরের ছবির সাথে রাসূলের নাম দিয়ে আঁকা হয়েছে। আমাদের দেশে রাসূলকে সন্ত্রাসী বলা হচ্ছে। আবার আমাদের দেশে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি বলে, লম্পট বলে সিরাজদ্দৌলাকে চিহ্নিত করছে। পরস্পরের মধ্যে কি কোন সংযোগ নেই। পরস্পরের মধ্যে কি কোন যোগ-বিয়োগ ভাগ গুণ নেই। নিশ্চয়ই আছে। আর্ন্তজাতিকতা এবং স্বাদেশিকতার মধ্যে একটি সম্পর্ক আছে। যারা স্বদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে ঠিক তারাই আন্তর্জাতিকভাবে মানবতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। মানবতার বিরুদ্ধে যারা তারাই আজ স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। একজন ঐতিহাসিক ইংরেজদেরকে বলেছেন নিষ্প্রাণ, কুচক্রী, নিষ্ঠুর। আজকে আমাদের দেশের সাথে কারা নিষ্ঠুর আচরণ করছে। আজকে আমাদের দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে কারা ষড়যন্ত্র করছে। এই দিয়েই বুঝা যায় যে, ইংরেজদের প্রেতাত্মা, ইংরেজদের বংশধর এখনো বেঁচে আছে। তারা জানিয়ে গেলো যে, শয়তান কেয়ামতের আগে নিপাত যাবে না। ষড়যন্ত্র করতে থাকবে। এই যে ষড়যন্ত্র এর মোকাবেলা না করলে তখন মিথ্যা বিজয় লাভ করে, সত্য পরাজিত হয়। আজও যদি সত্যবাদীরা মাথা উঁচু করে না দাড়ায়, সত্যবাদীরা সত্য কথাটি সত্যভাবে না বলে তাহলে আমাদের এই দেশ আমাদের এই স্বাধীনতা, আমাদেরই এই সার্বভৌমত্ব আমাদের ঈমান-আকিদা সব কিছু নষ্ট হয়ে যাবে। শুধুমাত্র আমরাই টিকে থাকবো।

আমরা সিরাজদ্দৌলার কর্মসূচী নিয়ে মাঠে নামি। আশা করছিলাম এতে সকলেই সহযোগিতা করবে। আর সেটাই ছিলো স্বাভাবিক। কিন্তু কারা সমর্থন করলো না। কারা একে তাদের অস্তিত্বের প্রতি হুমকি বলে মনে করলো? তারাই যারা মীরজাফর, জগৎ শেঠ, ক্লাইভ। আমাদের আন্দোলন করার দরকার হবে না। আমরা যতটুকু করেছি তাতেই প্রমাণ হয়ে গেছে কে মীরজাফর আর কে সিরাজদ্দৌলা। আমি সাবধান করে দিতে চাই, যারা স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কথা বলে, যারা যথার্থ স্বাধীনতাকামীদের বিরুদ্ধে কথা বলে, তারা যেন মীরজাফরের পরিণতি জেনে রাখে। মীরজাফরের মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। তার মুখে পানি দেবার জন্য নন্দকুমার এগিয়ে এসেছে। কার পানি নিয়ে এসেছে? একজন সন্ন্যাসীর পানি নিয়ে এসেছে। কিরীটেশ্বরীর চরণামৃত নিয়ে এসেছে। আর তা খেয়েই মীরজাফরের মৃত্যু হয়। গাদ্দারের যেভাবে মৃত্যু হওয়া উচিত ঠিক সেভাবেই হয়েছে। আজও যারা স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কাজ করবে, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে কাজ করবে তাদের মৃত্যুও অপঘাতে হবে, কোন সন্দেহ নেই। চতুর্দিকে ষড়যন্ত্র, চতুর্দিকে মিথ্যাচার, চতুর্দিকে অন্ধকার, এসব কিছুকেই চুরমার করে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে সিরাজের বংশধররা।

www.pathagar.com

স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এগিয়ে আসতে হবে

অধ্যাপক খন্দকার আবদুল মোমেন

অধ্যাপক খন্দকার আবদুল মোমেন বলেন, আজ থেকে কয়েকদিন আগে ২৩ জুন যে শোকর‍্যালী রাজপথে বেরিয়েছিলো, সেই শোক মিছিল, আজকের এই আলোচনা সভা প্রমাণ করে এদেশের মানুষের ইতিহাস চেতনা হারিয়ে যায়নি। ইতিহাস মানুষ ধারণ করে। ইতিহাস জাতি সংরক্ষণ করে। ইতিহাসের ভিত্তিতেই মানুষ সামনের পানে অগ্রসর হয়। যারা মনে করে এদেশের মানুষ তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য ভুলে গেছে তারা বোকার স্বর্গে বাস করছে। যার জন্য তারা আজকের জাতীয় ঐতিহ্য ; বৈশিষ্ট্য বিকৃতির পাঁয়তারা করছে। তারা হচ্ছে প্রথম সারির কিছু বুদ্ধিজীবী, কিছু ষড়যন্ত্রকারী, ঘষেটি বেগমের সন্তান, মীরজাফরের সন্তান, ক্লাইভের সন্তান, রাজবল্লভের সন্তান। তারা ষড়যন্ত্র করছে এ দেশকে বিকিয়ে দেয়ার জন্য। আজকের এই সেমিনার এ দেশবাসীকে জানিয়ে দিতে চায়, সাবধান বাণী উচ্চারণ করতে চায়। যারা এদেশকে বিকিয়ে দিতে চায় তাদের ব্যাপারে আমাদেরকে সচেতন হতে হবে। পরিকল্পনামাফিক আমাদেরকে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এগিয়ে আসতে হবে।

২৩ জুন যে বর্ণাঢ্য শোকর‍্যালী হয়েছিলো, তার পরে কিছুসংখ্যক বুদ্ধিজীবী যে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলো তা আপনাদের জানা আছে। তারা কারা? কি কারণে তারা তা করেছে তাও এদেশের মানুষ জানে। তারাতো ঘষেটি বেগমের সন্তান। তারাতো রায় দুর্লভের সন্তান। কাজেই তারাই সংসদে বসে প্রশ্ন করতে পারে সিরাজ কি বাঙ্গালী ছিলো। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে। আমাদের প্রিয় নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কি বাংগালী ছিলেন। অথচ এদেশের স্বাধীনতার জন্য তার অবদান মানুষ যুগ যুগ ধরে স্মরণ করবে। আসলে সিরাজকে নিয়ে যারা প্রশ্ন করে তারা মনে করে, এদেশের মানুষ ইতিহাস জানে না, তারা মূর্খ। বন্ধুরা আপনারা জেনে রাখুন, আমরা বাংলাদেশী, আমরা ভাষাভিত্তিক জাতীয়তায় বিশ্বাসী নই। যারা এ দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে, তাদের বিষদাঁত আমরা ভেঙ্গে দেবো ইনশাআল্লাহ। এদেশের সকলকেই বাংলাদেশী হতে হবে। মনে রাখতে হবে এখানে বহু ভাষাভাষী মানুষ আছে। আবার একই ভাষায় কথা বলার বহু সম্প্রদায়ের লোকও এখানে বাস করে। তাদের সকলের সমন্বয়েই আমরা একটি সুন্দর দেশ গড়ে তুলতে চাই। এই বিশেষ চেতনা যারা সংরক্ষণ করছে তাদের জন্যই আজকের এই আলোচনা। শোকর‍্যালী ও আলোচনা সভা দেখে যাদের ঘুম হারাম হয়ে গেছে তারা কারা। তাদেরকে আপনারা চেনেন। আমি বুঝে উঠতে পারছি না, যেখানে সকলেরই এ আয়োজনে সন্তোষ প্রকাশ করা উচিত ছিলো সেখানে কি করে সরকারী দলের একজন সাংসদ অহেতুক প্রশ্ন তুলেন? সিরাজের জাতীয়তা নিয়ে প্রশ্ন হলে, রায়দুর্লভ কি ছিলেন, উমিচাঁদ কি ছিলেন? তারা কি বাংগালী ছিলেন? তারা কি দেশপ্রেমিক ছিলেন? তাহলে সিরাজের কেন মৃত্যু হলো। এজন্য কি ক্লাইভ বড় ভূমিকা পালন করেছিলেন? সম্ভবত নয়। ঘরের শত্রু বিভীষণরাই এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাদের জন্যই জাতিকে প্রায় দু'শ বছর ইংরেজদের দাসত্ব করতে হয়।

www.pathagar.com

এদের উত্তর সূরিরা এখনো মরেনি। তারা দেশের অভ্যন্তরে থেকে এখনো ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। কায়দাটা ভিন্ন। একটু খেয়াল করলেই দেখবেন এদেশের মিল কারখানা সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। নিউজপ্রিন্টের গোডাউন ভর্তি। বিক্রি হচ্ছে না। কারণ জানতে চাইলে এক কর্মকর্তা বললেন, এসব রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। সরকারও তো এ মিল রাখতে চায় না। ভারত থেকে কাগজ আসে। দেশের কাগজ বাজারে যায় না। কর্মকর্তারা ঢাকায় পড়ে থাকেন, মাস শেষে এসে বেতন নিয়ে যায়। জুট মিল গুলোও এ ধরনের অফিসার দ্বারা ভর্তি। এমতাবস্থায় সরকার কিভাবে দেশের উন্নয়ন ঘটাবে। তারা সংসদে কেবল গলাবাজি করছে। বলেছে অনেক কিছুই তারা করছে, কিন্তু তাতে কোন কাজ হবে না। কথার প্রমাণ দিতে হবে। কারণ মানুষ বোকা নয়।

আজকের সেমিনারের বিশেষ তাৎপর্য আছে। তাৎপর্য হলো, আর কোন পলাশী নয়। দ্বিতীয়ত ঘষেটি বেগম, মীরজাফর, জগৎশেঠদের সন্তানদেরকে উৎখাত করতে হবে। সবাইকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে হবে। সকল জাতীয়তাবাদী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তৃতীয়ত এদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। এদেশের বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে যাতে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এ জন্য যার যা ভূমিকা তা যথাযথভাবে পালন করতে হবে। ভয় করলে চলবে না। যারা সাহসিকতার সাথে এসবকে অতিক্রম করতে পারবে কেবল তারাই টিকে থাকবে। অন্যায়কারীরা সব সময়ই ভীরু হয়। তাদের হৃদকম্প শুরু হয়েছে। তাদের ধারণা দেশবাসী এক হয়ে বুঝি এই ছুটে আসলো। তাই তারা পান্থপথের জনসভা এখানে নিয়ে আসে আমাদের আলোচনা সভাকে বানচাল করার জন্য। তাই আমাদেরকে এ ব্যাপারে ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে হবে। মনে রাখতে হবে। ভারত কখনো আমাদের মিত্র হতে পারে না। তারা লাভে লোহা বয়। '৭১ সনে সাহায্য করেছিলো লাভের আশায়। স্বাধীনতার পর তারা কোটি কোটি টাকা এদেশ থেকে নিয়ে গিয়েছে। কোন কিছু রেখে যায়নি। তারপরও তারা আমাদের মিত্র।

এদের প্রতি আমাদের করুণা হয়

কাইয়ুম খান মিলন

সাংবাদিক কাইয়ুম খান মিলন তার বক্তব্যে কতগুলো ঐতিহাসিক দলিল তুলে ধরে প্রশ্ন তোলেন, আজকে যারা নবাব সিরাজদ্দৌলাকে সংসদে অবাঙ্গালী শোষক বলে চিহ্নিত করতে চায় তারা কারা? বিগত এক বছরের পূর্বে এদেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর দেশের ভাগ্যাকাশে কিসের ছায়া ঘুর ঘুর করছে তা আপনারা পত্রিকায় দেখতে পাচ্ছেন। এ কাজ যারা করছেন তারা কারা?

পলাশীর পূর্বে যারা বাংলায় স্বাধীনতা নিয়ে ষড়যন্ত্র করেছিলেন তাদের প্রেতাত্মা আজ এদের উপর ভর করেছে। বিদেশী বেনিয়ারা এদেশ শোষণ করছে। কারা স্টক

www.pathagar.com

এক্সচেঞ্জ দখল করছে? এদের দোসররাই আজ বলছে সিরাজ ছিলো শোষক, অবাঙ্গালী, এদের প্রতি আমাদের করুণা হয়। এদেশে স্থানীয় বাসিন্দারাও আছে আবার বহিরাগতরাও আছে। উভয় এদেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছে। কিন্তু এটা তাদের উপলব্ধিতে নেই। কারণ তাদের উপর ভর করছে দেশের স্বাধীনতা বিরোধী চক্রের প্রেতাত্মা। তাই দেশের অর্থনীতি ধ্বংস হতে দেখেও নিরব থাকে। প্রভুর ইচ্ছে-মাফিক তোতা পাখির মতো শিখানো বুলি গড় গড় করে বলে যায়। এরা জানে না সিরাজ আর বাংলা অবিচ্ছেদ্য।

সভাপতির ভাষণ

আমরা সংগ্রামী ভবিষ্যতের দিকে পাড়ি দিতে চাই

গিয়াস কামাল চৌধুরী

সভাপতির ভাষণে গিয়াস কামাল চৌধুরী বলেন, আপনাদেরকে আর ধৈর্যের পরীক্ষায় ধরে রাখতে চাই না। আপনারা সবাই শেয়ার করেছেন, ইনশাআল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা এ জন্য আপনাদেরকে জাজা দিবেন, আমার বিশ্বাস আপনারা দেশের জন্য, দেশবাসীর জন্য, এই জমিনের জন্য, আমাদের আজাদীর জন্য, আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্যের গৌরবময় অতীতকে স্মরণ করে আজকে আমাদের তরুণ এবং যুবশ্রেণী যে হতাশার ভবিষ্যৎ মোকাবেলা করছে তাদেরকে সত্যিকার পথ দেখাবার জন্য আজ দাওয়াতীদের, উদ্যোক্তাদের এখানে উপস্থিত থেকে মেহেরবানী করে এতক্ষণ বিজ্ঞ পণ্ডিত এবং বিভিন্ন বুদ্ধিজীবীদের বক্তব্য শুনে উৎসাহিত করেছেন সেজন্য আমি আমার তরফ থেকে, উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে অর্থাৎ জাতীয় উদ্যোক্তা কমিটির সকলের তরফ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আর বলছি শোকর আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর শোকর জ্ঞাপন করছি।

আর আমাদের এই অনুষ্ঠানগুলোর পিছনে যারা নিরবে নেপথ্যে, যেটাকে বলা হয় খুবই চুপিসারে সাহায্য-সহায়তা দিয়েছেন সর্ব ব্যাপারে, তাদের অনেকেই এখানে উপস্থিত আছেন, তাদেরকে পরিচিত করিয়ে দিয়ে আপনাদের সামনে তাদেরকে ছোট করে দিতে চাই না। আপনাদের কাছে কিভাবে আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো? শুধু এটুকুই করতে পারি যে, আপন্যদের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে সর্বসময় দোয়া করবো। আপনারা যে সাহায্য-সহায়তা দিয়েছেন তা না হলে আমাদের পক্ষে এ প্রোগ্রাম করা অসম্ভব ছিলো। কবি আবদুল হাই শিকদারের আবেগ, মাসুদ মজুমদার সাহেব কিংবা ভাই আবদুল ওয়াহিদ সাহেবের সমন্বিত প্রচেষ্টা এবং তারা যে নিরলস ও ক্লান্তিহীন প্রতিজ্ঞা নিয়ে এই মুহূর্ত পর্যন্ত সকলকে উপস্থিত করতে পেরেছেন সে জন্য তাদের মাধ্যমে (তাদেরকে তো ধন্যবাদ জানিয়ে খাটো করা ঠিক নয়) আসলে যারা আমাদেরকে আড়ালে থেকে নিরবে নিরলসভাবে এবং অকৃপণভাবে, কৃপণতা তো

www.pathagar.com

করেনইনি বরং তারা তার বিপরীতে উদার চিত্তে আমাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। সে কথাতো আগেই বলেছি। আবারো বললাম। কারণ এটা না বললে আমাদের জন্য বোধ হয় অন্যায় হয়ে যাবে। হক আদায় হবে না ঠিকমত। সে জন্যই কথাটা তুললাম। এ ধরনের আলোচনার মাধ্যমে আমরা ভবিষ্যতে আরও আমাদের যে সংগ্রামী ভবিষ্যত রয়েছে সে সংগ্রামী ভবিষ্যতের পক্ষে পাড়ি দিতে চাই এবং সে ব্যাপারেও আমরা ইনশাআল্লাহ আপনাদের সহযোগিতা চাই। আপনারা আমাদের দাওয়াতে উপস্থিত হবেন।

মেহেরবানী করে আপনারা এই যে সবর এখতেয়ার করেছেন এই সবরের আরো পরিচয় দিয়ে আমাদেরকে সাহায্য-সহায়তা করবেন এটাই হলো আমার বক্তব্য। আর কোন বক্তব্য নয়; কারণ অনেকেই কিন্তু একেবারে মনের প্রশান্তি নিয়ে বক্তব্য শেষ করতে পারেননি সময়ের যে কাঠামো সে কাঠামোর ভেতরে এত পণ্ডিত, এতো বিজ্ঞ মানুষ, এতো জ্ঞানী মানুষের এই ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে যে আলোচনা সে আলোচনা উপস্থাপন করা সম্ভবপর নয়। কেউ কেউ দীর্ঘ বক্তব্যকে বাধ্য হয়ে উদ্যোক্তাদের বারবার সতর্কীকরণের ফলে খাটো করেছেন। তাদেরকে শুধু বলতে চাই যে, আপনারা আমাদেরকে মাফ করে দেবেন। ইনশাআল্লাহ আপনাদের লেখনী, আপনাদের বক্তব্য আমরা ভবিষ্যতে আরো সংকলনের মাধ্যমে মুদ্রণ করে প্রকাশ ও বিতরণ করতে চাই। আর আমাদের যে প্রস্তাবাবলী আপনাদের সামনে পেশ করা হয়েছে সে প্রস্তাবাবলী আপনারা সর্বান্তকরণে অনুমোদন করেছেন, সমর্থন দিয়েছেন, সেই সমর্থিত প্রস্তাবাবলী যেন প্রস্তাবাবলী হিসেবেই না থাকে, সেগুলো যেন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আপনাদের সকলের সহায়তা লাভ করতে পারি, সকল জাতীয়তাবাদী, ইসলামী শক্তির আমরা যেন সমর্থন লাভ করতে পারি, অন্তরের সমর্থনে, সক্রিয় সমর্থনে এগুলোকে বাস্তবায়ন করতে পারি আমরা, সে ক্ষেত্রেও আপনাদের সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করি।

আর সবচেয়ে বড় কথা, আজকে ইয়াহুদী রাষ্ট্র ইসরাইলের যে দুঃসাহস, যে বেয়াদবী, সে বেয়াদবীর কথা আপনারা প্রতিবাদ করে, নিন্দার আকারে উপস্থাপন করেছেন যে, আমাদের প্রিয় নবী হুজুরে আকরাম দোজাহানের বাদশাহ, আহমদ মোস্তফা, মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর উপর কিভাবে আঘাত করা যায় তারা যে সেখানে এবং এখানে, এখানে একজন বক্তা সুন্দরভাবে বলেছেন, এর ভেতর একটা যোগসূত্র খোঁজা যায়। সেটা সঠিক এবং এরা যে বিচ্ছিন্ন নয়, তারা যে নানাভাবে এ আক্রমণটা ক্রমান্বয়ে করে যাচ্ছে এর বিরুদ্ধে আমরা সকলে যদি ঈমানী, জেহাদী শক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে এর বিরোধিতা না করি, প্রতিরোধ না করি, এদেরকে যদি লড়াইয়ের এবং জেহাদের মনোভাব নিয়ে আমরা প্রতিহত না করি তাহলে কিন্তু তারা আরো বেশি অগ্রসর হবার দুঃসাহস এবং বেয়াদবী দেখাবে। তাদের বিরুদ্ধে আপনারা হুঁশিয়ার হয়ে যান এটাই আমার আপনাদের কাছে নিবেদন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়াবারাকাতুহু।

অনুলিখন ঃ শিকদার আবদুর রব

www.pathagar.com

পলাশী ট্রাজেডির ২৪০তম বার্ষিকী স্মরণ জাতীয় কমিটি আয়োজিত পলাশী ট্রাজেডী দিবস ও শহীদ সিরাজদ্দৌলার শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে গৃহীত

প্রস্তাবাবলী

আজ ৩ জুলাই '৯৭। আজ থেকে ২৪০ বছর ১২ দিন আগে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা বিশ্বাসঘাতকদের হাতে শাহাদাত বরণ করেছিলেন। এদিনে নবাবের দলিত মথিত লাশ মুর্শিদাবাদের রাজপথে হাতির পিঠে চড়িয়ে বিজয় মিছিল করে বিশ্বাসঘাতক চক্র উল্লাস প্রকাশ করেছিলো। এর মাত্র ১২ দিন আগে পলাশীর আম্রকাননে এক পাতানো যুদ্ধে দেশীয় বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর চক্র ও ক্লাইভের হাতে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়। এ সভা মনে করে, ইতিহাসের এ বেদনাবিধূর স্মৃতি ধরে রাখার জন্য প্রতি বছর রাষ্ট্রীয়ভাবে ২৩ জুন 'পলাশী ট্রাজেডী দিবস' ও ৩ জুলাই 'সিরাজের শাহাদাত দিবস' পালন করা উচিত।

এই সভা স্বাধীনতার মহানায়ক শহীদ সিরাজদ্দৌলার অমর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছে, সেই সাথে তার সহযোদ্ধা মোহনলাল, মীরমর্দানসহ সকলের ত্যাগকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছে। এ সভা সিরাজ, তার সহযোদ্ধা, পরিবার-স্বজনসহ সকল স্বাধীনতাপ্রেমিক শহীদের রুহের মাগফেরাত কামনা করছে।

২। সিরাজের স্মৃতি অম্লান করে রাখার প্রয়োজনে দেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি করে আবাসিক হলের নাম 'শহীদ সিরাজদ্দৌলা হল' ঘোষণা করার জন্য এ সভা জোর দাবী জানাচ্ছে। এ সভা মনে করে, নতুনভাবে যে ক'টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবে, তার যে কোন একটি নবাব সিরাজদ্দৌলার নামে হওয়া উচিত।

প্রস্তাবাবলী

www.pathagar.com

৩। এই সভা মনে করে, বর্তমান প্রজন্ম এবং অনাগত নাগরিকদের সামনে প্রকৃত ইতিহাস-ঐতিহ্য তুলে ধরে তা সমুন্নত রাখার স্বার্থে রাজধানী ঢাকার কোন এক প্রাণকেন্দ্রে একটি সুউচ্চ স্মৃতি মিনার গড়ে তোলা উচিত। এ স্মৃতি মিনার আমাদের দুঃখবোধ ও বেদনাবিধূর ইতিহাসকে সতত জাগ্রত রাখবে। সেই মিনার স্বাধীনতা রক্ষার পথেও প্রেরণা জোগাবে।

৪। নবাব সিরাজদ্দৌলা এবং পলাশীর ঘটনাবলী সম্পর্কে জাতিকে অবহিত রাখার স্বার্থে গবেষণাকর্ম পরিচালনার জন্য ঢাকায় একটি 'সিরাজদ্দৌলা একাডেমী' প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন বলে আজকের সভা মনে করে।

৫। এই সভা মনে করে, বিকৃত ইতিহাস চর্চা ও পক্ষপাতদুষ্ট ইতিহাস রচয়িতাদের ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার লক্ষ্যে সকল শ্রেণীর ইতিহাস পাঠ্যসূচীতে পলাশীর ঘটনাবলীর বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস তুলে ধরা উচিত।

৬। বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে প্রকৃত ইতিহাস জানার ও বুঝাবার প্রয়োজনে, শিশুদের উপযোগী সিরাজদ্দৌলার জীবনী গ্রন্থ প্রকাশনা, সচিত্র এ্যালবাম, ভিডিও-অডিও, স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলোকে এগিয়ে আসার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে।

৭। এই সভা মনে করে, দল-মত নির্বিশেষে দেশের সকল স্বাধীনতাকামী রাজনৈতিক, সামাজিক, সংগঠন-সংস্থাসমূহকে প্রতি বছর 'পলাশী দিবস' যথাযথ গুরুত্বের সাথে পালন করার জন্য এগিয়ে আসা উচিত।

৮। এই সভা মনে করে, রাজধানী ঢাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ সড়কের নাম 'সিরাজউদ্দৌলা এভিনিউ' রাখা উচিত।

৯। এই সভা মনে করে বেনিয়াচক্র ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে আমাদের স্বাধীনতা হরণ করেছিলো, দেশের সম্পদ লুণ্ঠন করেছিলো, পাচার করেছিলো দেশের কাড়ি কাড়ি সম্পদ, তাঁতীদের হাত কেটে মসলিন শিল্প ধ্বংস করেছিলো, নীল চাষে বাধ্য করেছিলো, দু' দু'টি বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে এ জাতির ভাগ্য-বিপর্যয়কে অনিবার্য করে তুলেছিল, লাখো লাখো বনি আদমকে দুর্ভিক্ষের দিকে ঠেলে দিয়ে মৃত্যুমুখে পাঠিয়ে দিয়েছিলো, ইতিহাস-ঐতিহ্য ধ্বংস করে ধর্মাচার ও লোকজ সংস্কৃতির উপর হামলা চালিয়ে কিংবদন্তির সোনার বাংলাকে শ্মশানে পরিণত করেছিল, বিনিময়ে গড়ে তুলেছিলো ইউরোপের স্বপ্নপুরী ইংল্যান্ড। এই সভা যুক্তরাজ্যের বর্তমান শাসকদের কাছে আমাদের স্বাধীনতা হরণের জন্য প্রকাশ্যে বিশ্ব দরবারে ক্ষমা ভিক্ষা করার জন্য ও শোষণ-লুণ্ঠনের মাধ্যমে হরণ করা আমাদের সকল সম্পদ ফেরত দেয়ার দাবী উত্থাপন করছে।

১০। এই সভা মনে করে, সিরাজ স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক। তার প্রতিপক্ষ মীরজাফরেরা বিশ্বাসঘাতকতার প্রতীক। আর কোন ষড়যন্ত্র এবং মীরজাফরী যাতে আমাদের স্বাধীনতা হরণ করতে না পারে, সম্পদ লুণ্ঠনের জন্য পা বাড়াতে না পারে- সে জন্য 'আর কোন পলাশী নয়'- এ স্লোগানকে সতত উচ্চকিত করে দল-মত নির্বিশেষে দেশের আপামর জনসাধারণকে স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের পক্ষে সদা-সর্বদা-সর্বত্র জাগ্রত থাকার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে।

www.pathagar.com

সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণাপত্র পাঠ করছেন কমিটির সদস্য সচিব কবি আবদুল হাই শিকদার

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন গিয়াস কামাল চৌধুরী (বাম দিক থেকে) কবি আল মাহমুদ, কবি আবদুল হাই শিকদার, মাসুদ মজুমদার, (সর্ব বামে) আবদুল বাতেন

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন মাশির হোসেন হিরো পাশে উপস্থিত সাংবাদিকদের ক'জন

www.pathagar.com

র‍্যালীর অগ্রভাগে খোলা জীপে নেতৃবৃন্দ

বিশাল র‍্যালী এগিয়ে চলছে

র‍্যালীর একটি খণ্ড চিত্র

www.pathagar.com

র‍্যালীর সামনে হাতী, আরোহী বিহীন হাতীর পৃষ্ঠে কালো পতাকা হাতে মাহুত।

র‍্যালীর সামনে হাতী, আরোহী বিহীন হাতীর পৃষ্ঠে কালো পতাকা হাতে মাহুত

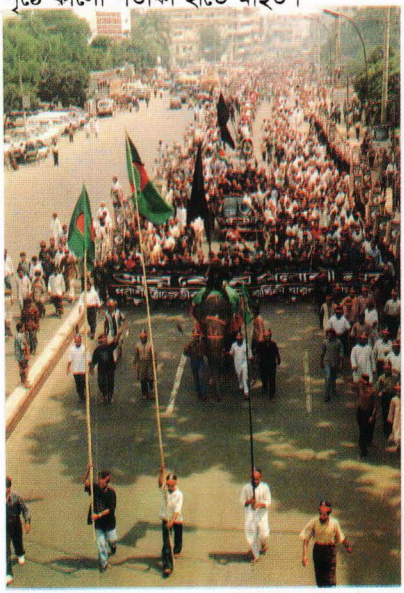

আরো একটি খণ্ড চিত্র

আরো একটি খণ্ড চিত্র

www.pathagar.com

আরো একটি
খণ্ড চিত্র

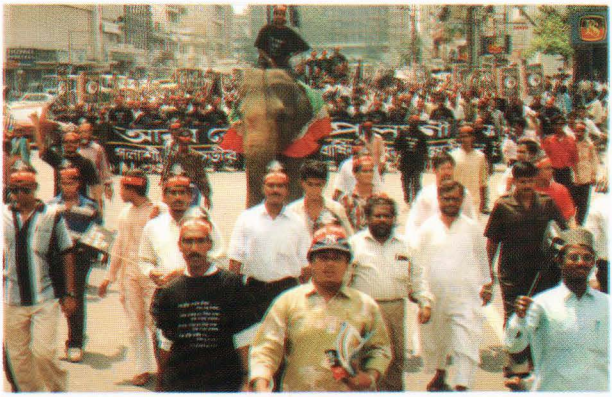

আরো একটি
খণ্ড চিত্র

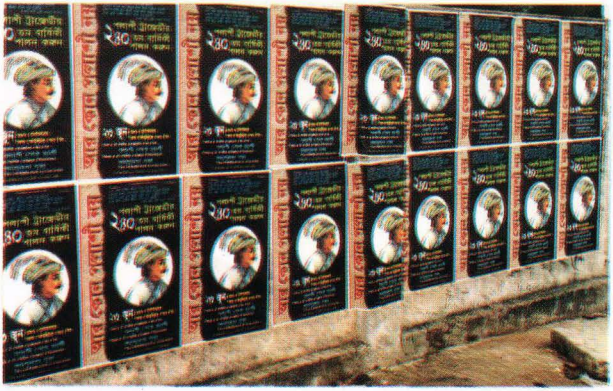

পলাশী দিবস
উপলক্ষে প্রকাশিত
পোস্টার

www.pathagar.com

আরো একটি
খণ্ড চিত্র

আরো একটি
খণ্ড চিত্র

আরো একটি
খণ্ড চিত্র

www.pathagar.com

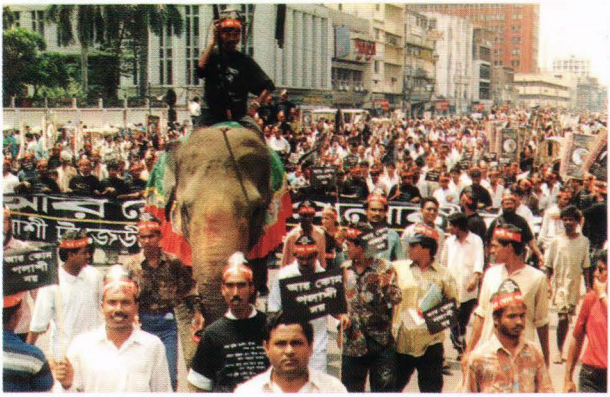

আরো একটি
খণ্ড চিত্র

আরো একটি
খণ্ড চিত্র

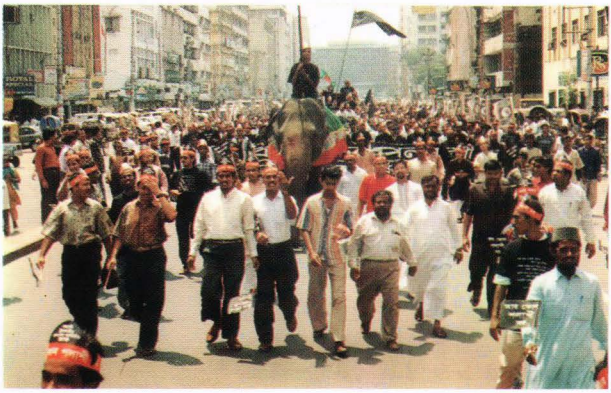

আরো একটি
খণ্ড চিত্র

www.pathagar.com

র‍্যালীতে গণধিকৃত বিশ্বাসঘাতক চক্রের কয়েকজনের প্রতীকী মহড়ার ছবি

মীরজাফর

জগৎশেঠ

ঘষেটি বেগমের কুশপুত্তলিকা

আমীর চাঁদ

www.pathagar.com

ক্লাইভ

ওয়াটস

গণধিকৃতদের রিকশা ভ্যানে তুলে নগর প্রদক্ষিণের একটি দৃশ্য

www.pathagar.com

গণধিকৃতদের
রিকশা ভ্যানে তুলে
নগর প্রদক্ষিণের
একটি দৃশ্য

গণধিকৃতদের
রিকশা ভ্যানে তুলে
নগর প্রদক্ষিণের
একটি দৃশ্য

গণধিকৃতদের
রিকশা ভ্যানে তুলে
নগর প্রদক্ষিণের
একটি দৃশ্য

www.pathagar.com

নবকুমার

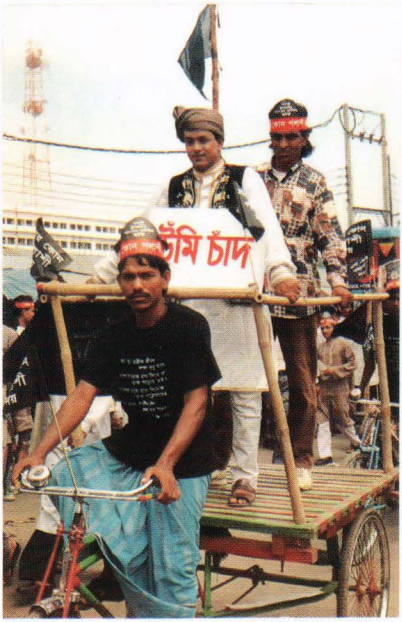

উমি চাঁদ

বিশ্বাসঘাতকদের ক'জন একসাথে

www.pathagar.com

রাজ বল্লভ

রায় দুর্লভ

মানিক চাঁদ

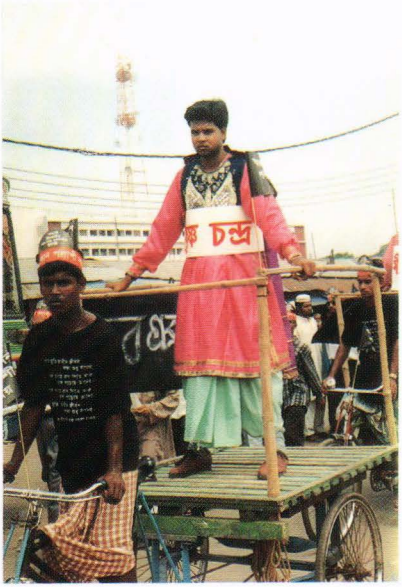

কৃষ্ণচন্দ্র

www.pathagar.com

র‍্যালী শেষে মুনাজাত

র‍্যালী শেষে মুনাজাত

র‍্যালী শেষে মুনাজাত

www.pathagar.com

৩ জুন '৯৭ পলাশী শোক র‍্যালী শেষে প্রেসক্লাবের অতিথি কক্ষে উদ্যোক্তাদের কয়েকজন

৩ জুন আলোচনা সভা কেন স্থগিত করা হলো-কারণ ব্যাখ্যা করে জাতীয় প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন গিয়াস কামাল চৌধুরী, সাথে কমিটির সদস্য সচিব ও কয়েকজন সদস্যকে দেখা যাচ্ছে

র‍্যালী শুরুর প্রাক্কালে 'আর কোন পলাশী নয়' টুপি পরিহিত কয়েকজন উৎসাহী সুধী

www.pathagar.com

আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্য রাখছেন গিয়াস কামাল চৌধুরী

স্বাগত ভাষণ দিচ্ছেন স্মরণ জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব কবি আবদুল হাই শিকদার

আলোচনা সভায় উপস্থিত সুধীমণ্ডলীর একাংশ

www.pathagar.com

ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী

কবি আল মাহমুদ

ডঃ এস এম লুৎফর রহমান

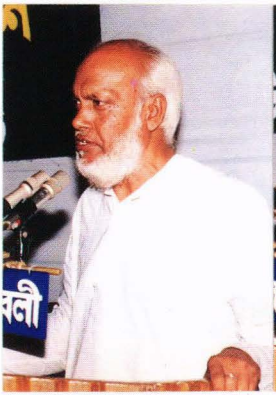

অধ্যাপক আবদুল গফুর

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান

খান আতাউর রহমান

আবুল আসাদ

ওবায়দুল হক সরকার

ডঃ মঈনুদ্দিন হোসেন

www.pathagar.com

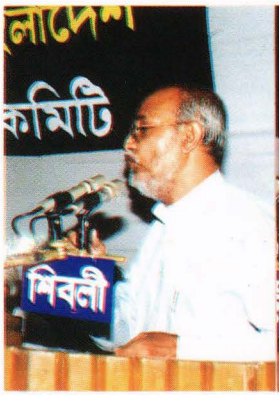

এরশাদ মজুমদার

ডঃ নজরুল ইসলাম

ডঃ রেজওয়ান সিদ্দিকী

মাসুদ মজুমদার

কাইয়ুম খান মিলন

কবি মতিউর রহমান মল্লিক

খোন্দকার আবদুল মোমেন, প্রস্তাব পাঠ করছেন খালেদ রকিব, অনুষ্ঠানের উপস্থাপক আলম মাসুদ

www.pathagar.com

সত্য মুক্তি স্বাধীন জীবন
লক্ষ্য শুধু যাদের,

খোদার রাহায় প্রাণ দিতে আজ
ডাক পড়েছে তাদের।

দেশের পায়ে প্রাণ দিতে আজ
ডাক পড়েছে তাদের,

সত্য মুক্তি স্বাধীন জীবন
লক্ষ্য শুধু যাদের।

- জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম